ALUMNI LINK

Alumni Day 2025

geoquest

Badarpur, Flyover, New Delhi

RETAIN

- MSE retaining walls
- Precast retaining walls
- Reinforced Soil Slopes
- Dams and dikes
- Quays and jetties
- River training

CROSS

- Bridge abutments
- Buried bridge structures
- Box bridges
- Tunnels and underground structures

Dronagiri, Maharashtra

Z-Morh, Jammu and Kashmir

PROTECT

Natural risks protection
- Erosion
- Avalanche
- Rockfall & debris flow

- Slope stabilization
- Floods & Coastal

Industrial risks protection
- Waste storage
- Spill containment

STRENGTHEN

- Embankments over soft soils, piles & subsidence
- Soil reinforcement
- Geosynthetic solutions and products supply: geogrids, geotextiles, geocells, drainage geocomposites

Tapi River, Maharashtra

www.geoquest-group.co.in

GAINWELL
GROUP SOLUTIONS FOR GROWTH

GAIN A BETTER TOMORROW

CONTINUOUS MINER
GCM230, 240, 345N, 445, 845

HIGHWALL MINING SYSTEM
GHWM 300M

marketing@gainwellindia.com

www.gainwellglobal.com

Alumni Link 2025

Published by

GAABESU

(Global Alumni Association of
Bengal Engineering and Science University)

Alumni Link
Published on the occasion of Alumni Day 2025 on 28th December 2025.

Editor:
Manoj Kar (E&TC-1980)
Sandeep Chatterjee (Mech.E-1998)

Address:
Global Alumni Association of Bengal Engineering and Science University
Guest House
IIEST, Shibpur.
P.O: Botanic Garden
Howrah. West Bengal. India 711103
Phone: +91-33-26687436, 35683384. Email: gaabesu@gmail.com

Cover :
Dipayan Lodh (Civil-2009)

Printed at: S.S.Print, 8 Narasingha Lane, Kolkata 700009

বেদান্তের মূল বার্তা, পরমানন্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে

(একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার আকারে)

শ্রী চিত্তরঞ্জন মাহাতো

প্রাক্তন অধ্যাপক, ইলেকট্রিকাল

অনেকেরই আশংকা যে বেদান্ত এক অতি দুর্বোধ্য শাস্ত্র। কিন্তু, বেদান্তের মূল বার্তা, যা মানুষকে পরমানন্দের সন্ধান দেয়, তা সঠিক যুক্তিবিচারে খুব সহজগম্য। এর জন্য পান্ডিত্যের দরকার পড়ে না। প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার তথা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির তাৎপর্য বিচার সেই মূল বার্তা বোঝার পথ খুলে দেয়। আর তার জন্য ভেবে দেখার ধাপগুলি হ'ল —

ভেবে দেখ-১ : ত্রিকালে অবাধিত বলে আত্মই একমাত্র সত্যবস্তু

১) জাগ্রতাবস্থার দেখা, শোনা ইত্যাদি 'তুমি' অনুভব কর, এক চেতন সত্তা হিসেবে।

২) স্বপ্নাবস্থার দেখা, শোনা ইত্যাদিও সেই 'তুমি'-ই অনুভব কর। এই নয় যে জাগ্রতাবস্থার অনুভব তুমি কর, আর স্বপ্নাবস্থার অনুভব অন্য থেকে পাওয়া।

৩) সুষুপ্তি বা গাঢ় ঘুমের শূণ্যতার অনুভবও সেই একই 'তুমি' কর, অন্য কেউ নয়। অবস্থাত্রয়ের এই বিচারই হ'ল সর্ব বেদান্তের মূল ভিত্তি— এই তিন অবস্থার অনুভবকর্তা এক, যে সৎ বা সদা-বিদ্যমান। কারণ, অনুভবের কর্তা না থাকলে অনুভবটাই হবে না। জাগ্রৎ ও স্বপ্নের শরীর সহ বিশ্ব এবং সুষুপ্তির শূণ্যতা— সব কিছুই অনুভবের বস্তু, অনুভবকর্তা/তুমি নও কোনটাই। এটা বোঝার জন্য কোন পাণ্ডিত্য লাগে না। প্রত্যেকের নিজস্ব অনুভবই যথেষ্ট। আর, সত্যের সংজ্ঞা হ'ল: ত্রিকালাবাধ্যত্বম্ সত্যত্বম্ [১]। সত্য বস্তু জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন কালে অবাধিত। সুতরাং, তিন কালে অবাধিত অনুভবকারী তোমার স্বরূপ সদা-বিদ্যমান চেতনা ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না।

ভেবে দেখ-২: জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির বিষয়গুলো ত্রিকালে অবাধিত নয়। অতএব মিথ্যারই নামান্তর মাত্র। জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্নের বস্তু এবং সুষুপ্তির শূণ্যতা সব কিছু মিথ্যা এটা বুঝতে কোন পাণ্ডিত্য লাগে না। তেমনি, স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রতের বস্তু এবং সুষুপ্তির শূণ্যতা সব কিছু মিথ্যা এটাও সহজেই বোঝা যায়। আবার, সুষুপ্ত অবস্থায় জাগ্রৎ এবং স্বপ্নের সব কিছু লীন হয়ে যায়। মিথ্যা হয়ে যায়।

অন্যভাবে বললে — জাগ্রতের বস্তু জাগ্রতের আগে (যেমন, স্বপ্নে বা গাঢ় ঘুমে) কিম্বা জাগ্রতের পরে (যেমন, পুনরায় স্বপ্নে বা গাঢ় ঘুমে) কোথাও থাকে না। অনুরূপভাবে, স্বপ্নের বস্তু স্বপ্নের আগে (যেমন,

জাগ্রতে বা গাঢ় ঘুমে) কিম্বা স্বপ্নের পরে (যেমন, পুনরায় জাগ্রতে বা গাঢ় ঘুমে) কোথাও থাকে না। অর্থাৎ এরা ত্রিকালে অবাধিত নয় [২]।

দেখা যাচ্ছে যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির বিষয়গুলো চেতন অনুভবকর্তাতে উঠছে, কিছুক্ষণ থাকছে এবং তারপর লয় পেয়ে যাচ্ছে — মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। এরা কেউ ত্রিকালে অবাধিত নয়,

অতএব মিথ্যারই নামান্তর মাত্র। সদ্বস্তু হিসেবে কেবল আত্মই বিদ্যমান। জীবরূপে প্রতিভাত হলেও তিনিই ব্রহ্ম। এটাই বেদান্তের মূল বার্তা — ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভেবে দেখ-৩ : সত্য বস্তুতে 'মিথ্যার' উপস্থিতি কীভাবে হয়

আত্মা সত্য বস্তু, (তাতে জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিকরণ) মিথ্যাগুলি আসে কী করে?

উত্তর — অসংখ্য রকম প্রকাশের মধ্যে চেতনার আর একরকম প্রকাশ হ'ল (সবারই অনুভবসিদ্ধ) সংকল্প-বিকল্পরূপ চিন্তা, যাকে বলা হয় মন। (বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত আরো অন্যরকমের প্রকাশ।) এই মনই রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির ন্যায় সৎ চেতনায় স্থিত সংকল্পাত্মক জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিরূপ আত্মস্থ জ্ঞানকে চেতনাতিরিক্ত বিকল্প বস্তু হিসেবে তুলে ধরে। বেদান্তজ্ঞানীর ভাষায় — আত্মা তাঁর মায়া দ্বারা আত্মতেই ভেদমূলক বস্তু 'কল্পনা' করে' নিজেই তাদের উপলব্ধি করেন [৩]। সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনই এসব ঘটায়। অবিশ্বাস্য ঠেকলেও এছাড়া অন্য কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা হয় না। সমস্ত দ্বৈত বস্তু আসলে মনোদৃশ্য, কারণ মন অমনী (চিন্তাশূন্য) হ'লে এরা সব মিলিয়ে যায় [৪]। এটা উপলব্ধ ব্যাপার। মনই সৎ-স্বরূপ আত্মাতে মিথ্যা জগৎ সংসারের উপস্থিতি ঘটায়, যা শুদ্ধ চেতন সত্তাকে আবৃত করে — যেন জগৎ-সংসারটাই আছে, আর চেতন সত্তাটা উবে গেছে।

ভেবে দেখ-৪ : তুমি অবশিষ্টস্বরূপ শুদ্ধচেতনা

জাগ্রৎ ও স্বপ্নের শরীরাদি সমস্ত বিশ্ব এবং সুষুপ্তির শূণ্যতা — এগুলো মনোদৃশ্য, এগুলো তুমি নও। 'নেতি, নেতি' (ন + ইতি) বা 'এটা নয়' 'এটা নয়, করে' সব মনোদৃশ্য বাতিল করে নিজেকে খোঁজাটাই হ'ল বেদান্তের চরম বিচার [৫]। মনোদৃশ্যের নাশ (অর্থাৎ, মনোনাশ) হ'লে যা 'অবশিষ্ট' থাকে, তুমি হলে তাই — চেতনা। অবশিষ্টস্বরূপকে শূণ্য বলে ভুল করে অনেকে। কিন্তু, শূণ্যের অনুভবকর্তা অবশ্যই অ-শূণ্য চেতন সত্তা। সেই চেতনায় পৌঁছানোর সহজ সাধনা হ'ল জাগ্রৎ-সুষপ্তিতে (জাগ্রতের চেতনার সঙ্গে সুষপ্তির শূণ্যতা বোধে) স্থিতি। সেই স্থিতির বর্ণনা বাক্যদ্বারা সম্ভব নয়। শাস্ত্র শুধু ন-কার দ্বারাই তার ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু, বোধটা হয় এক পাগল করে দেওয়া আনন্দের। সাধক ধন্য হয় জীবনের আসল উদ্দেশ্য পূরণে। সৎ, আনন্দময়, চৈতন্যস্বরূপ আত্মবোধই ধর্মের আসল প্রেরণা। বুঝে কিম্বা না বুঝে সবাই চলেছে এই আনন্দের সন্ধানে। ধন-দৌলত, যৌন সম্ভোগ, লোকমান্যতা, নেশা-ভাং, সুষুপ্তি এসবে মানুষ সেই আনন্দের ক্ষীণ আভাস মাত্র পায়, মনের সংকল্প বিকল্পের ক্ষণিক নিবৃত্তির কারণে। কিন্তু, মনোনাশে আত্মবোধজনিত আনন্দের কাছে এরা তুচ্ছ।

ভেবে দেখ- ৫ : ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই

যে মনরূপী জগৎ-সংসার চেতনাকে আবৃত করে রাখে তাদের নাশ করার (অর্থাৎ, মনোনাশের) ফলে আত্মবোধ বোধে আসে। জগৎ-সংসারের মিথ্যাত্ব বোধটা সংশয়াতীত হয়ে যায়। অবশিষ্টে স্থিতিকালে — ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আবার, সেই অবশিষ্ট থেকেই জগৎ-সংসারের উদ্ভব, যেহেতু অন্য কিছুর অস্তিত্বই ছিল না — ব্যুত্থিত অবস্থার এই বোধের জন্য বলা হয় সবই ব্রহ্ম, যার অন্য নাম আত্ম, পরমাত্মা, অক্ষর, ওঁ ইত্যাদি।

এটাই পাই মাণ্ডুক্য উপনিষদের প্রথম শ্লোকে — 'ওঁ এই অক্ষরই সব কিছু (এখানে অক্ষর মানে যার ক্ষয় নেই, যা ক্ষরণশীল নয়। অক্ষর মানে, বর্ণমালার অক্ষর নয়।); তদধীন ব্যাখ্যা হ'ল — এই ওঁকারই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং অপর যা কিছু ত্রিকালের বাইরে তাও ওঁকারই' [৬]। অবর্ণনীয় সুখস্বরূপ এই আত্মবোধে/ব্রহ্মবোধে মানুষ কৃতকৃত্য হয়, বুঝে যায় যে চরাচরের সব কিছুই আত্মস্থ জ্ঞান স্বতন্ত্র বস্তু হিসেবে মিথ্যা। তাই তার চাওয়া-পাওয়ারও কিছু থাকে না [৭]।

শাস্ত্রীয় সমর্থন

[১] ত্রিকালাবাধ্যত্বম্ সত্যত্বম্ - [যোগ বাসিষ্ঠ সার, রামকৃষ্ণ মিশন পৃ ৯৭ ও ১২৩]

[২] আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানে অপি তত্তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্ত অবিতথা ইব লক্ষিতাঃ।।মাণ্ডুক্য কারিকা শ্লোক ২/৬]

[৩] কল্পয়ত্যাত্মনাত্মনমাত্ম দেবঃ স্বমায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ। [মাণ্ডুক্য কারিকা শ্লোক ২/১২]

[৪] মনোদৃশ্যমিদম্ দ্বৈতম্ যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্
মনসোহি অমনীভাবে দ্বৈতম নৈবোপলভ্যতে [মাণ্ডুক্য কারিকা শ্লোক ৩/৩১]

[৫] অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি ... [বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২/৩/৬]

[৬] ওমিতি এতৎ অক্ষরমিদং সর্বম্ । তস্য উপব্যাখ্যানম্ — ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব, যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।। [মান্ডুক্য উপনিষদ্ শ্লোক ১]

[৭] স্বস্থং শান্তং সনির্বাণমকথ্যং সুখমুত্তমম্।
অজমজেন জ্ঞেয়েন সর্বত্রং পরিচক্ষত।। [মাণ্ডুক্য কারিকা শ্লোক ৩/৪৭]

সূচিপত্র

Message of Director	৯/9
From the Desk of Editor – Alumni Link – Manoj Kar	১১/11
Editorial — Sandeep Chatterjee	১২/12
President (GAABESU)'s Message — Amitabha Datta	১৪/14
Report from GAABESU Secretary's Desk — Prosenjit Chakraborty	১৬/16
Message from the Convener — Netai Chandra Dey	১৮/18
OBITUARY LIST 2025	১৯/19
DONORS LIST 2025	২০/20
List of Executive Committee Members for 2025-27	২১/21
বাদল-দা — যেমন দেখেছি ও জেনেছি — দীপক কুমার গুপ্ত	২৩/23
আমাদের বাদলদা – সমীর সাহাপোদ্দার	২৬/26
মুক্ত থিয়েটারে গান, একটি প্রতিস্পর্ধী উচ্চারণ: আমার জবাব না – অতনু মজুমদার	৩৬/36
ভবিষ্যদ্বাণী — সনৎ কুমার ঘোষ	৪৩/43
Narayan Sanyal – A Tribute — Ashok Chattopadhyay	৪৬/46
নারাণদাকে যেমন দেখেছি — মধুজিৎ মুখোপাধ্যায়	৪৮/48
শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার সূচনা এবং অধ্যাপক পল জোহানেস ব্রুল — গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫/55
Reminiscences of nineteen–sixties — Tathagata Roy	৬৯/69
An Interview with Ila Ghose, 1951, Mechanical, the first woman engineer from B.E. College — Interview by Tanusree Chakraborty	৭৮/78
Memoirs of College Days — Biswanath Chatterjee	৮৩/83
কিছু টুকরো স্মৃতি — অনিল কুমার দাস	৮৭/87
My Years at B. E. College as a Teacher — Arun Deb	৯৭/97
Memories of BE College — Debabrata Bhattacharjee	১০২/102
Note from Pinaki Chakrabarti,1961, Civil	১০৭/107
Memories of College Days — Arun Banerjee	১০৯/109
The Hunger Strike — Jayanta Mazumdar	১১১/111
BEC Memoirs — Baidyanath Roy	১১৬/116
Reminiscence of a B E Collegian — Subrata Mazumder	১১৯/119
Hostel Life in My BE College Days — Debiprasad Palit	১২১/121
বি ই কলেজে আমার প্রথম দিন — গৌরীশঙ্কর সুর	১২৫/125

‘পুরানো সেই দিনের কথা’ — রঞ্জন প্রসাদ	১২৭/127
ডাউনিংয়ে প্রথম দিন ও আরো কয়েকটা দিন-১৯৬৫ — অজয় কুমার দেবনাথ	১৩০/130
Timeless Tales: 170 Years of Engineering and the Legacy of Sholay — Debanjan Sengupta	১৩৬/136
বনমালী ঘোষালের ঘড়ি — ইন্দ্রজিৎ ঘোষ	১৩৯/139
প্রতিবেশী পাখিরা — অঞ্জন মুখোপাধ্যায়	১৪২/142
জঙ্গলের অনুশাসন — সুব্রত মজুমদার	১৪৫/145
দিলীপ ভৌমিক (১৯৬৫, আর্কিটেকচার)— এক অন্তঃসলিলা বিরল প্রতিভা — সনৎ কুমার ঘোষ	১৫০/150
একটি অনৈতিক যুদ্ধ — সনৎ কুমার ঘোষ	১৫২/152
এল্টজ্ ম্যানর এর রহস্য — দিব্যেন্দু মল্লিক	১৬০/160
Escape — Kalpana Sarkar Majumdar	১৭২/172
Moments beyond mind — Kalpana Sarkar Majumdar	১৭৮/178
Two Poems — Kalpana Sarkar Majumdar	১৮২/182
A holistic approach on Skill Development for the Industries in Today’s scenarios — K.G.Pilsima	১৮৪/184
A Revitalising Thought for Salt Lake City – Shared Facility, Safety, Environment — Barun Kr Basak	১৮৯/189
Beyond the Gulf: A Journey to Kerema, Papua New Guinea — Amitabha Datta	১৯৯/199
Brahmanic Cosmology: A Personal Reflection through the Entropy of Modern Living — Deepayan Kumar Das	২০২/202
Ground Improvement techniques to increase bearing capacity of Soil — Snehashish Basu	২০৬/206
আমি — অনিন্দ্য ঘোষ	২১৬/216
পার্থর প্রেম — মলয় নিয়োগী	২১৭/217
পুরোনো সেই গাছের কথা — সুবীর চৌধুরী	২২২/222
সাতরঙালু — সত্য মুখোপাধ্যায়	২২৪/224
স্বশিক্ষিত - রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) — দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	২২৯/229
হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলা — সৌমিত্র সিংহ	২৩১/231
ঘটবে কি? — সুদীপ সেনগুপ্ত	২৩৬/236
পরিবেশ অস্বাস্থ্য ও আবাস-নির্মাণ বৃত্তান্ত — কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৮/238
Diary of the FIFA 2022 World Cup Final — Tanmay Sabud	২৪২/242
মেঘবৃষ্টি — প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী	২৪৫/245

অধ্যাপক ভি.এম.এস.আর মূর্তি
অধিকর্তা
অध्यापक वी.एम.एस.आर.मूर्ति
निदेशक
Prof. V.M.S.R. Murthy
Director

IIEST, Shibpur

অধিকর্তার কার্যালয় / निदेशक का कार्यालय / Office of the Director
ভারতীয় প্রকৌশল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, শিবপুর
भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर
INDIAN INSTITUTE OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, SHIBPUR
ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान
An Institute of National Importance under MoE, Government of India

MESSAGE

It gives me immense pleasure to know that GAABESU will be celebrating Global Alumni Day on December 28, 2025. Our alumni, spanning generations from the B.E. College and BESU days to IIEST Shibpur, continue to bring pride to their alma mater and to the nation through their distinguished achievements and unwavering engagement. The occasion of Alumni Day is thus a wonderful opportunity to honor that enduring bond and to reaffirm our shared commitment to the growth and dignity of IIEST.

This year's celebration carries special significance, as IIEST Shibpur marks its **170th Foundation Day**, a milestone in the long and proud legacy of one of India's oldest engineering institutions. Over the decades, our progress in academics, research, and institutional development has been deeply enriched by the generosity and involvement of GAABESU and its members.

Your alumni-backed scholarship programme, supporting hundreds of needy but meritorious students, has played a vital role in ensuring equitable access to quality education at IIEST. The establishment of modern laboratories, including the VLSI lab, and the campus-wide networking through the Alumni LAN Project, has substantially enhanced our research and teaching infrastructure. Likewise, initiatives such as the renovation of crucial campus facilities, from the gymnasium and heritage Slater Hall to hostel amenities and the main gate, reflect alumni dedication to sustaining and improving institutional heritage and student welfare.

Yet, as the Institute evolves, new challenges and requirements emerge. To maintain and enhance our academic and research standards, and to provide a conducive environment for students and faculty alike, there is a clear need to strengthen infrastructure, including upgraded hostels, better student activity and recreation facilities, modernized labs, improved sanitation and drinking-water supply in residences, and enhanced spaces for student innovation and collaboration.

In light of this, I humbly urge GAABESU to continue and expand its support, aligning alumni contributions with these pressing infrastructural priorities. With alumni involvement and institutional collaboration, I am confident that we can transform these goals into reality, thereby creating a campus environment that honors our heritage while rising to meet future aspirations.

On this special occasion, I extend my warmest wishes to all members of the GAABESU family and their families. May the forthcoming Alumni Day deepen our commitment to IIEST, and may this renewed spirit of solidarity pave the way for collective progress and institutional excellence.

01.12.2025

Dated : 1st December, 2025
Place : Howrah

(V. M. S. R. Murthy)

পোঃ বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া-৭১১ ১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত • দূরভাষ ঃ ০৯১-০৩৩-২৬৬৮ ২৬৭৪ • ইমেল ঃ director@iiests.ac.in / vmsrmurthy@iitism.ac.in • ওয়েবসাইট ঃ www.iiests.ac.in
डाकघर : बोटानिक गार्डन, हावड़ा-७११ १०३, पश्चिम बंगाल, भारत • फोन : ०९१-०३३-२६६८ २६७४ • ईमेल : director@iiests.ac.in / vmsrmurthy@iitism.ac.in • वेबसाईट : www.iiests.ac.in
P.O. Botanic Garden, Howrah-711 103, West Bengal, India • Phone : 091-033-2668 2674 • E-mail : director@iiests.ac.in / vmsrmurthy@iitism.ac.in • Website : www.iiests.ac.in

From the Desk of Editor – Alumni Link

It's time to act

Manoj Kar, 1980, E&TC

We have observed a plethora of changes in and around us during last year. After a prolonged stagnancy significant changes are being led by Chairperson, Board of Governors and the new Director.

For GAABESU it is the time to act. In the world of personal or organizational development one concept consistently rises to the top as an essential ingredient for success: taking action. One can have the best-laid plans, set meaningful goals, and be brimming with potential, but without action, none of it will come to fruition.

In line with NEP 2020 framework IIEST has launched a one-semester internship program to complement its traditional eight week summer internship resulting in increased job opportunities for IIEST students. The challenge is to encourage employers to engage students as interns and absorb them if they are found employable. GAABESU is planning to add significant value in this area by leveraging its huge network. Similar such complementary actions are required to be taken jointly with Institute administration to hasten the speed of development. We need to act and act now for the benefit of our beloved alma mater and our own organizational growth.

Procrastination is the silent killer of dreams. It's easy to delay action when you're not feeling motivated or when other distractions seem more urgent. Unfortunately, procrastination can become a habit, and the longer you put something off, the harder it becomes to take action. Combat procrastination by setting deadlines, creating accountability systems, and adopting the "act now" mind set. Often, the hardest part is getting started. Once you begin, you'll find it easier to continue.

In this issue of Alumni Link we are paying homage to two of our legendary alumni on the occasion of their birth centenary by dedicating a separate section. They are Narayan Sanyal and Badal Sarkar, the pride for all of us.

Besides, we have a section of memoirs authored by very senior alumni members of fifties and sixties. We express our sincere thanks and gratitude to them for responding to our requests.

Special thanks go to Sanat-da (Sanat Kumar Ghosh, 1964, Civil) for collecting variety of interesting articles to enrich the contents of this issue. I am also thankful to Samir Saha Poddar (1980, Electrical) for diligently checking the proofs in a very short time.

Happy reading!

Editorial

New Beginnings

Sandeep Chatterjee, 1998, Mechanical

The Indian Institute of Engineering Science and Technology Shibpur (IIEST Shibpur) is the second oldest engineering college in India, after IIT Roorkee. The IIEST Shibpur traces its legacy to the mid-19th century, making it one of India's oldest engineering institutions.

It began in 1843-44, when Civil Engineering classes were introduced at Hindu College, Calcutta, to train engineers for the Public Works Department. A formal Civil Engineering College was established on November 24, 1856 at the Writers' Building in Calcutta. With the founding of the University of Calcutta in 1857, the college gained affiliation and, after a brief period under the Presidency College, it relocated to Shibpur, Howrah in 1880, becoming the Government College, Howrah. It soon added Mechanical Engineering and became fully residential by 1889.

Renamed Bengal Engineering College (BE College) in 1921, the institute grew rapidly, launching postgraduate and doctoral programmes by the 1950s, collaborating internationally, most notably with the University of Wisconsin and establishing itself as a hub for advanced research.

In 1992, the Government of India granted Deemed University status to BE College, formally inaugurated in 1993 by President Dr. Shankar Dayal Sharma. It became a full-fledged university in 2004, renamed Bengal Engineering and Science University (BESU), Shibpur, introducing science programmes alongside engineering. Currently, it is known as Indian Institute of Engineering Science and Technology (IIEST), Shibpur and is the only one, being stuck whether to remain within state control or central control (Maybe we missed becoming an IIT).

With change of guard and a new Director, we are seeing signs of positive change. IIEST Shibpur has launched a master plan to transform and expand its 113-acre campus. The upgradation plan focuses on maximising the institute's carrying capacity and creating academic and research ambience at par with the global standards. The plan will also focus on achieving the sustainability goals, without disturbing the green

cover and water bodies on the campus. The unique historical structures on the campus will be conserved.

For a college with such a huge legacy, the alumni continue to contribute significantly to the development of the institute. The college has established two multi-disciplinary research centres, the Arun and Dhriti Deb Centre of Water and Environmental Studies (ADDCWES) and the Chirasree Centre of Sustainable Infrastructure Development (CCSID), with generous alumni donations.

For those who missed it, one of our distinguished alumni, Dr. Goutam Chattopadhyay (1987 ETC) has been honoured with the Lifetime Achievement Award as ABP Ananda's Sera Bengali 2025.

This year the Alumni Day will be celebrated on Dec 28, 2025. As has been the tradition, the Alumni Day Edition of Alumni Link will be published as a hard copy.

We have a mix of articles, poetry, photographs, technical writing both in Bengali and English to stimulate your intellectual buds.

Happy Reading!!!

President (GAABESU)'s Message

Amitabha Datta. 1974-Civil

Dear Members of the Shibpur Alumni Fraternity,

It is with immense pride and heartfelt warmth that I extend my greetings to you on the joyous occasion of Alumni Day 2025. This year is especially meaningful for all of us, as our beloved alma mater, IIEST Shibpur, has celebrated its 170th Foundation Day—a remarkable milestone in its long and illustrious journey.

For more than a century and a half, our institution—Bengal Engineering College—has stood as a beacon of learning, innovation, and service to society. Its legacy is not confined to the historic grounds of Shibpur, but lives vibrantly through each one of you spread across India and the world. Your achievements, values, and contributions continue to enrich the reputation of IIEST Shibpur and inspire generations to come.

GAABESU, as the collective home of this global alumni community, remains committed to strengthening the bonds that connect us to each other and to our institution. The Alumni Day celebrations are a reminder that no matter where life has taken us, Shibpur is the common thread that ties our memories, aspirations, and relationships together.

This special edition of "Alumni Link" is a tribute to that shared heritage. It recognizes not only the historic 170-year journey of our alma mater, but also the accomplishments of our alumni, the initiatives of GAABESU, and the vibrant spirit that keeps this fraternity thriving.

As President of GAABESU, I take this opportunity to express my deep gratitude to all alumni, volunteers, batch representatives, and well-wishers who have tirelessly supported our activities—be it student scholarships, infrastructural efforts, mentorship programs, or community engagement. Your involvement empowers us to make a meaningful difference.

Let us continue to uphold the values we inherited at Shibpur—excellence, integrity, camaraderie, and service. Let us work together to elevate our alma mater to greater heights and ensure that our legacy remains strong for the next 170 years and beyond.

On behalf of GAABESU, I wish you and your families good health, happiness, and success. May this Alumni Day reconnect us with old friendships, renew our bonds with the institution, and inspire us to build an even stronger Shibpur community.

With warm regards and best wishes,

Report from GAABESU Secretary's Desk

Prosenjit Chakraborty ,1987, Electrical

Welcome to you ALL in this 12th Alumni Day being organized by GAABESU. This idea was first introduced back in 2014 and since that year, we are continuing hosting alumni Day on the last weekend of every year, excepting the two COVID years. We are lucky & privileged that we are being able to organize the Alumni Day celebrations for once again.

For last couple of years, in this report, we have tried to deviate in writing this Secretary's Report and wrote first time, about our completely online EC election and next year, in a different line, about background works of arranging Alumni Day programs. This year also, I am trying to talk about something different.

Last year, we talked about organizing the Alumni Day event involving various agencies, like Donors, Alumni, Advertisers, Printers, Decorators, Caterers, florist, sound & electric technicians, A/V system operators, online communication equipment technicians, Cameraman, groundsmen, cleaners and many other support service providers, and also including performing Artists, trying to make it attractive to alumni & their families and also to the Donors/Advertisers. We also needed to remember, human nature, egos & preferences, status & hierarchy. Last year, we explained worries about the number of attendees, and that's what had actually happened. At the last day, some 100 additional guests appeared and while Lunch had started, we had to make food arrangements, behind the scenes, for those additions. We cannot afford to have a single guest to go unfed, and somehow, with enormous efforts from few volunteers, we managed.

We come back to this Institute, year after year, decades after decades and the common running sentiment is BECollege, now IIEST. However, college does not mean it's buildings, classrooms, playgrounds, ponds, trees, etc but the time, the age, our classmates and teachers. Over last 170 years, thousands of Teachers have passed through this Institution, teaching & examining, educating, may be 40-50000 students. We have heard of great teachers like Dr.Mukherjee of Civil, Dr.Boral of ETC of earlier

years. We have directly interacted with our teachers like Dr.A.K. Seal, Dr.S.K.Sen, Dr.J.K.Sen, Prof.P.N.Banerjee, Prof.Talapatra, Prof.S.J. Mukhopadhyay, Prof.D.N. Ghosh, Dr. Pradip K. Ray, Dr.P.K. Nandi, Dr.C.R. Mahato, Dr.D.N.Ghosh and many others. All our memories of College are built upon the legacies of these great Teachers. Any discussions about BECollege always gets build-up upon memories of these great people. Whatever we have achieved individually, are because of those Teachers. We salute them, we bow to them with our most respected 'Pronams'.

Last year, Chairperson of IIEST BoG Ms.Tejaswini Ananthkumar joined our Alumni Day program personally and also joined us in Lunch. Our Director, Prof.VMSR Murthy and Mrs.Murthy also participated all through. GAABESU interactions with the Institute is really growing day-by-day. This year also, GAABESU representatives were invited to address fresher students during the Institute arranged Welcome program.

However, GAABESU total membership still represent a very small part of our living alumni. Considering approximately 1951-2 as the earliest possible living alumni batch, we might have some 25000+ living alumni. We are trying our best to reach a larger section of alumni all over these 19 years of GAABESU's existence, but there is no harm in accepting that we could not succeed in reaching out to majority alumni. While approaching alumni, particularly, from new millennial generation & more so, from new IIEST age, many-a-times, we are facing questions like "What one would get by being a member of GAABESU?" We cannot just avoid these type of questions. To them, it's a valid point. To the older generation, to us, GAABESU is the platform for "Giving back" to BECollege, to the place, to the system, to our Teachers who taught us the lessons of life, that gave us the footing today, where we stand. For the young, we are still searching an answer, trying to get ourselves more involved in their programs, invent new programs to get them involved.

To conclude, we have a request to Institute authorities – Please recognize GAABESU as the in-situ Alumni Association. It may not be the only one such association, but the only one registered body, located inside the campus, operating for 20yrs, totally dedicated for the development of the Institute & it's students & alumni. We have already written a formal letter few months ago and the response is awaited.

Thanking all of you once again.

Message from the Convener

Global Alumni Day: A time to recapitulate and relish good old days

Netai Chandra Dey, 1986, Mining

I am filled with a sense of joy, pride and nostalgia during writing this message as the convener of the Global Alumni Day of 2025. I am honored to be a part of this great Institute that has shaped generations of engineers. B E college (now as IIEST, Shibpur) Shibpur with its rich history dating back to 1856, has been a beacon of technical education in India.

Our beloved college has given us a community where life was lived, friendships were forged treasure were ignited. It has given us such a bonding that continues to thrive, even decades after we have left its hallowed health. As we gather here, let us celebrate the legacy of our alma mater. Let us reminisce about the countless memories we have made, the challenges we have overcome, and the triumphs we have achieved. Let us acknowledge the unweaving dedication of our faculty and staff who have guided and supported us on our journey.

As alumni, we have the responsibility to give back to our institution in any forms possible for us. We have to work together to strengthen our bond till forever. GAABESU, our global alumni association, plays a crucial role in connecting us and provide a platform to share our experiences, network our fellow alumni, and contribute to the alma mater for its betterment. I earnestly urge all alumni to actively participate in GAABESU's initiatives and events.

I am deeply grateful for the unwavering support and guidance I received throughout this endeavour of making this year's Global Alumni Day a grand success. I extend my heartfelt gratitude to the entire team members for their tireless efforts in making this day a memorable one. I thank all alumni who have contributed in any form to this alumni day and helped to enrich and inspire us to celebrate our heritage and build a brighter future for IIEST Shibpur.

Jai hind!! Jai Bharat!!

OBITUARY LIST 2025

NAME	YEAR	DEPT	DATE
Swapan Chowdhury	1967	CE	28-Mar-25
Gaur Kisor Mukhopadhyay	1976	ARCH	05-Apr-25
Baidya Nath Paul	1967	ME	08-Apr-25
Tanmoy Banerjee	1974	EE	29-Apr-25
Moulir Kishore Chatterjee	1960	CE	04-May-25
Arun Kumar Das	1974	CE	13-May-25
Subas Chandra Ghosh	1957	CE	24-May-25
Subit Mukherjee	1974	ME	25-May-25
Promod Ranjan Datta	1966	CE	22-Jun-25
Ranjit Kumar Ray	1964	MET	24-Jun-25
Profulla De	1967	EE	11-Jul-25
Arya Sengupta	1966	ME	20-Jul-25
Nirmal Basu	1974	CE	12-Aug-25
Shyamal Kishore Chakraborty	1973	CE	07-Sep-25
Hiranmoy Datta	1979	CE	23-Oct-25
Saibal Kumar Ghosh	1968	CE	24-Oct-25
Biswanath Mukherjee	1969	CE	31-Oct-25
Rajendra Narayan Raychaudhuri	1961	CE	03-Nov-25
Dipten Dasgupta	1962	EE	03-Dec-25
Rama Boral	1976	ARCH	12-Oct-25
Suman Ghosh	1991	CE	09-Oct-25
Manas Samanta	1981	ME	20-Sept-25

DONORS LIST 2025

Name	Year	Dept
Syama Prasad Datta	1967	CE
Sukanta Kumar Roy	1977	ETC
Viking Bhattacharya	1999	ME
Debabrata Bhattacharjee	1959	ME
Saumitra Sinha	1981	MET
Prabal Mukherji	1963	ME
Partha Sarathi Bag	1987	ETC
Sushanta Sinha	1988	ETC
Malay Niyogi	1980	EE
Rupak Bhattacharyya	1979	CE
Manoj Kar	1980	ETC
Achyut Ghosh	1961	ME
Amitabha Datta	1974	CE
Jagatjyoti Bhattacharjee	1971	CE
Gautam Roy	1981	EE
Saibal Ganguly	1980	ME
Anup Kar Chaudhury	1980	ME

QATAR ALUMNI CHAPTER

List of Executive Committee Members for 2025-27

Sl.No.	Name	Year & Dept	Position
1	AMITABHA DATTA	1974 CE	President
2	SUKANTA KUMAR ROY	1977 ETC	Vice President
3	MANOJ KAR	1980 ETC	Working President
4	PROSENJIT CHAKRABORTY	1987 EE	Secretary
5	MALAY NIYOGI	1980 EE	Treasurer
6	VINOD KUMAR SINGH	1999 ME	Joint Secretary
7	ARABINDA ROY	1976 ETC	Member
8	RUPAK KUMAR BHATTACHARYYA	1979 CE	Member
9	SANDIP PAL	1979 ME	Member
10	DIPANKAR GUIN	1981 EE	Member
11	NETAI CHANDRA DEY	1986 MIN	Member
12	SUSHANTA SINHA	1988 ETC	Member
13	TANMOY SABUD	1991 ME	Member
14	ASOK ADAK	2000 CE	Member
15	GAUTAM DATTA	2001 ME	Member
16	PARNAB SINHA	2012 CE	Member
17	PRITAM KUMAR ROY	2019 MIN	Member
	PARMANENT INVITEE		
1	Arun Deb	1957 CE	PI
2	Syama Prasad Datta	1967 CE	PI
3	Sujit Das	1971 CE	PI
4	Gautam Ray	1981 EE	PI
5	Anirban Gupta	1989 CE	PI
6	Pratik Dutta	1990 Min	PI

বাদল-দা — যেমন দেখেছি ও জেনেছি

দীপক কুমার গুপ্ত, ১৯৫৯, *সিভিল*

জুলাই ১৯৬৩, প্যারিস। ফরাসি সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে আমি ও আমার দুই সহকর্মী, শ্যামল বোস ও দুর্গাপদ দাস (যাদবপুর ১৯৬০) প্যারিস পৌঁছোলাম। পৌঁছোবার পরের দিনই আমাদের Besacon-এ (উচ্চারণ বেজাসঁ) পাঠিয়ে দিল ফরাসি ভাষাশিক্ষার পাঠ্যক্রমে যোগদানের জন্য। এক বুড়ির বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা ওরাই ঠিক করে দিল। বাক্স, পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে সে বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। বাড়িওয়ালি বুড়ি খুবই ভালো। আমাকে তিনতলায় একটা ঘর দিল, ওরা দু'জন দোতলায় থাকল।

Besacon খুব ছোটো, পুরোনো একটা শহর, সুইজারল্যাণ্ডের সীমানার গায়ে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ততোধিক প্রাচীন। সেখানেই সকাল আটটা থেকে ফরাসি ভাষাশিক্ষার ক্লাস। বারোটা থেকে দুপুর দুটো অবধি লাঞ্চ-ব্রেক, বিকেল ছ'টায় ছুটি এবং রাতের খাবার সময়, অর্থাৎ ডিনার টাইম। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা খাবার জায়গা আছে, কিছুটা দূরে, সবাই সেখানেই খেতে যায়, আমরাও তাই করি। পছন্দমতো খাবার পাবার কোনো সুযোগই নেই। যাহা মিলিবে, তাহাই ভক্ষণ করিতে হইবে নচেৎ উপবাস। সবাই যায়, তাই ভিড় হয়। অনেক নতুন নতুন পরিচয় হয়। ওখানেই লতার সাথে আলাপ হ'ল, পাঞ্জাবি মেয়ে, পন্ডিচেরি অরবিন্দ আশ্রমের আশ্রম কন্যা, যেমন পরিষ্কার বাংলা বলে, তেমনি স্বচ্ছন্দ ফরাসিতে কথা বলায়।

একদিন দুপুরে লাঞ্চের খাবার পর আড্ডা চলছে, লতা আছে, দুটো বাংলাদেশী ছোকরাও আছে। এক টাক-মাথা মাঝ-বয়সি ভদ্রলোক হাসিহাসি মুখে আমাদের দিকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কোলকাতা থেকে? আমরা তো সবাই কলকল করে উঠলাম। কেউ বলে ঢাকা, কেউ বলে দুর্গাপুর, সে এক হট্টগোল। একটু ঠান্ডা হলে জিজ্ঞেস করি দাদার পরিচয়। শুনি দাদা বলছেন, আমি সুধীন্দ্র সরকার, তবে আমি বাদল সরকার নামেই বেশি পরিচিত। শিবপুর থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। শুনে তো আমি আনন্দে বিগলিত আত্মহারা। একে বাঙালি তার ওপর শিবপুর। এই সুদুর ফরাসি দেশে অপ্রত্যাশিত। মূহুর্তে ল্যাঙবোট হয়ে গেলাম। আমাদের ঠিকানায় বাদলদা ও লতাকে নিমন্ত্রণ করলাম। সে দিন আবার নাকি বাদলদার বিবাহ-বার্ষিকী। ভাবা যায়। কিচেন টপের ওপর দুধের বোতল দিয়ে লুচি বেললাম। আলুরদমের সাথে দারুণ জমে গেল। বলতে ভুলে গেছি, আমার দুই যেদো (যাদবপুর, অপভ্রংশে 'যেদো') সঙ্গী রান্নার ব্যাপারটা আমার ওপরই চাপিয়ে দিয়েছিল। যদিও বাসনপত্র ধোবার কাজটা ওরাই করত।

ফরাসি ভাষাশিক্ষার পাঠ্যক্রম শেষ হতে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জানানো হল, সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে। বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা তাদের দেশীয় নাচ, গান ইত্যাদি স্টেজে পরিবেশন করবে। আমাদের তো মাথায় হাত। কেউ এগিয়ে এল না। এমনকী পাঞ্জাবি ছেলেগুলোও একেবারে অপদার্থ। ও দিকে ইজরাইল, স্পেন,

আফ্রিকান কিছু দেশ রিহার্সালেই কাঁপিয়ে দিচ্ছে। শেষমেষ ভরসা বাদলদা। মিটিং বসল। ঠিক হল লতা এক টুকরো ভরতনাট্যম নাচবে, বাদলদা মুখে পনের মিনিটের তবলার বোল মুখস্ত করে সঙ্গত বলবে এবং সেইমতো লতা নাচবে। নাচের উপযুক্ত পোশাক পাওয়া যাবে না। কাজেই যা পাওয়া যায় তা দিয়েই লতা কাজ সামলে নেবে। দুটো গান হবে, প্রথমটা 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা...', সমবেত-কণ্ঠে — বাংলা ভাষী, পাঞ্জাবি, মদ্র, ইত্যাদির সমবেত কণ্ঠে, দু'নম্বর পল্লীগীতি, 'ও হুশেন ভাই দামুকদিয়ার চাচা...'। শিল্পী বাদলদা ও আমি। কোনোমতে অনুষ্ঠানটা উতরে গেল। স্থানীয় খবরের কাগজে ছাপা হল, ইত্যাদি। পরের সপ্তাহে বাদলদা তার শিক্ষাক্রম শেষ করে প্যারিস চলে গেলেন। আমরাও দিন পনেরো পরে প্যারিসে ফিরে গেলাম।

প্যারিসে ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়কে জানানোর পরে আমাদের বাসস্থান ঠিক হল প্যারিস শহরতলি Cachan (কাসাঁ) নামে শহরে Pavllion de Cooperation Technique বাড়িতে। সুন্দর বন্দোবস্ত। একই ক্যাম্পাসের মধ্যেই ক্যান্টিন ও অন্যান্য সরকারি বাড়ি। বাদলদা প্যারিস শহরেই কোনো এক জায়গায় থাকার জায়গা পেয়েছে জানি, কিন্তু ঠিকানা না জানায় যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। পরে কীভাবে খুঁজে পেলাম সেটা আর মনে পড়ছে না। ইতিমধ্যে শ্যামল তার বাবার অসুস্থতার খবর পেয়ে দেশে ফিরে গেল। আমি আর দুর্গা থেকে গেলাম। বাদলদা প্যারিস শহরেই একটা পোস্ট অফিস লাগোয়া একটি এক কামরার ঘরে একাই থাকেন। আমি আর দুর্গা মাঝেমাঝেই ওখানে সন্ধ্যাবেলায় হানা দিতাম। তখনই আবিষ্কার হল বাদলদার আসল রূপ। নাটক লেখেন এবং অনবদ্যভাবে পড়ে শোনান। তখনই জানলাম নাটক পড়াটাও একটা শিল্প। তারজন্য বিশেষ গুণ প্রয়োজন। আমরা ভাগ্যবান, লেখকের স্বকণ্ঠে নাটক-পাঠ শুনেছি। তখন বল্লভপুরের রূপকথা লিখছিলেন, কিন্তু হঠাৎ আটকে গেছেন। মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতমের সংস্কৃত পঙ্ক্তি চাই। কলকাতায় মনুদিকে (বাদলদার তুতো বোন) লেখা হয়েছে পাঠানোর জন্য। ইতিমধ্যে বাদলদা তার লেখা নাটক কবি-কাহিনী পড়া শুরু করেছেন। আমরা দু'জন শ্রোতা। পড়া যেমন এগোচ্ছে, আমি তো হেসে গড়াগড়ি। দুর্গা কিন্তু ভাবলেশহীন পাথর হয়ে বসে রইল সারাটা সময়। পাঠ শেষে বাদলদা Ravioli ও bagette (ফরাসি রুটি) খাওয়াল। বাদলদার ঘাড় ভেঙে ডিনার – যেটা প্রায়ই হত এবং সে জন্য আমাদের কোনো বিবেক দংশন ছিল না। খাবার পরে (আমি তখনও হেসে যাচ্ছি), বাদলদা বলল, ৫০% দর্শক হাসল আর ৫০%-এর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। মনে হচ্ছে, লেখাটা ভালো হয়নি; বদলাতে হবে। আমি চেঁচাই, 'না, না, খুব ভালো হয়েছে।' দুর্গা তখনও গম্ভীর। রাত হয়েছে, বাড়ি ফিরবার মেট্রো ধরি। মেট্রোর মধ্যে হঠাৎ দুর্গার খুকখুক হাসি, তারপর হিহি হোহো সরব অট্টহাসি। সামলাতে পারি না, সহযাত্রী লোকজন ভয়ে দূরে সরে যাচ্ছে, কামড়ে দেবে নাকি! দুর্গা হেসেই যাচ্ছে আপনমনে। বলছি 'ওরে থাম, লোকজন এবার পুলিশ ডাকবে।' কোনো হুঁস নেই, হেসেই যাচ্ছে। হস্টেলে পৌঁছে কী হয়েছিল জানি না। যথাসময়ে বাদলদাকে সব বলতে উত্তর শুনি, 'টিউব লাইট'।

৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৩ – নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে উৎসব হবে আমাদের হস্টেলে। নাচ, গান, হুল্লোড় হবে – সব দেশ থেকে আগত সকল স্টাইপেণ্ডধারী পুরুষ ও মহিলাদের অনুরোধ করা হয়েছে, অংশগ্রহণ করার জন্য। বাদলদাও নিমন্ত্রিত। শোনা গেল অনুষ্ঠানে শ্যাম্পেন পরিবেশন করা হবে। সুরারসিক বাদলদা মহাখুশি। তাঁর মনোগত বাসনা বিনা পয়সায় যথেচ্ছ শ্যাম্পেন সেবন, তবে একজনকে থাকতে হবে নিরামিষ, যে অন্যজন সিক্ত (কদর্থে মাতাল) হলে তাকে টেনে ঘরে নিয়ে যাবে। বাদলদা নিশ্চিত যে তিনি অনুষ্ঠানে

শাম্পেন সেবন করবেনই। কী করে বাছাই হবে? অগত্যা টস। আমি টসে হেরে গেলাম অর্থাৎ দুর্গা রইল শ্যাম্পেন পার্টিতে আর আমি রয়ে গেলাম নিরামিষ। মধ্যরাত্রির আগে গান বাজনা দেশ অনুযায়ী। আবারও ইজরাইলের ছেলেমেয়েরা ফাটিয়ে দিল। ভারতের পক্ষে বাদলদা আর আমি গাইলাম সেই 'হুসেন ভাই...' এবং 'ধন ধান্য...'। একটি ভারতীয় মেয়ে (আগে কখনও দেখিনি) তামিল গান গাইল। একটা ছবি তোলা হয়েছিল।

রাত বারোটা বাজল। হ্যাপি নিউ-ইয়ার, নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে শ্যাম্পেন খোলা হল। ছেলেমেয়েদের জোড়ায় জোড়ায় নাচ শুরু হল। দুর্গা আর বাদলদা পানীয় নিয়ে ব্যস্ত। আমি একা বসে নজর রাখছি। হঠাৎ দেখি দুর্গা ভ্যানিস। কোথাও ওকে দেখতে পাচ্ছি না। বাদলদাকে জানাই। তিনিও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ দেখি ভিড়ের মধ্যে দুর্গা একা একাই বিসর্জনের নাচ নাচছে। যারা জোড়ায় জোড়ায় নাচছিল তারাও জোড় ছেড়ে ওর সঙ্গে লাফাচ্ছে। বিপদ বুঝে আমরা দু'জনে দুর্গাকে টেনে বাইরে এনে ওর ঘরে নিয়ে গেলাম। আরও বিপদ, ঘরে পৌঁছেই দুর্গা ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে শুরু করল তিন মাস আগে প্রয়াত বাবার শোকে। সামলাতে না পেরে ওকে রেখেই আমরা দু'জনে আমার ঘরে এসে এক খাটেই শুয়ে পড়লাম। ভোরে উঠে বাদলদা চলে গেলেন।

জানুয়ারি মাসে বাদলদা প্যারিস ছেড়ে চিফ টাউন প্ল্যানার-এর (Chief Town Planner) চাকরি নিয়ে Biafra (নাইজিরিয়ার এক প্রদেশ) গেলেন। কলকাতা থেকে ওনার পরিবার এসে যোগ দিল। পুতুল বৌদি, ছেলে কাবুল ও মেয়ে তুবুলকে নিয়ে তোফা ছিলেন। হঠাৎ নাইজিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের কারণে সব ছেড়ে রাতের অন্ধকারে দেশে পালিয়ে এলেন। তারপর নাটক নিয়েই মেতে রইলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

বামদিক থেকে : দুর্গাপদ দাস, বাদল সরকার, নাইজিরিয়া থেকে আগত অজানা মহিলা ও লেখক

আমাদের বাদলদা

সমীর সাহাপোদ্দার, ১৯৮০, *ইলেকট্রিক্যাল*

কলেজের খাতায় নাম ছিল সুধীন্দ্র সরকার। নাট্যজগতে উনি পরিচিত বাদল সরকার নামে। আমাদের কাছে বাদলদা। বাদলদার দলের তপুদির কাছে বাদলদা; তেমনি তপুদির মেয়ে বাঙ্কুর কাছেও উনি বাদলদা।

১৯৭৫ সালে আমি যখন কলেজে ঢুকি তখন আমি জানতাম না উনি আমাদের কলেজের প্রাক্তনী। বাস্তবিক তার আগে ওনার লেখা বহুরূপীর প্রযোজনায় দু'টি মাত্র নাটক দেখেছিলাম---'পাগলা ঘোড়া', 'যদি আর একবার'। প্রসেনিয়াম থিয়েটার। মঞ্চ নাটক।

কলেজে বাদলদার ব্যাচমেট ছিলেন সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল। নারায়ণবাবু ছিলেন কলেজের নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের হোতা। একবার কলেজের ছাত্ররা নাটক করবে। উৎসাহীদের বলা হল নারায়ণবাবুর সাথে যোগাযোগ করতে। বাদলদা যোগাযোগ করেন। কিন্তু ওনার চেহারা দেখে, ওনাকে দিয়ে দু'-একটা ডায়লগ বলিয়ে নারায়ণবাবু বাদলদাকে বাতিল করে দেন। ওনার মনে হয়েছিল সুধীন্দ্রকে দিয়ে নাটক হবে না।

কী করে যেন খবর পেয়েছিলাম বাদল সরকার কলেজ স্ট্রিটে থিওজফিক্যাল স্যোসাইটির ঘরে নাটক করছেন। ছোটোবেলা থেকে নাটক দেখার শখ, পাড়ার নাটকে করেছিও। এ পর্যন্ত যা দেখেছি সব প্রসেনিয়াম থিয়েটার। আর বেশ কিছু যাত্রা দেখেছি। পাড়ার মাঠে, হলে। হস্টেল থেকে গেলাম থিওজফিতে। 'মিছিল' দেখলাম। দেখতে দেখতে বিমোহিত। খোকা, ছোটো খোকা হারিয়ে গিয়ে পথে পথে মিছিল খুঁজে বেড়াচ্ছে, সত্যিকারের মিছিল। খুঁজতে খুজতে খোকা বুড়ো হয়ে গেছে, তখনও খুঁজে যাচ্ছে একটা সত্যিকারের মিছিল। একদিন খুঁজে পেল মিছিল, সত্যিকারের মিছিল, মানুষের মিছিল। সেই মিছিল, নাটকের কুশীলবদের নিয়ে মিছিল ঘরের মধ্যে দর্শকের মাঝখানে ঘুরছে, চলেছে। এক এক করে দর্শকদের আসন থেকে ডেকে মিছিলে সমাবেশিত করছে। দেখছি, একে ডাকছে, ওকে ডাকছে। আমার ১৮/১৯ বছরের মনটা উদগ্রীব হয়ে রয়েছে কখন আমার সামনে হাত বাড়িয়ে দেবে, আমিও সেই মিছিলে যাব। এবার একটা হাত এল আমার সামনে। এভাবে দেখা গেল এক এক করে দর্শকরা হাতে হাত ধরে মিছিলে চলেছে, কুশীলবরা কখন যে সরে গেছে। দর্শকের মিছিল চলেছে।

কলেজ স্ট্রিট থেকে হাঁটতে হাঁটতে শিবপুর হস্টেলে। এ কী দেখলাম! এভাবে নাটক হয়! করা যায়!

এরপর শুক্রবার হলেই থিওজফিক্যাল স্যোসাইটি ডাকত। হস্টেলের বন্ধুদের নিয়ে গেলাম নাটক দেখতে। 'ভোমা', 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস'। বাংলার গ্রাম এভাবে ভুখা মরছে! ভোমা নাটক। ইংরেজরা এইভাবে আমাদের দেশের ধন সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে! আর ওদের পছন্দের লোককে মসনদে বসিয়ে

দিয়েছে! সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস।

'প্রস্তাব' দেখতে গেছি। ঘরে ঢুকে দেখি বাদলদাকে একটা টেবিলে ওপর শুইয়ে রাখা আছে, চার হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে দড়ির অন্য প্রান্ত জানালার গরাদের সাথে আটকানো। চোখ বাঁধা। সমস্ত দর্শক দড়ির নীচ দিয়ে গলে চেয়ারে বসল। সবার বসা হলে নাটক শুরু। নাটকের শেষে আবার ধাক্কা খেলাম। ঠিকই তো এক সময়ে টাকা পয়সার অস্তিত্ব ছিল না, টাকা পয়সার আবির্ভাবের সাথে সাথে সেই সম্পদ রক্ষা করতে অস্ত্রের যত ঝনঝনানি।

হিরোসিমা নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফাটানো নিয়ে নাটক দেখলাম 'ত্রিংশ শতাব্দী'। মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠছে যুদ্ধ বিরোধিতা, পরমাণু বোমা বিরোধিতা। হাজার বছর ধরে তার ক্ষতির প্রভাব আমাকে হতচকিত করে তুলছে। এসব তো জানতাম না। কেউ বলেনি।

কার্জন পার্কে নাটক দেখতে গেলাম 'হট্টমেলার ওপারে'। লীলা মজুমদারের ছোটো গল্প অবলম্বনে নাটক। নাটক শেষ করে শতাব্দীর কুশীলবরা ঘরে ফিরে গেল। আমি আর কলেজে আমার দু' বছরের সিনিয়র অমিত রায় পার্কে তখনও বসে আছি। আমাদের মনে গেঁথে দিয়েছে এক ভবিষ্যৎ সুন্দর সমাজের স্বপ্ন।

এক নাটক বারবার দেখতে যাওয়ার ফলে আলাপ হয়ে গেল তপুদি, দীপঙ্কর, মুরারিদার সাথে। দীপঙ্করকে একদিন বলেই ফেললাম আমি আর আমাদের বন্ধু প্রলয় লাহিড়ি যে, আমরা ওদের সাথে নাটক করতে চাই। দীপঙ্কর একদিন যেতে বলল বাদলদার বাড়ি ১ নম্বর প্যারি রো। গেলাম। দোতলা বাড়ির নীচের তলার ঘরে মাটিতে সবাই বসে আছে। আমরা দুই বেচারাও বসলাম। একবার বাদলদার প্রথম স্ত্রী, পুতুলদি, ওই ঘরে এসেছিলেন কিছু একটা করতে। বাদলদা আমাদের দু'জনকে বেশ কিছু প্রশ্নটশ্ন করলেন, তারপরে বললেন, আজ আমাদের দলে নিজেদের কিছু কথাবার্তা আছে। আমরা উঠে চলে আসছি, ভাবছি পেছন থেকে ডাক শুনব, অমুকদিন এসো। হল না। যাঃ!

একদিন থিওজফিতে নাটক শুরুর আগে বলা হল, পুতুলদি মারা গেছেন। পুতুলদি শতাব্দীর প্রতিটি প্রযোজনায় কীভাবে অন্তরাল থেকে সাহায্য করতেন বলা হল।

মনোজের স্কুলের, পাড়ার বন্ধুরা ঠিক করল নাটক করা হবে। ওরা তৃতীয় ধারা নাটক দেখেনি। আমার আর মনোজের ওপর দায়িত্ব পড়ল নাটক লেখার। তখন আমরা সুশোভন সরকারের 'ইতিহাসের ধারা' পড়ছি। কীভাবে ধাপে ধাপে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকে ক্রীতদাস প্রথা, সেখান থেকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী সমাজ এবং তা থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ। এটা ছিল বইটার সার কথা। হস্টেলে বসে আমরা দুজনে নাটক লিখে ফেললাম। নাম দিলাম টিরানোসেরাস। প্রসেনিয়াম নাটক কিন্তু নিটোল গল্প নয়। মাথায় বাদলদার লেখা আর নাটকের ধাঁচা ঘুরছে। তারই একটা অক্ষম অনুসরণ। নাট্যকারের নাম হল---মনোজ আর সমীর মিলিয়ে মনোমীর। এরপর আরও দু'-একটা নাটক লেখা হয়েছিল ওইভাবে; মনে পড়ে একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল।

আটের দশকে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অনেক নাট্যদল গড়ে উঠেছিল যারা বাদলদার তৃতীয় ধারার নাটককে আঁকড়ে ধরল। এই নাটকের সুবিধা হল সহজে প্রতিটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়, যদি কোনো নাট্যদল মানুষের কথা বলে মানুষের কাছে প্রায় বিনা খরচায় নিয়ে যেতে চায় তাহলে এর চেয়ে সহজ পন্থা

আর নেই। এভাবে মানুষের কথা নিয়ে নাটক মানুষের কাছে পৌঁছে দেব, এটা একটা দর্শন। বিভিন্ন দল এভাবে নাটক শুরু করলেও এক দশকের মধ্যে তা শুকিয়ে গেল। তার একটা জোরালো কারণ, ছেলেপুলের দল, মানে তখনকার আমরা, মনে করল যেনতেন প্রকারেণ কিছু ডায়লগ পরপর সাজিয়ে বিষয়বস্তু তুলে ধরে প্রায় কোনোরকম অনুশীলন, ওয়ার্কশপ ছাড়া নাটক হাজির করে ফেলা যায়। নাটক রচনার পেছনে যে নাট্যবোধ, সাহিত্য, কাব্যময়তা থাকা দরকার যার প্রত্যেকটি বাদলদার মধ্যে ছিল সেটা আমি যে-দলটিতে অভিনয় করতাম আমরা সকলে বুঝতে সক্ষম ছিলাম না। তাই আমাদের ভেতরকার দুর্বলতা আমাদের ক্ষইয়ে দিল। দল উঠে গেল। অন্য সব দলও তা-ই।

গিয়ে ঢুকলাম পঞ্চম বেদ চর্যাশ্রমে। পঞ্চম বৈদিক নাটকের দলের একটি নাট্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। কাণ্ডারী শাঁওলী মিত্র। কয়েক মাস পরে সেখান থেকে রঙ্গলোক নাটকের দলে যারা প্রসেনিয়ামে নাটক করে। একবার ওদের খুব বিপদে ফেলে দিয়েছিলাম। শো-এর দিন আমাকে অফিসের কাজে বাইরে চলে যেতে হয়। এরপর চলে এল সরকারি অনুদানের প্রকল্প। নাটকের পাণ্ডুলিপি জমা দিতে হবে, সরকার যদি পছন্দ করে তাহলে কপালে অনুদান জুটবে। পকেটের পয়সা খরচ করে নাটক করা আর সম্ভব হচ্ছিল না। অনুদানের পেছনে ছুটতে গিয়ে গ্রুপ থিয়েটার তার চরিত্র হারাল। এই বিপদে কিন্তু তৃতীয় ধারার নাটককে পড়তে হয় না।

আটের দশকে বাদলদা মীরাদিকে বিয়ে করেন। মীরাদি শতাব্দীতে অভিনয় করতেন। বিয়ের পর মীরাদি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে ভর্তি হন। বাদলদাও ওই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করেন। তখন যাদবপুরে উপাচার্য ড. শঙ্কর সেন। বাদলদার আবেদনপত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে হইচই পড়ে যায়। শঙ্কর সেন ও বাদলদা দু'জনেই বি ই কলেজের প্রাক্তনী। সমসাময়িক। ড. সেন বছর তিনেকের ছোটো। উপাচার্য নিজে সুধীন্দ্রদাকে ডেকে নিলেন। কিছু খোশ গপ্পোসপ্পো করার পর বাদলদাকে ওই পাঠক্রমে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হল। ভর্তি তো হল কিন্তু গোল বাঁধল অন্যত্র। তুলনামূলক সাহিত্যের কোর্সে ছিল বাদলদার নাটক, পড়ানোর দায়িত্ব নবনীতা দেবসেনের। নবনীতা বললেন, আমি ওই ক্লাস নিতে পারব না। আমার অত ঔদ্ধত্য নেই বাদলদাকে ওনার নাটক নিয়ে পড়াব। আরও কথা হল, বাদলদার সামনে আমি ক্লাস নিতে পারব না। আমার ক্লাসগুলো উনি নিন, আমি শুনতে রাজি। এই টানাপড়েনে সম্ভবত ফয়সালা হয়েছিল যে, ওই বছরের জন্য বাদলদার নাটক পড়ানো হবে না। ড. সেনের মধ্যস্থতায় এরকম একটা উপায় পাওয়া গেল।

অজিত নারায়ণ বসু (কানুদা) বাদলদার ছোটোবেলার বন্ধু। দু'জনে হরিহর আত্মা। অজিতদা আই আই টি খড়গপুরে পড়াতেন। কী করে যেন তার সাথে আলাপ হল। অবসরের পর তিনি তৎকালীন সরকারের কৃষি দপ্তরের উপদেষ্টা। উনি ব্যক্তিগতভাবে মেদিনীপুরের গ্রামগঞ্জে গিয়ে কৃষি ব্যবস্থার ওপর তথ্যানুসন্ধান করেছিলেন। অত্যন্ত সৎভাবে উনি 'পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও রাজনীতি' একটি বই লেখেন। তাতে কৃষির প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছিলেন, সরকারের সমালোচনা করতে ছাড়েননি। একবার উনি গপ্পো করতে করতে বলছিলেন, ওই বইটার সংস্করণ দরকার, অনেক কিছু বদলে গেছে এই সময়ে। আমার শরীর দিয়ে আর দিচ্ছে না। আমি সূর্যকে (সূর্যকান্ত মিশ্র) বললাম, কয়েকজন কমিউনিস্ট যদি সে দিতে পারে তাহলে তাদের দিয়ে অনুসন্ধানের কাজটা আবার করা যায়। আমি বললাম, ওনাদের কাছে আপনি কমিউনিস্ট চাইছেন!

আপনি ওনাদের কমিউনিস্ট বলে মনে করেন? খুব রেগে গেলেন আমার ওপর।

যাহোক, আমার নাটকে উৎসাহ আছে জানতে পেরে উনি আমাকে বাদলদার সাথে যোগাযোগ করতে বললেন। অজিতদার অনুমোদিত ব্যক্তি অতএব আর কোনো কথা নেই। আমাকে আর সীমাবাবুকে দলে নিয়ে নিলেন। নাটকের মহড়া দেখছি, এখানে ওখানে অভিনয় থাকলে দলের সাথে যাচ্ছি, ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করছি, গ্রাম পরিক্রমায় গিয়েছি কিন্তু নাটকে অভিনয়ের সুযোগ পাচ্ছি না। গ্রাম পরিক্রমা মানে নাটক নিয়ে গ্রামে চলে যাওয়া। নাটক দেখানো ছাড়াও গ্রামের মানুষের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়। এ একটা অতিরিক্ত পাওয়া।

একবার একটা ওয়ার্কশপে বাদলদা বলে চলেছেন, আমরা ওনার কথা শুনে যার যেরকম মনে হচ্ছে সেইমতো শরীরী ভঙ্গিমা ব্যক্ত করছি। প্রায় এক ঘণ্টা উনি বলেছেন। সৌরজগত, পৃথিবী ঠান্ডা হওয়া, প্রথম প্রাণের আবির্ভাব, বিবর্তনের ইতিহাস, মানুষ, সমাজ, পরিবার, দায়বদ্ধতা, সুস্থতার সন্ধান, নাটকে যোগদান, দায়বদ্ধতা...অর্থের পেছনে ধাওয়া করা...নাটক থেকে দূরে সরে যাওয়া, আবার ফিরে আসার চেষ্টা, আবার পরিবারে দায়বদ্ধতার হাতছানি...এভাবে বাদলদা বলে চলেছেন। এক সময়ে সৌগত ভেঙে পড়ে, কাঁদতে শুরু করে। ওর পিছুটান, নাটককে যথাযথ মর্যাদা দিতে না পারা ওকে ভেঙে দেয়।

নাটকে বাদলদা নিচ্ছেন না। আমিও কিছু বলতে পারছি না। মনে আছে একবার রঙ্গলোককে কীভাবে ডুবিয়ে ছিলাম। চাকরি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে রাজস্থানের পোখরানে ১৯৯৮ সালে মাটির নীচে পরমাণু বোমা ফাটানোর পরীক্ষা করা হয় দ্বিতীয়বারের জন্য। এর আগে ১৯৭৪ সালে একই জায়গায় পরীক্ষা হয়েছিল, তার কোড নাম ছিল operation smiling Buddha, এবারের নাম operation shakti। বোমা ফাটানোর মূল কারিগর ছিলেন আবুল কালাম আজাদ, তখন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। বোমা ফাটানোয় সফল হওয়ায় আবুল ফোনে অটলকে জানান, বুদ্ধ হেসেছে। এটা ছিল সফলতার কোড-ভাষা। খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে পরমাণু বোমা ফাটানো নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে বিরোধিতার ঝড় ওঠে। বিরোধিতার আগুনে ঘি পড়ে আমাদের রাজ্যে সুন্দরবনাঞ্চলে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসানোর প্রস্তাব আনায়। প্রায় দশ হাজার মানুষের মিছিল শিয়ালদা ফ্লাই ওভার থেকে ধর্মতলা অবধি আসে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বাদলদা। এর কয়েকদিনের মধ্যে নন্দন চত্বরে শতাব্দীর নাটক হয়, পাশে একটি গোষ্ঠী বোমা ফাটানো নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। বাদলদা সেদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে পরমাণু বোমা বিরোধী একটি বক্তৃতা দেন।

চাকরি শুরুর উনিশ বছরের মাথায় চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। চাকরি করতে কোনোদিন ভালো লাগেনি, একটা বিরক্তিকর ব্যাপার, নেহাৎ উপায় নেই তাই চাকরি করা। তার ওপর হাতের সামনে দিয়ে নানান রকমের নাটক হয়ে চলেছে আমি নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। একদিন দলের ঘরে এসে বাদলদাকে জানালাম, চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি। বাদলদা বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হয়তো ভাবলেন, আমি নাইজেরিয়াতে বহুদিন চাকরি করার পর ফিরে এসে আর চাকরি করিনি। সঞ্চয় যা ছিল তা-ই দিয়ে চালিয়ে নেব ভেবেছিলাম। আর তখন আমার খানিকটা বয়স হয়েছিল। এই ছেলেটা এত কম বয়েসে চাকরি ছেড়ে দিল? কী আর এমন জমাতে পেরেছে? কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

অজিতদা দলের ঘরে এসে আমায় পাশে বসতে বললেন। বুঝলাম বাদলদা জানিয়ে দিয়েছে। অজিতদা পিঠে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দুপুরে কী খেয়েছিস? অজিতদা ভাবছেন আমার খাওয়াদাওয়া চলছে তো? বাদলদা পাশে বসে অন্যদিকে চেয়ে কান খাড়া করে আমার উত্তর শুনছেন। এরপর বেশ কয়েক মাস অজিতদা দেখা হলেই নানা কথাবার্তার মধ্যে কী খেয়ে এলাম জিজ্ঞাসা করে আমার উত্তর শুনে আশ্বস্ত হতেন।

নাইজেরিয়ায় থাকার সময়ে ওখানের বাঙালি ক্লাবে সকলে আসতেন। বাদলদা ওদের নিয়ে নাটক করানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কেউ রাজি হননি, বিশেষত মহিলারা। তখন বাদলদা বললেন, আচ্ছা, আমরা নাটক করব না। কিন্তু এই ঘরে আমরা নাটকের মহড়া দিতে পারি। তাতে কারুর আপত্তি নেই নিশ্চয়? কথা দিচ্ছি কাউকেই মঞ্চে নাটক করতে হবে না। এই প্রস্তাবে সকলে রাজি হয়ে যান, মহিলারাও। বেশ একটা মজার ব্যাপার হবে, সময় কাটবে। এভাবে ওখানে বাদলদা নাটকের সাথে জড়িয়ে ছিলেন।

এবারে আমার সামনে সুযোগ এসে গেল। নাটকে পার্ট পেতে শুরু করলাম। 'মানুষে মানুষে' বলে একটা নাটক হত, সেই নাটকে কোনো ডায়লগ ছিল না। একটি নির্দিষ্ট চরিত্র ছিল---কর্তা; বাকিরা সব জনতা। আমাকে কর্তার ভূমিকায় অভিনয় করতে দেওয়া হল। এক ঘণ্টার নাটকে একদম শেষের দিকে কর্তা জনতার উদ্দেশ্যে গোটা দশেক বিজ্ঞাপনের স্লোগান দেয়, যেমন, সানডে হো অউর মানডে রোজ খাও আন্ডে; মা আমি কত তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছি। এরকম। জনতা প্রত্যেকটা স্লোগান প্রত্যাখ্যান করে ও শেষে কর্তাকে তাড়া করে হটিয়ে দেয়।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মঞ্চ নাটক 'ক্যাপ্টেন হুররা'র ওপরে বাদলদা কাজ করেছেন। ওই নাটককে সম্পাদনা করে এক ঘণ্টায় তৃতীয় ধারার ধাঁচায় নিয়ে আসেন উনি। জঁ পল সার্ত্র রচিত নাটকের অনুবাদ করলেন বাদলদা, নাম দিলেন 'একটি হত্যার নাট্যকথা', আর একটি নাটক যার নাম প্রথমে দিয়েছিলেন 'নদীতে ডুবিয়ে দাও', কয়েকটি অভিনয়ও হয়েছিল ওই নামে, পরে নাম পাল্টে করে দিলেন 'নদীতে'। এগুলো সবই পুরোনো নাটক নতুন করে প্রযোজিত হল। প্রতিটা নাটকেই অভিনয়ের সুযোগ পেলাম। আরও একটি নাটক প্রযোজিত হয়েছিল, নাম 'জন্মভূমি আজ'। এতে আমি অভিনয় করিনি। এই নাটকটির বৈশিষ্ট্য হল তিনটি কবিতা পরপর সাজিয়ে নাটক। প্রথমটি বাদলদার লেখা 'পাখিরা', দ্বিতীয়টি বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা 'জন্মভূমি আজ', তৃতীয়টি মণীভূষণ ভট্টাচার্যের একটি কবিতা।

শতাব্দী নয়, কাচরাপাড়ার দল পথসেনাকে দিয়ে করালেন রক্তকরবী। মূল নাটকটিকে সম্পাদনা করে এক ঘণ্টায় নিয়ে এসেছিলেন। তবে এই নাটকে একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের আগে একটি ছোট্ট এক্ পাতার ভূমিকা লিখেছিলেন। বাদলদা সেই ভূমিকাটিকে অভিনয়ের মধ্যে ঢোকালেন।

একবার ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা শতাব্দীকে নেমন্তন্ন করল নাটক করতে। আমরা 'মানুষে মানুষে' নাটকটা নিয়ে গিয়েছিলাম। পরপর দুটো শো হয়েছিল ওখানে। ট্রেনে যাচ্ছি, তার কিছুদিন আগে বাদলদা পদ্মভূষণ খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। খবরের কাগজে বেরিয়েছে উনি ব্যক্তিগত কারণে ওই পুরস্কার নিতে অপারগ। 'মুক্তিকামী' নামে একটি ছোটো পত্রিকায় বাদলদার পুরস্কার প্রত্যাখ্যান নিয়ে বিরাট করে লিখল। বাদলদাকে বিপ্লবী সাজিয়ে দিল, লাল সেলাম জানাল। প্রশ্ন আমার মনে, হয়তো অন্য কারুর মনেও। বাদলদা

ব্যক্তিগত কারণ বললেন কেন? যদি ব্যক্তিগত কারণই হয়ে থাকে তাহলে কী সেই ব্যক্তিগত কারণ যা সেই সময়ে ছিল না বলে উনি পদ্মশ্রী পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন? শিশির ভাদুরী পদ্মশ্রী খেতাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, সরকারের দিক থেকে জাতীয় নাট্যশালা তৈরির কোনো উদ্যোগ না থাকায় উনি পদ্মশ্রী প্রত্যাখ্যান করছেন। ট্রেনে যেতে যেতে নানা কথা হয়। উনি ভেবেছিলেন, তৃতীয় ধারার নাটককে জনপ্রিয় করতে পদ্মশ্রী খেতাব গ্রহণ সাহায্য করতে পারে। কিন্তু তা হয়নি।

অনেক পরে, ২০০৮ সালে মণিভূষণ ভট্টাচার্য একই কথা বলেছিলেন। মণিভূষণ ছিলেন নকশালপন্থার সমর্থক। তার কবিতাগুলো পড়লেই বোঝা যায়। সাতের দশক থেকে তার লেখা অনেক কবিতা নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালের বইমেলায়। সিঙুর নন্দীগ্রাম নিয়ে রাজ্য সরকারের যখন ল্যাজে গোবরে অবস্থা, মানুষজন তাদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে, তখন একটা অংশের মানুষকে নরম মনোভাবাপন্ন করতে ২০০৮ সালে মণিভূষণের ওই কবিতা সংকলনকে সরকার রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করে এবং কবি সেই পুরস্কার গ্রহণও করেন। আমি যখন মণিভূষণকে ফোনে পুরস্কার নেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করি উনি বলেন, আমার কবিতা কেউ পড়ে না, তাই ভাবলাম এবার থেকে যদি পাঠক সংখ্যা খানিকটা বাড়ে। তা হয়েছে কি? হয়নি।

বাদলদা COPD-র রোগী ছিলেন। দু'-একবার ওনাকে নার্সিং হোমে ভর্তি হতে হয়েছিল। পদ্মশ্রী খেতাব যাদের আছে তারা সেটা কাজে লাগিয়ে সরকার বেসরকারি যেকোনো হাসপাতালে সর্বোচ্চ স্তরে থাকা ও চিকিৎসা পেতে পারে সরকারি খরচে। আরও অনেক সুযোগ পাওয়া যায়। বাদলদা কিন্তু সেই পথে যাননি। প্রতিবার ওনার সামর্থ্য অনুযায়ী স্তরের নার্সিং হোমে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করিয়েছেন।

একবার মানিকতলা অঞ্চলে কর্পোরেশনের কী খেয়াল হল বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখতে শুরু করল বাড়িতে কোনোভাবে জল জমে থাকে কিনা। তাদের মনে হয়েছে ওইসব জমা জল মশার জন্মদাতা; রাস্তার, ড্রেনের জমা জল নয়। বাদলদার পুরোনো বাড়ির বাথরুমে চৌবাচ্চা। তাতে টাইম কলের জল ধরে রাখা থাকে। ওই চৌবাচ্চা রাখা চলবে না। পরিদর্শকরা নিদান দিলে স্বাভাবিক বাদলদা মানতে চাননি। ওরা চলে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে বড়তলা থানা থেকে ডাক পড়ল দেখা করার। বাদলদা বুঝলেন কেন তাকে ডাকা হয়েছে। নাতিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। নিজের পরিচয় দিলেন। শত হলেও পুলিশ তো। তারা কী করে জানবে বাদল সরকার কে? বড়োবাবু হম্বিতম্বি শুরু করেছেন, বাদলদা তখন ঝোলা থেকে পদ্মশ্রীর মানপত্রটি খুলে দেখালেন। এই খেতাবের কথা পুলিশও জানে। ব্যস ম্যাজিক। আর কোনো ঝামেলা হয়নি ওই নিয়ে।

থিওজফি হল, লরেটো স্কুল কোথাও দর্শক ভেঙে পড়েনি। বসবার জায়গা থাকত। এক সময়ে বাদলদা থিওজফি হল ছেড়ে লিন্ডসে স্টিটে সিন্ধ্রি ভবনে গেলেন নাটক করতে। সেখানে অনেকদিন নাটক করেছেন। দর্শক সংখ্যা আরও কমেছে। সিন্ধ্রি ভবনে রোজ নাটক দেখতে আসতেন পরেশ ধর মশাই। পরেশ ধরকে চেনা যাচ্ছে? গীতিকার সুরকার বাঁশিবাদক গায়ক। আকাশবাণীতে কাজ করতেন। তার লেখা সুর করা গান শান্ত নদীটির পটে আঁকা ছবিটি। নাটক শুরুর আনেক আগে পরেশবাবু এসে বসে থাকতেন এক কোণে একটা চেয়ারে। চুপচাপ। বয়েসের ভারে ন্যুব্জ। দর্শক কমে যাওয়া নিয়ে দীপঙ্কর একটা রসিকতা করত। বলত, আমি একদিন পরেশদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি রোজ এখানে আসেন কেন? একই নাটক

বারবার দেখতে আপনার ভালো লাগে? উত্তরে উনি বলেছিলেন, এই বয়েসে একটু নিরিবিলিতে একটু ফাঁকায় ফাঁকায় থাকতে ভালো লাগে।

নতুন শতকে 'মিছিল' নাটক দেখে কিছু প্রশ্ন মনে জাগছে। সাতের দশকে যে নাটক মাথা খারাপ করে দিয়েছিল আজ সেই নাটক নিয়ে প্রশ্ন জাগছে। বিহার ঝাড়খন্ড মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় উড়িষ্যা থেকে খবর আসছে সেখানে গণ আন্দোলন ফেটে পড়ছে। নানা স্তরের, নানা পেশার, নানা জাতের মানুষ তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে জঙ্গি গণ আন্দোলন গড়ে তুলেছে। মনে হচ্ছে মিছিল নাটকের শেষে কুশীলবরা যদি আদিবাসী দলিত লেখক কামার কুমোরের সাজে মিছিলে যোগ দেয় তাহলে মিছিলটা আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে। বাদলদার মতো মাপের মানুষের সামনে সেই নাটক নিয়ে কিছু মন্তব্য করা যা কিনা তিন দশক ধরে বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে, অভিনীত হয়েছে নানা প্রদেশে, বুকের জোর থাকা চাই। আমার সেটা ছিল না। তাই আমি লিখিতভাবে প্রস্তাবটি ওনাকে দিই। দলের ঘরে পড়া হল, সবাই চুপ, উনি একটি মন্তব্যও করলেন না।

রক্তকরবী নাটক নিয়ে কাচরাপাড়ায় একটা গোটা দিন ধরে আলোচনার ব্যবস্থা করা হল। কলেজে পড়াকালীন প্রথম বহুরূপী প্রযোজনা দেখি। তখন থেকে মনে প্রশ্ন ছিল, শেষে নন্দিনীর ডাকে রাজার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে জনতার সাথে মিশে যাওয়া কি আদৌ সম্ভব? কাচরাপাড়ায় সারাদিনের আলোচনা শোনার পর দিনের শেষে আমি একই প্রশ্ন করি বাদলদাকে। মনমতো উত্তর পাইনি। বহু বছর পরে শান্তিপুরের একটি দল কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় রক্তকরবী প্রযোজনা করে ২০২২/২৩ সালে। সেখানে নির্দেশক নাটকের শেষটা অন্যরকমভাবে উপস্থাপনা করেন। মঞ্চে পড়ে থাকা রক্তকরবী থেকে রঞ্জন উঠে আসে; রঞ্জন আর নন্দিনী বিশুপাগল, ফাগুলাল, অধ্যাপক ও অন্যদের নিয়ে মধ্য ভারতের দিকে যাত্রা করে। এবার রক্তকরবী দেখে একটা মুক্তমন নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

বাদলদা একদিন দলের ঘরে এসে বললেন, তখন আমাদের ক্যাপ্টেন হুররার মহড়া চলছে, একটা দুটো শো হয়ে গেছে, বইটা নিয়ে তোমরা দেখতে পারো কীভাবে নাটকটা সম্পাদিত হয়েছে। আমি বইটা নিলাম, বাড়িতে ভালো করে দেখে বইটা ফেরত দেওয়ার সময় বললাম আমার একটা প্রশ্ন আছে। বাদলদা শুনলেন, কিছু বললেন না, সরাসরি সেদিনের মহড়ার কাজে ঢুকে পড়লেন। আর কোনোদিন জানতে চাননি আমার প্রশ্নটা কী ছিল। বইটির তেত্রিশ নম্বর পাতায় ক্যাপ্টেনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ ছিল, যুদ্ধবিরোধী। কেন সেটা সম্পাদিত হয়েছে? ভুল করে না অন্য কারণে?

যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে বাদলদার কোনটা আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ, আমার উত্তর হবে নাট্যরচনা। কাব্যিক নাট্যগুণ সমন্বিত রচনা। এটাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করছি। কিষাণ চন্দর ট্যাক্সি ড্রাইভার নামে একটা বিখ্যাত ছোটো গল্প আছে। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার একটা পেটি কেসে জড়িয়ে পড়ে আদালতে আসতে বাধ্য হয়। সারাদিন অপেক্ষা করে করে তার ডাক আর আসে না। সে বেচারা ঘুমিয়ে পড়ে। তখন সে স্বপ্ন দ্যাখে যে, সে বিচারকের ভূমিকায় একের পর এক মামলায় অত্যন্ত মানবিক রায় দিয়ে চলেছে। ঘুম ভাঙলে সে দ্যাখে আদালত যে জায়গায় ছিল সেখানেই আছে। এই গল্প নিয়ে নাট্যকার অনিল সাহা বিক্রম ও আদালত নামে একটা সরস নাটক লেখেন। রঙ্গলোক নাটকটি প্রযোজনা করে। অত্যন্ত মঞ্চ সফল একটি নাটক। আমি ওই নাটকে অভিনয় করেছি এক সময়ে।

অনিল সাহার নাটকটিকে তৃতীয় ধারার মতো করে প্রযোজিত করতে যেটুকু সম্পাদনা করতে হয়েছিল করলাম। কিন্তু আমি সেখানে থেমে না থেকে মধ্য ভারত থেকে নানা ধরনের গণ আদালতের যেসব রিপোর্ট পাচ্ছিলাম তারই কিছু ঘটনা জুড়ে দিলাম।

একদিন শতাব্দী, পথসেনা, আয়না---তিনটি দলের ছেলেমেয়েরা তাদের লেখা নাটক পড়বেন। সকলে শুনবে, বাদলদাও। সারাদিনের প্রোগ্রাম। একটা ফাঁকা বাড়িতে বসার ব্যবস্থা হয়েছিল। পাশের ভাতের হোটেলে দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। একেকজনের নাটক পড়া হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে। আমার পালা এলে আমি নাটকটা পড়লাম। ব্যস সকলে চুপ। বাদলদাও। বাদলদা বললেন, এখন লাঞ্চ ব্রেক হোক। বেরিয়ে ওই হোটেলে খেতে গেলাম। জুনিয়র ছেলেমেয়েরা খেতে এল, বাদলদা আর সিনিয়ররা কেউ এলেন না। আমরা দোকান থেকে বেরিয়ে গেলে ওরা ঢুকলেন। বুঝলাম তাদের মধ্যে গুরুগম্ভীর কিছু কথাবার্তা চলছে। যাহোক, খাওয়া শেষে আবার বসা হল। এবার বাদলদা বললেন, নাটকটার কয়েকটা জায়গায় রিপিটেশন আছে। দ্বিতীয়ত, তৃতীয় ধারায় কখনও গণ আদালত নিয়ে নাটক হতে পারে না।

আরেকবার বাদলদা তার পুরোনো নাটক পড়বেন ঠিক হয়েছিল, মঞ্চ নাটক। দলের ঘরে আমরা সবাই গোল হয়ে বসেছি। সেদিন নাটক শুনতে অজিতদাও উপস্থিত। বাদলদার নাটক-পড়া শোনাও একটা অভিজ্ঞতা। বই খুলে বাদলদা শুরু করলেন— প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য। অজিতদা পাশ থেকে বলে উঠলেন, বাঃ, বেশ লিখেছিস। খাসা হয়েছে। বলে মেঝেতে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন।

তখন আমাদের শিয়ালদা লরেটো স্কুলের একটা ঘরে মহড়া হত। সিস্টার সিরিল ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। নদীতে ডুবিয়ে দাও নাটকের প্রথম কয়েকটা শো হয়ে গেছে, তারই মহড়া চলছিল। ২০০৩ সাল। বাদলদা মহড়া কক্ষে এসে বললেন, রাষ্ট্রপতি ভবনে আমাদের একটা শো করতে হবে, যেকোনো নাটকের। ওরা আমায় ফোন করেছিল, জানতে চাইছিল আমরা কত টাকা নেব? আমি বলেছি, আমরা বাইরে শো করতে গেলে ১০০০ টাকা নিই, আপনারাও তা-ই দেবেন। সবাই চুপ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথাও শো পেলে আমরা প্রথমে দলের ঘরে আলোচনা করি করব কিনা, তারপর তাদের জানাই। উনি বললেন, আমাকে ওরা পরপর দু'দিন ফোন করেছিল। আমি কথা দিয়েছি। যেতে হবে। আমি বলি, কী নাটক হবে সেটা ঠিক হবে সকলের সাথে কথা বলে। আমি যে যে নাটকে আছি তার মধ্যে কোনোটা হবে কিনা সেটাও আলোচনায় আসবে। কিন্তু যেখানে নাটক হবে সেখানে সাধারণ মানুষ থাকবেন না; থাকবেন রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম, অটলবিহারী এবং এদের সাঙ্গোপাঙ্গোরা। যারা সেদিন পোখরানে পরমাণু বোমা ফাটিয়েছিল। আমার ওখানে গিয়ে নাটক করতে আপত্তি আছে, আর আমি না গেলেও এখানে যারা আছেন তারা ওখানে গিয়ে ওইসব মানুষদের সাথে হাত মেলাবেন। পরে এদের হাতে হাত রেখে আমাকে নাটক করতে হবে। আমি পারব না। বাদলদা বললেন, আমি ওদের কথা দিয়েছি। আমি চুপ, অন্যেরাও চুপ। বাদলদা বললেন, তাহলে তুমি এক কাজ করো, তুমি আবার শাঁওলীর দলে ফিরে যাও, সেখানে নাটক করো।

পরদিন মহড়ায় গিয়ে জানালাম, আগামী দেড় মাস যেসব নাটকের শো করার কথা হয়ে আছে, সেগুলো আমি অবশ্যই করব, তারপরে আর নয়।

শতাব্দী ছেড়ে দেওয়ার পরে মনে হয়নি অন্য কোথাও গিয়ে এর চেয়ে ভালো কিছু পাব। তাই আর

কোথাও যাইনি। অবশেষে পুনঃ মুষিক ভব। চাকরি জীবনে আবার ঢুকে পড়া। আবার ইঁদুর-জীবন শুরু।

মধ্য ভারতে দু' দশকেরও বেশি সময় ধরে জল-জমি-জঙ্গলের লড়াই চালাচ্ছিলেন আদিবাসীরা। সেই লড়াইয়ের অঙ্গ ছিল গণ আদালত। আঞ্চলিক নেতা, মন্ত্রী, বদবাবুদের শায়েস্তা করতে দলিত, আদিবাসীরা গণ আদালত বসান, বিচার হয়, শাস্তি নিরুপণ হয়। তেমনি দলিত আদিবাসীরা জল-জমি-জঙ্গল রক্ষা করতে কর্পোরেটের বিরুদ্ধে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ সবই হওয়া সম্ভব ছিল একটি রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায়। তাদের শায়েস্তা করতে কেন্দ্রের সরকার নিয়ে আসে অপারেশন গ্রিন হান্ট। অপারেশন গ্রিন হান্টের বিরুদ্ধে প্রচারে নামেন অন্ধ্রপ্রদেশের বিখ্যাত ব্যালে গায়ক গদর। তিনি কলকাতায় আসেন। ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে খোলা মঞ্চে একটি প্রচার অনুষ্ঠান হয়। ২০০৯ সাল। তখন আমি নাটক থেকে বহুদূরে ইঁদুর-জীবনযাপন করছি। সেই মঞ্চে অপারেশন গ্রিন হান্টের বিরুদ্ধে গদরের প্রচারাভিযানের সমর্থনে উপস্থিত ছিলেন বাদলদা। গদরকে জড়িয়ে ধরেন, ভাষণ দেন। আমি দর্শকাসনে।

বাদলদা নাটক লিখতেন, অভিনয় করতেন, নাটকের গান লিখতেন ও তাতে সুর করেছেন। বাদলদা কবি, ওনার অনেক কবিতা রয়েছে। বাদলদার আরও একটি গুণ ছিল যা নিয়ে হয়তো কোথাও লেখা হয়নি। বাদলদা দারুণ কোলাজ করতে পারতেন। একটা চৌকো বোর্ডের ওপর ত্রিকোণা অনেক অনেক কাগজ সাঁটিয়েছিলেন, মনে হত দারুণ একটা রঙচঙে ব্যাপার। কিন্তু বোর্ডটা একটু দূরে নিয়ে একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে বোঝা যাবে একটা হিংস্র রাজার ছবি ফুটে উঠছে।

এত গুণ থাকা সত্ত্বেও ভাবা যায় লোকটার হাতের লেখা বেশ খারাপ! খুদে খুদে লেখা। ওনার লেখা পাণ্ডুলিপি মালিনী ছাড়া দলের কেউ পড়তে পারত না। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর দেশ সংখ্যাটি হয়েছে বাদল সরকারকে নিয়ে। প্রচ্ছদে ওনার ছবি, নীচে সই। সইটি দেখলে ওনার লেখার ধরন বোঝা যাবে।

কবিতার কথা যখন উঠলই তখন ওনার একটা কবিতা নীচে রইল। কবিতাটির নাম 'ওরা'।

যে প্রসূতিসদনে তুমি জন্মেছো—
সেটা ওরাই চালায়,
নিয়মকানুন শিখেছো ওদেরই পাঠশালায়, ইস্কুলে
তোমার মনের খাতা পরীক্ষা করে
নম্বর বসায় ওরা,
খেলার মাঠ ওরাই বানিয়ে দিয়ে খেলার নিয়মকানুন শেখায়,
চাকরি দেয় ওরা, মাইনে দেয়,
ছাপিয়ে দেয় তোমার টাকা ওদের ছাপাখানায়,
ওদের রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ে হয় তোমার,
ওদের রেডিয়ো শুনতে দেয় তোমাকে,
টেলিভিশন দেখায়,
তোমার সঙ্গে ওদের কাগজ পড়ে ভাগাভাগি করে,
তোমার রাস্তা সাফ করে দেয়,

তোমার পুলিশকে পোক্ত বানায় শিক্ষা দিয়ে,
মেডেল দেয় তোমাকে, বোনাস দিয়ে উৎসাহ বাড়ায়,
শাস্তি দেয় গোলমাল পাকালে,
রোগ হলে ওদের হাসপাতালে ভর্তি করে,
ওদেরই কলের চুল্লিতে তোমাকে পুড়িয়ে
ছাই ছিটিয়ে দেয় ওদের বাগানে।

তোমাদের কেউ কেউ ওদের হয়ে লড়বে—
সে আর বিচিত্র কী?
যদিও বাকিরা প্রশ্ন করতে শুরু করেছে—
ও শালারা কোথাকার কে?

একবার বাদলদা মানিকতলার রাস্তা পার হচ্ছিলেন। কীভাবে একটা লরি ওনাকে দেখে ব্রেক করে, সামান্য ঘেঁষে দ্রুত চলে যায়। অশক্ত বাদলদা পড়ে যান। ট্র্যাফিক পুলিশ দৌড়ে এসে জিজ্ঞাসা করেন, লেগেছে? বাদলদা বিস্ফারিত নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে বলেন, ভালো লেগেছে। পুলিশটি আবার জিজ্ঞাসা করেন, নম্বরটা দেখেছেন? বাদলদার উত্তর, রাস্তায় চিত হয়ে শুলে আকাশ দেখা যায়, লরির নম্বর কী করে দেখব?

২০১১ সালের ১৩ মে বাদলদা আমাদের ছেড়ে চলে যান। আর সেদিনই পশ্চিমবঙ্গের বুকে পরিবর্তনের নামে আরেকটি বদ শাসক রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়। প্রায় সাড়ে তিন দশকের বদ শাসকের মুখগুলো বদলে যায় মাত্র। সেই ঘটনাকে উদ্‌যাপন করতে, রাঙিয়ে তুলতে পরের দিনের প্রতিটি সংবাদপত্র ভরিয়ে ফেলা হয়; কিছু কাগজে বাদলদার খবরটা আসে না, কোনোটিতে পঞ্চম বা ষষ্ঠ পাতায় ছোটো করে বেরোয়।

সে হোক। তবে বাদলদার তৃতীয় ধারার নাটক বহু বহু দিন চলবে, মানুষকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

মুক্ত থিয়েটারে গান, একটি প্রতিস্পর্ধী উচ্চারণ: আমার জবাব না

অতনু মজুমদার, *সদস্য, শতাব্দী*

(সৌজন্যে : সমীর সাহা পোদ্দার, ১৯৮০, ইলকট্রিকাল)

অন্নবস্ত্র মিছিল, পরমার্থ মিছিল,বিপ্লবী মিছিল, মিলিটারি মিছিল,উদ্বাস্তু মিছিল, বন্যা ত্রাণ মিছিল, শোক মিছিল, প্রতিবাদ মিছিল, উৎসব মিছিল, সিনেমা গুরু মিছিল.... স্বাধীনতা উত্তর পঁচাত্তর বছরে হাজার লক্ষ কোটি সমাবেশের, হাজার লক্ষ কোটি ঢক্কানিনাদের মিছিল দেখতে দেখতে,সহ্য করতে করতে, ক্লান্ত হতে হতে,দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যেতে যেতে, হঠাৎ দেখতে পাওয়া যায় একটা শান্ত অথচ দৃপ্ত,সংযত অথচ প্রত্যয়ী,বিনীত অথচ সাহসী মিছিলের নির্ভীক পদচারণা! না! সেই মিছিলে দাবি দাওয়া সম্বলিত কোন রংয়ের মোড়কে মোড়া ফেস্টুন নেই,নেই কোনো প্ল্যাকার্ড পোস্টার স্লোগানের উদ্ধত ঘোষণা!তবে?কি আছে সেই মিছিলের পরিক্রমায়?আছে একটি আস্থার, বিশ্বাসের, ভরসার সমবেত সুর, যে সুর এক থেকে বহুস্বরে সঞ্চারিত হয়ে যায় কখন যেন অজান্তেই,যে সুর পঁচাত্তর বছরের অমৃত মহোৎসবের কর্ণভেদী প্রবল শব্দ কম্পাঙ্ক কে ম্লান করে দিয়ে সেই সুরে সুর মিলিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হাত শক্ত করে ধরতে এই চরম অবিশ্বাসী সময়েও বিশ্বাসের পালে হাওয়া দিতে উদ্বুদ্ধ করে, যে সুর উপলব্ধির,যে সুর অনুভবের!বাদল সরকারের থিয়েটারে বা তৃতীয় থিয়েটারের গান বা সুরের ব্যবহার সম্পর্কিত কোনো নিবন্ধ লিখতে গেলে,তাঁর লেখা বহু অভিনীত মিছিল নাটকের এই সুরপ্রবাহকে ধারণ করা, জারণ করা বোধহয় প্রাথমিক স্তর।

এ কি শুধুই সুর? শব্দবিহীন কথাবিহীন এক নির্ণায়ক উচ্চারণ কি নয়?বাদল সরকার রচিত নাটকে ব্যবহৃত গানের যে বহমানতা, যে তীব্র বিদ্রুপের শ্লেষের কষাঘাতে একের পর এক গান রচনা এবং সুরারোপ তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে অক্ষরহীন বাক্যহীন এক অস্ফুট মায়াজাল বিস্তার, যা এক ঘণ্টা ধরে বলে চলা অজস্র সংলাপের এক অনিবার্য আবহ,নাটক শেষ হওয়ার পর ঘর-মুখী সব দর্শক শ্রোতাকে আচ্ছন্ন করে রাখে আবিষ্ট করে রাখে এবং এই প্রসঙ্গেই যে বিষয়টির উল্লেখ জরুরি হয়ে পড়ে তা হল বাদল সরকারের নাটকে বা শুধু বাদল সরকারের নাটকেই কেন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিগত প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছরের সফল মঞ্চনাটকেও ব্যবহৃত গানের ক্ষেত্রে একই ভাবে বলা যায় যে মূল নাটকটি পড়া বা দেখা না থাকলে, শুধুমাত্র নাটকে ব্যবহৃত গান বা গানের বিন্যাসকে বিক্ষিপ্ত মনে হতে পারে হতে পারে, কারণ নাটকের গান আসলে নাটকের বিষয়বস্তুরই একটি অংশবিশেষ,বিষয়ের মূল উপজীব্য কে আরো একটু তীক্ষ্ণ করে,কথায় বা সুরে তা কখনো ব্যঙ্গাত্মক কখনো রূপক ধর্মী আবার কখনো নাটকের মূল ঘটনা প্রবাহের সাথে সাযুজ্য

রেখে সমাজ বাস্তবতার তীব্রতায় জারিত। মোটকথা নাটকের গান, বিশেষত বাদল সরকারের নাটকের গান বাকি নাটকের একটি খন্ডাংশ হয়ে মূল নাটকের প্রতিপাদ্য ব্যাতিরেকে কতখানি বোঝানো সম্ভব তা নিয়ে একটা ভাবনা থেকেই যায়,তবুও এই লেখায় এই মুক্ত থিয়েটারের গানগুলি তার প্রেক্ষাপট পশ্চাদপট ছুঁয়ে গানগুলিকে পাঠক মাননে, বিশেষত যারা নাটকগুলি দেখেন নি তাদের একটা আন্দাজ দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে ।

সাগিনা মাহাতো! গৌর কিশোর ঘোষের লেখা বহু পঠিত এই জনপ্রিয় উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিলেন বাদল সরকার! সাগিনা মাহাতো অনেক কারণেই বাদল সরকার কৃত নাট্য সমগ্রের একটি ট্রানজিশন নাটক। প্রথমত এই নাটকটি দিয়েই তার নিজের দল শতাব্দী প্রথাগত মঞ্চের সব অনুশাসন ভেঙে বেরিয়ে এলো নতুন আঙ্গিক খুঁজে পেয়ে। সেই হিসেবে সাগিনা মাহাতো শতাব্দীর একই সাথে প্রসেনিয়াম চর্চার শেষ প্রযোজনা এবং অঙ্গন মঞ্চের প্রথম।দ্বিতীয়ত সাগিনা পূর্ববর্তী নাটক গুলিতে গানের ব্যবহার সম্ভবত পাওয়া যায় না। সাগিনা মাহাতোই প্রথম প্রযোজনা যেখানে একাধিক গানের সংযুক্তি, সেটাও বাংলা ভাষায় নয় উত্তর-পূর্ব ভারতের এক ডাকাবুকো লড়াকু শ্রমিক নেতা সাগিনা। গল্পের বা নাটকের প্রেক্ষাপট বলাটা এখানে খুব জরুরী নয় সেটা হয়তো সবার জানাও।গানগুলি অধিকাংশই ছিল শ্রমিকরা তাদের সারাদিনের কাজের পর হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর ভাটিখানায় যেত বিনোদনের উপাদান হিসেবে সস্তা চোলাই মদ খেত তার সঙ্গে নিজেরা ঢোল পিটিয়ে তারস্বরে গান গাইতো। আগেই বলেছি গান গুলির ভাষা বাংলা নয় বাদলদার মুখেই শোনা, গোয়ানিজ লোকগানের আদল তার মধ্যে একটি গান তো আলাদা করে গান হিসেবেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। চিও চিও চি /উন্ডির মামুই যা /আনিয়া সাঙ্গা কা / মাজুরিচা পিলিয়ন লাগা খিল্মাড্ডুনা কা... শোনা যায় প্রখ্যাত গীতিকার সুরকার সলিল চৌধুরী তার অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গান "ধিতাং ধিতাং বোলে মাদলে তান তোলে "তৈরি করেছিলেন এই গোয়ানিজ লোকগানের আদলেই বাদল সরকারের নাটকে গানের ব্যবহার সম্ভবত সাগিনা মাহাতোই প্রথম।

নাট্য রচনায় হাস্য রসাত্মক সংলাপের ব্যবহার বা আগাগোড়া কমেডির মোড়কে মোড়া কাহিনী বিস্তারে বাদল সরকার একেবারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।নাট্য রচনার শুরুর দিকের আদি পর্বে যখন "শতাব্দী"র ও জন্ম হয়নি সেই সময়কালে, "বড় পিসিমা ","সল্যুশন এক্স"," কবি কাহিনী "এরকম আরো অনেক নাট্য রচনায় হাস্যরস ঘুরেফিরে বারবার এসেছে। বিষয়টির অবতারণা এই জন্যই করা, তা হলো, সেগুলি নিছকই ছিল হাসির জন্য বা হাসাবার জন্য হাস্যরস।পরবর্তীতে বাদল সরকার যখন অঙ্গনমঞ্চে পাকাপাকিভাবে চলে এলেন তারপর থেকে বিভিন্ন নাট্য রচনা এবং নাটকে গানের ভাষ্য রচনায় হাসি হয়তো উপাদান হিসেবে ফিরে এসেছে কিন্তু এসেছে বিদ্রুপের ছলে, ব্যঙ্গের ছলে, সময়ের, সমাজের খারাপ দিকগুলোকে তির্যক ভাবে চিহ্নিত করার সুতীক্ষ্ণ মুন্সীয়ানায়, তা এসেছে আরো শাণিত আক্রমণ হয়ে, আরো ক্ষুরধার হাতিয়ার হয়ে, সেই গান গুলির ভাষ্য সজোরে ঝাঁকুনি দিতে বাধ্য করেছে, চেতনাকে মননকে। বলাবাহুল্য তৃতীয় থিয়েটারে বা মুক্ত থিয়েটারে বাদলদা'র সৃষ্ট এই গানগুলি প্রোসেনিয়াম মঞ্চের জনপ্রিয় গান গুলির মত উৎসাহী শ্রোতার কাছে পৌঁছল না যে, সেটা তাদের দুর্ভাগ্যই বলা যায়।

এই বিদ্রুপের মোড়কে হাস্যরস পরিভাষায় স্যাটায়ার বা আরো বিস্তারে বলতে গেলে বলতে হয়

"ব্ল্যাক কমেডি" তার জ্বলন্ত উদাহরণ নাটক... "খাট মাট ক্রিং" যে নাটকের ভূমিকা পর্বে বাদল সরকার লিখছেন "আমি বিশেষভাবে চেয়েছি কোন গম্ভীর বিষয় হাসির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে, যেমন পেরেছেন চার্লি চ্যাপলিন তার ছবি বিশেষ করে গ্রেট ডিকটেটর''-এ। কিন্তু চ্যাপলিন ক্ষণজন্মা পুরুষ, তার মত ক্ষমতা আমার নেই আমি তার ছবি থেকে প্রেরণা পেতে পারি আর চেষ্টা রেখে যেতে পারি।এখানে বলে রাখা ভালো বাদল সরকার তার নাট্য রচনায় যুদ্ধের বীভৎসা, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, নির্বিচারে মানুষ খুন, আণবিক বিস্ফোরণের দশকের পর দশক জুড়ে তেজস্ক্রিয় প্রতিক্রিয়া, ফলাফল স্বরূপ জন্ম লগ্নের বিকলাঙ্গতা বিভিন্নভাবে বিষয় হয়ে ফিরে ফিরে এসেছে তাঁর অনেক নাটকে উদাহরণস্বরূপ, ভোমা, ত্রিংশ শতাব্দী, প্রলাপ, পরে কোনদিন আরো অনেক নাটক এবং বিশেষভাবে উল্লেখ্য খাট মাট ক্রিং। আগাগোড়া নাটকটিতে সংলাপে এবং গানে কি তীব্র শ্লেষে বিদ্ধ করেছেন সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত মন মানসিকতাকে দু একটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই নাটকের একটি গানের শেষ দুটি পংক্তি "কাল আর আজ মারে আর মরে /খুন হয়ে হয়ে নিজে খুন করে /তা ঝিমঝিম তা ঝিম ঝিম তাম তাকা তাকা তাম "খুন রক্ত মৃত্যুর বীভৎসা নিয়ে এইরকম গান রচনা হয়েছে বাংলায়?মনে হয় না! "কাল আর আজ"," খুন হয়ে হয়ে নিজে খুন "এই বাক্যবন্ধের সহজ নির্বিষ ব্যবহারে কি মিশে নেই,মানুষ খুন, মানুষ মারা, মশা মাছি মারার মতোই আকছার ঘটনা এবং সেই রক্তপাতের পৈশাচিক উল্লাস বোঝাতে "তা ঝিমঝিম তা ঝিমঝিম তাকা তাকা তাম "যেন ছন্দময় নৃত্যের তালে তালে নির্বিচারে নিধনযজ্ঞের উল্লাস।আরো একটি গান এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রহ্লাদ, বশংবদ আজ্ঞাবহ বেতনভুক কর্মচারী। যার নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছের কানা কড়ি দাম নেই সে প্রতিদিন মরে যাচ্ছে প্রতিদিন বেঁচে উঠছে তার এই বেঁচে থাকার সুবিধাবাদী পলায়নপর প্রবৃত্তিকে ধরা হয়েছে যে গানে তার প্রথম দুটি পংক্তি "ছোট খাটো মানুষ আমি সাথে পাঁচে নাই /মতামত ও নেইকো বিশেষ বেঁচে আছি তাই "আর শেষ দুটো পংক্তি "আরও পাঁচজনের সাথে একতালে নাচি /নিরাপদে তাইতো দাদা আজও বেঁচে আছি " যেখানে যত অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে তা সে রাষ্ট্র দ্বারা হোক বা অন্য যা কিছু,তার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা,,নিরাপত্তার বলয়ে নিজেকে আটকে রেখে সময়য়ের মূল স্রোতে ভেসে থাকার অভ্যাস গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে দেওয়ার সুবিধাবাদী মনোভাব যা আমরা আমাদের চারপাশে অযুতে নিযুতে দেখতে পাই বাদলদা'র এই স্যাটায়ারিক গানের ভাষ্য রচনার একটি বৈশিষ্ট্য হলো আপাত নির্বিষ সহজপাচ্য কথা দিয়ে কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার না করে পরোক্ষে তীব্র হুল বিধিয়ে দেওয়ার প্রয়াস।প্রায় সমস্ত নাটকের গানেই তিনি এই অস্ত্র ব্যবহার করেছেন রচনা নির্মাণের সুনিপুণ মেধা ও মুন্সিয়ানায়।

একটি হত্যার নাট্যকথা। পিটার ওয়াইসে-র "মারা-সাদ'' অবলম্বনে অনুবাদ নাটক। পটভূমি ফ্রান্সের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব পরবর্তী মানসিক রোগীদের এক অ্যাসাইলাম। সেখানেও গানের ভাষ্য রচনায় উন্মাদ উদগ্র যুদ্ধবাজদের নিরন্তর যুদ্ধ বাধিয়ে রাখার নিত্য নতুন ফন্দি ফিকিরকে তীব্র শ্লেষের অভিঘাতে লিখছেন ''কত নতুন নেতা এলো /কত নতুন সেনাপতি /কত কথার খেলা হলো /কত প্যাঁচানো মতিগতি / কত ফন্দি যে হল আঁটা/ গেল বন্ধুর মাথা কাটা /কত কুকুরের মত হল/ শত্রুর হাত চাটা''! আবার এই নাটকেই অন্য আরেকটি গানে অসংখ্য অগুনতি সাধারণ, যাদের ঠাঁই হয় হতাহতের দলে, যারা বেঘোরে প্রাণ হারায় যুযুধান দুই দেশের দুই পক্ষের দখলদারির উন্মাদনায়,তাদের পক্ষে লিখছেন "আমরা চিরটাকাল আকণ্ঠ পাঁকে

ডুবে থাকি/ বিপ্লবে আমরাই পড়ে গেছি বিলকুল ফাঁকি!" সহজ আটপৌরে শব্দ দিয়ে কি নিদারুন ভাবে জনসাধারণের অবস্থান বোঝানো হয়েছে!আগেই বলেছি যুদ্ধ, হত্যা, মৃত্যু এই প্রসঙ্গগুলি গানে গানে বারবার ফিরে এসেছে বাদল সরকারের নাটকে, এ প্রসঙ্গে বলাই যায় ফার্নান্দো আরাবেলের নাটক ''পিকনিক অন দ্য ব্যাটল ফিল্ড'' অবলম্বনে বাদলদার অনুবাদ "চড়ুইভাতি'' বাংলার সর্বকালের সর্বযুগের বাধিয়ে দেওয়া যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে মাত্র তিরিশ মিনিট সময়সীমার সর্বশ্রেষ্ঠ এক নাটক বললেও অত্যুক্তি হয় না! আরেকটি উদাহরণ হিসেবে "উদ্যোগপর্ব" নাটকটির কথা ধরা যাক।এ নাটকের শুরুর গানটির প্রথম কয়েকটি পংক্তি "পুরাণ পুরানো কথা তবু সে নতুন/ সে যুগেও খুন হত আজও হয় খুন/খুনোখুনি বেশি পাবে মহাভারতেই /সেদিকে পুরানের তুল্য কিছু নেই!" মহাভারত নামক মহাকাব্য কে নেপথ্যে রেখে যুদ্ধ উন্মাদনার কি আশ্চর্য সহজ বিন্যাস। এ নাটক শেষ হয় আরেকটি গান দিয়ে যে গানের শেষ পংক্তি "এটম হাইড্রোজেন আর নিউট্রন!".. যুদ্ধবাজদের আগ্রাসনে সাধারণ মানুষের অসহায় নির্মম পরিণতি!

শব্দ নিয়ে জাগলারি, শব্দ ভেঙে উদ্ভট উপায়ে শব্দ তৈরি,জিওয়ারিস বা ননসেন্স ভাষার ব্যবহার,উদ্ভট বস্তুর কল্পনা নাটকে তার ব্যবহার, বাদলদার এক অনবদ্য বৈশিষ্ট্য। যদিও এই তৃতীয় থিয়েটারের ওয়ার্কশপ বা কর্মশালার সাথে যারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত আছেন বা ছিলেন কোন না কোন সময়ে, তারা অনুধাবন করতে পারবেন এই ননসেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ কর্মশালারই ফসল। কিন্তু সেই ভাষাকে,শব্দের জাগলারিকে উল্লেখ্য নাটকে ব্যবহারের যে দক্ষতা সেখানে বাদল সরকার বাকি সবার চাইতে অর্থাৎ তার সমকালীন বা পরবর্তী সময়ের সবার থেকে আলাদা একথা একটু স্পর্ধা নিয়েই বলা যায়। উদাহরণ: নাটক "খাট মাট ক্রিং "! নাটকের নামকরনই এক দারুণ জাগলারি। খাট মাট ক্রিং অর্থাৎ খতম করেছে। এ নাটকের একেবারে শেষ সংলাপ বা গান মানুষ মানুষকে খাট মাট ক্রিং অর্থাৎ মানুষ মানুষকে খতম করেছে। এছাড়াও এই নাট্যে "মার্শাল" থেকে "মার শালাকে "পার্লামেন্টারি "থেকে "পাগলা মিলিটারি"," সামরিক" থেকে "শালা মরুক "এ কি শুধুই শব্দের খেলা? তা তো নয়! বিরানব্বই তিরানব্বই সালে নাট্য রচনার প্রায় শেষের দিকের একটি নাটক "ক -চ -ট -ত -প!"সেখানেও শব্দের জাগলারি অথচ আতঙ্কিত অর্থবহ গান বহুজাতিকের আগ্রাসন।বহুজাতিকের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে মধ্যবিত্তের নিঃস্ব হয়ে যাওয়া সর্বস্ব খোয়ানোর এক অপূর্ব ছন্দ ময় গান। "মাল্টি মুল্টি নাশান নিশান আল মাল্টিন্যাশনাল!" কেমন যেন মনে হয় বাদল দা যে আজীবন নাট্যকর্মশালা করেছেন করিয়েছেন অবসরের অন্যান্য সময় কাটানোর বিষয়গুলি ছিল ছবির কোলাজ ছবি নিয়ে খেলা ইত্যাদি এই সমগ্রতার প্রকাশ ঘটেছে তার নাটকে নাটকের গানে বারবার। মস্তিষ্কের কোষে তা থেকেই যায় বিভিন্ন সময়ে অত্যন্ত লাগসইভাবে তার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন না হলে "মাল্টিন্যাশনাল "কে ছন্দবদ্ধ ভাবে ওইভাবে ভাঙ্গা?নাটকটি যারা দেখেছেন তারা বুঝতে পারবেন কুশিলবরা সবাই গোটা অঙ্গন জুড়ে নেচে নেচে গাইছে গানটি!" নাইবা জুটলো চাল বা তেল বা ডাল/ নাই বা রইলো মাথার উপরে চাল/ তবু দেখো কত ইলেকট্রনিক মাল /টিভি ভিসিআর কম্পিউটারের ঢাল/ এনেছে এসব অতি উদার দয়াল / মাল্টিন্যাশনাল /" !বহুজাতিকের কুমিরের হাঁ এর কবলে লক্ষ লক্ষ মানুষ!অসহায় অনিবার্য আগ্রাসন! এরকম স্যাটায়ারের অজস্র উদাহরণ আরো রয়েছে, যাঁরা মুক্তমঞ্চ থিয়েটারের নিয়মিত দর্শক তারা জানেন এমন অনেক নাটক আছে যেখানে নির্দিষ্ট কোন গল্প নেই নির্দিষ্ট কোন চরিত্রের নাম নেই কারণ কোরাস হলো এই

থিয়েটারের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ তাই অনেক নাটকেই চরিত্রের নাম এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ ইত্যাদি আর ব্যবহার করা গানগুলি তাদেরই ছন্দের নৃত্যভঙ্গি তার সাথে মেশানো কথা আর সুর। তবু সংক্ষেপে সেই উদাহরণগুলির কয়েকটি ঝলক দিই। আটের দশকের শেষের দিকের একটি নাটক "বায়োস্কোপ''! রাশি রাশি ইচ্ছাপূরণের সস্তা গল্প নিয়ে সিনেমা বানানো এবং সেন্টিমেন্টাল মেলোড্রামার মোড়কে হাজার হাজার বস্তা পচা সিরিয়াল বানানোকে বিদ্রুপ করা এক প্রাঞ্জল হাসির নাটক।যখন দূরদর্শনের পর্দায় রামানন্দ সাগর পরিচালিত রামায়ণ প্রদর্শিত হতো রবিবার সকাল ন'টা থেকে দশটা।রাস্তাঘাট কার্যত শ্মশানের চেহারা নিত।রবারের মতো টেনে টেনে "এপিসোড'' বাড়িয়ে বাড়িয়ে "এপিকের" পিন্ডি চটকে ছেড়েছিল এই ধারাবাহিক। বাদলদা লিখলেন "এপিসোড এপিকের চটকায় পিন্ড/ জয় রাজা রামানন্দ বোকা বাক্সিন্ড'' লিখলেন ''ঘরে ঘরে বন্দনা পথঘাট ফাঁকা/ শুনশান চারদিক বন্ধ সব চাকা!" ব্রেটোল্ট ব্রেখট এর পৃথিবী বিখ্যাত নাটক "ককেশিয়ান চক সার্কেল" এর বঙ্গীকরণ "গণ্ডি"। যুদ্ধকে বিদ্রুপ করে লিখলেন "চলো চলো যুদ্ধে চলো হুকুম এসেছে /ঘরের দাওয়ায় মা বউ সব কাঁদতে বসেছে।"যুদ্ধের বীভৎসায় এই গানে আরো লিখলেন বিদ্রুপের ছলে "রক্তে রাঙা দুব্বোঘাস আর মুলিবাঁশের ঝাড় / মাংস খেলো শকুনিতে কুকুর নিল হাড়''!

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্য বিরোধী নাটক "সাদাকালো'' সে নাটকের শুরুতেই সিনেমার ভাষায় বলি টাইটেল ট্র্যাক একটি দীর্ঘ গান প্রায় দশ মিনিটের সেই গানটিতেই নিহিত সাদাকালো নাটকের নির্যাস যার কয়েকটি লাইন" বড় বড় শহরের বড় বড় বাড়ি সাদাদের /ভালো ভালো ফসলের ভালো ভালো জমি সাদা দের /দামী দামী খনিজের দামী দামী খনি সাদাদের "! যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি অসংখ্য মানুষের মৃত্যু এই বিষয়ে বাদল সরকারের কলম বারবার গর্জে উঠেছে ঝলসে উঠেছে একথা এই লেখায় হয়তো অনেকবারই বলা হয়ে গেল!উপায় নেই যে!আমরা যারা বাদলদার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য পেয়েছি আমাদের অগ্রজরা আরো ভালো বলতে পারবেন তারা দেখেছি শুনেছি জেনেছি বিভিন্ন আলোচনায় স্টাডি সার্কেলে নাটক পাঠের আসরে শুনেছি বাদলদার মুখেই যুদ্ধ, বোমাবিস্ফোরণ, তেজস্ক্রিয়তা,প্রতিরক্ষা খাতে পাহাড় প্রমাণ অর্থ অপচয়,দেশব্যাপী যুদ্ধ জয়ের জিবির তোলা,জাতীয়তাবাদী উগ্র ঢেউ আছড়ে ফেলার নিরন্তর নির্লজ্জ প্রয়াস,এইসব রক্তাক্ত করেছে বাদল দা কে বারবার। হৃদয়ের অন্তর্গত ক্ষরণকে রূপ দিয়েছেন নাট্য রচনার সংলাপে গানের ভাষায়। তাই মুক্ত থিয়েটার বা বাদল সরকারের থিয়েটারে গানের অধিকাংশই এই অসহায় রক্তপাত বিরোধিতার স্বর।নির্মেদ ঋজু প্রত্যয়ী উচ্চারণ। আবার একই সাথে প্রেমেন্দ্র মিত্র লীলা মজুমদারের গল্প অবলম্বনে নাটক "হট্টমালার ওপারের "গান রচনা করেছেন স্থিতপ্রজ্ঞ বিশ্বাসের গভীর থেকে..." এই দুনিয়ায় যা কিছু দরকারি/ আমরা সবাই মিলে বানিয়ে নিতে পারি /সাধ্যমত খাটবো সবাই / যার যা দরকার নিয়ে যাব / ভাগ করে সব খাব/ এসো ভাগ করে সব খাবো!" আপাতদৃষ্টিতে ইউটোপিক মনে হলেও এইরকম একটা ব্যবস্থার স্বপ্ন কি আমরা দেখি না? দেখবো না?

এতক্ষণ ধরে যা বলেছি তা হলো বাদলদার নাটকে শ্লেষ বিদ্রুপ ব্যাঙ্গে গানের ভাষ্য। আর দুটি নাটকের গানের কথা বলে এ লেখায় ইতি টানবো। যে নাটক দুটিতে হয়তো বা বিরুদ্ধস্বর হয়ে বাদল দা সারা জীবন ধরে যা বলতে চেয়েছেন, লিখতে চেয়েছেন, স্পষ্ট সাহসী প্রত্যয়ী উচ্চারণে নিজের অবস্থানকে

বোঝাতে পেরেছেন।দুটি নাটক ই অনুবাদ নাটক। একটি ব্রিটিশ নাট্যকার “এডওয়ার্ড বন্ডের “,”উই কাম টু দ্য রিভার” তার অনুবাদ “নদীতে’’ অপরটি “জর্জ বার্ণার্ড শ’র আন্দ্রোক্লিস এন্ড দ্য লায়ন’’ অবলম্বনে নাটক “ আন্দ্রোক্লিস ও সিংহ!” নদীতে নাটকটি সম্পর্কে বাদল দা নিজেই লিখেছেন “নাটকটি অনেক বছর আগে লেখা হলেও অগোছালো ছিল”! নয় এর দশকের শেষ দিকে কারগিল যুদ্ধের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে সবার! সেই কারগিল যুদ্ধের নির্লজ্জ যুদ্ধ বন্দনা দেশজুড়ে জাতীয়তাবাদের ঢেউ আছড়ে ফেলার রাষ্ট্রীয় প্রচার,পথে ঘাটে,হাটে মাঠে অসংখ্য গা ভাসিয়ে চলা মূল স্রোতের টিকে থাকার মানুষের কণ্ঠে বীরগাথা, বিজয়ের আস্ফালন, কর্ণভেদী স্তববন্দনা বাদল দাকে আবার বাধ্য করেছিল ফেলে রাখা কলম তুলে নিয়ে অগোছালো নাটকটিতে সম্পূর্ণ রূপ দিতে। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তাক্ত আহত মৃত সৈনিক পৃথিবীর সব যুদ্ধেই যাদের মৃত্যু হয় হাজারে লাখে আর দেশনায়করা রাষ্ট্রনায়করা সুরক্ষিত থাকেন নিরাপদ থাকেন সেই মৃত বা অর্ধমৃত সৈনিকের স্ত্রী এবং তার মা সেই রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে এসে তাদের ঘরের লোককে খুঁজছেন কখনো “একটি পা “খুঁজে পাচ্ছেন কখনো “একটি হাত!” বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যাবে না নাটকটিতে এই দৃশ্যকল্প কি মর্মস্পর্শী ভাবে তৈরি করা হয়েছিল! ক্ষতবিক্ষত দুর্গন্ধময় মৃত অর্ধ মৃতদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা যুদ্ধক্ষেত্রে স্বজন হারা স্বামীহারা বিচ্ছেদ বেদনা কাতর স্ত্রীর সদ্যজাত সন্তানকে কোলে নিয়ে গান” দেশ বাঁচাতে হবে বলে চলে গেলে /দেশের ভিটেয় এমনি আমায় একলা ফেলে/ কোথায় তোমার দেশ কোথায় আমার দেশ!” অথবা একেবারে শেষ পর্বে দুনিয়ার সমস্ত যুদ্ধবাজ আর যুদ্ধ বিরোধীদের চিরকালীন অবস্থানের ফারাক

বোঝাতে মা তার সন্তানকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গাইছেন..” খোকা বলবো তোকে কার জোর কম? বলবো কি বলবো কি তোকে?/ যে টাকা দিয়ে মানুষ কেনে আর বেচে দেয় মন্দার বাজারে /যে মরুভূমিতে কাগজের ফুল সাজায় বলে বাগান করেছে /যে নরকে মানুষের ফৌজ পাঠায় বসাতে নতুন রাজ্যে দরবার / যার গায়ে বিচারকের জোব্বা আর চোখে জল্লাদের জেলা/ তার জোর কম খোকা তার জোর কম “ এবং তার পরেই সেই মায়ের শক্ত মুঠোয় হীন বল ক্ষীন শক্তির চিরন্তন শাশ্বত বিশ্বাসকে কণ্ঠে ধরে.. “ খোকা বলবো তোকে কার জোর বেশি,?/বলবো কি বলবো কি তোকে?খোকা তোর জোর বেশি তোর জোর বেশি / কিছু নেই তোর ছোট্ট দুটো হাত /তবু কুমোরের চাকে দুনিয়া ঘুরছে /গড়ে পিটে উঠছে তোর হাতের মুঠোয় হাতের মুঠোয়!” গান তো নয় যেন সুতীব্র শাণিত আক্রমণ,যুদ্ধবাজদের জন্য এবং নিজের অটুট বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরার প্রচেষ্টা। নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকতে হতো এই নাটকটি দেখার পর।

অত্যন্ত প্রচলিত জনপ্রিয় গণ সংগীতের দুটি পংক্তি “হয় পা চাটা দালাল আর নয়তো এক লড়াকু মজুর হবি তুই/ কোন দিক সাথি কোন দিক বল কোন দিক বেছে নিবি তুই?” একজন সৎ সময় সচেতন নাট্যকার অথবা সংবেদনশীল মানুষের এটাই নির্ধারিত অবস্থান হওয়া উচিত। একজন নাট্যকার বা যে কোনো ধরনের স্রষ্টার গোটা জীবনটাই যদি একটা পরিক্রমা হয় তাহলে হয়তো তিনি পথ চলতে চলতে খুঁজে চলেন তার সুদীর্ঘ পথ চলার লক্ষ্যমাত্রা বা অবস্থানকে সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করতে। বাদল সরকারের” আন্দ্রোক্লিস ও সিংহ” এর প্রতিপাদ্য টি ও সেই যাত্রা পথেরই শেষ বিন্দু। মাঝামাঝি কোন আপোষ নয়, শর্তসাপেক্ষে কোন সমঝোতা নয়,সুনির্দিষ্ট মেরুকরণ করা..আমি কোন পক্ষে! নাটকটিতে দেখা যায় আপাতদরদী সম্রাট শর্তসাপেক্ষে জনমানসে নিজের মহিমাস্তব আরো ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে সরল সাদাসিধে বন্দী আন্দ্রক্লিসের

অনুরোধে কিছু খ্রিস্টানকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করেন এবং যেহেতু আন্দ্রক্লিস সম্রাটের প্রাণ বাঁচিয়েছিল তাই সিংহকে খাঁচায় বন্দি না করে জঙ্গলে তার নিজভূমিতে পাঠিয়ে দেন। যুদ্ধের সেনাপতি, যুদ্ধবন্দী যুবতী সুন্দরী লাভিনিয়াকে প্রেম প্রস্তাব দেন এই শর্তে যে লাভিনিয়া তার প্রস্তাবে রাজি হলে সেনাপতি যুদ্ধও ছেড়ে দিতে রাজি আছেন। কিন্তু লাভিনিয়া তার সহজাত জীবন বোধে জারিত চেতনার বীক্ষণে বুঝতে পারে এসবই তাৎক্ষণিক।বুঝতে পারে সরল আন্দ্রক্লিস মুক্তি পেয়ে উল্লসিত হলেও কারাগার ব্যবস্থাটি লোপ পাচ্ছে না অসংখ্য বন্দী থেকেই যাচ্ছে। বুঝতে পারে একজন সেনাপতি প্রেমের শর্তে যুদ্ধ ছেড়ে দিতে রাজি হলেও অন্য সেনাপতি রা এসে সেই শূন্যস্থান পূরণ করবে ফলে যুদ্ধ নামের জিঘাংসার .অবসান আসলে হবে না। তাই সহাস্যে লাভিনিয়া সে প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলে "যতদিন থাকবে হত্যা/ যতদিন থাকবে দাস/ যতদিন থাকবে যুদ্ধ /যতদিন থাকবে ভয়/ যতদিন থাকবে ঘৃণা /যতদিন থাকবে লোভ /ততদিন থাকবে আমার জবাব না/ না না না!" চিহ্নিত হয়ে যায় পক্ষ,স্পষ্ট হয়ে ওঠে অবস্থান ..এই গানের এই অমোঘ একটি শব্দে" আমার জবাব না "! মুক্ত থিয়েটার বা মুক্তির থিয়েটার বা মুক্তির গান যা সর্ব অর্থে মুক্ত,অর্থের দাসত্ব থেকে মুক্ত,অবাঞ্ছিত অপ্রয়োজনীয় মঞ্চসজ্জার ভার থেকে মুক্ত, বহু জাতিকের বা অন্য সমস্ত ধরনের অনুদান থেকে মুক্ত,সেই থিয়েটারকে সেই গানকে কেন আপোষকামী মধ্যপন্থা নিতে হবে?কেন করতে হবে শর্তসাপেক্ষে সন্ধিপ্রস্তাব?কেন শৃঙ্খলিত হতে হবে উড়ান বন্ধ করতে?.... একটি বৃত্ত সম্পূর্ণতা পায় যেন এই গানের এই শেষ পংক্তিতে... এক স্পষ্ট প্রতিস্পর্ধি,শান্ত অথচ সংযমী অথচ দৃঢ়, ঋজু অথচ প্রত্যয়ী নির্যাস.....আমার জবাব না!!!

ভবিষ্যদ্বাণী

সনৎ কুমার ঘোষ, ১৯৬৪, *সিভিল*

মাঝে মাঝে কলেজের অনেক ঘটনার কথা টুকরো টুকরো ভাবে মনে পড়ে। কিন্তু বেশীর ভাগই শেষ পর্যন্ত এগোয় না, তার আগেই আবছা হয়ে যায়। তবু তার মধ্যেও কিছু কিছু ঘটনা, কিছু কিছু কথা যেন সন্ধ্যার শুকতারার মত জ্বলজ্বল করে। এমনই একটি ঘটনার কথা আজ মনে পড়ছে।

যত দূর মনে পড়ে, ভর্তি হওয়ার পরে ১৯৬০ সালের আগষ্ট মাসে আমাদের ক্লাস শুরু হয়। প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে খুব ধুমধাম করে কলেজের রি-ইউনিয়ন বা বার্ষিক সোশ্যাল হতো। এখনও হয়। তবে নাম পালটে গেছে। নতুন নাম হয়েছে 'রেবেকা'। জানুয়ারিতে হয় না, মার্চ-এপ্রিলের কোন এক সময়ে হয়। এছাড়াও আবার কলেজফেস্ট নামে শুধু বর্তমান ছাত্রদের একটা একদিন বা দু'দিন ব্যাপী একটা অনুষ্ঠান হয়। তবে, আমাদের সময়ে বা তার পরেও বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে যে সৌহার্দ্রের সম্পর্ক আর সৌভ্রাতৃত্ববোধ ছিল, আজ তার অভাবটা বেশ অনুভব করা যায়। এটি বোধহয় সম্ভব হয়েছিল কলেজে সবসময়ের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে আবাসিক থাকার জন্য। যেদিন থেকে কলেজ তার পরিসর বাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হল, আর ডে-স্কলার নিতে শুরু করল, তখন থেকে তার সেই আগের চরিত্র আর রইল না। তাই এখনকার রি-ইউনিয়ন বা রেবেকা-তে প্রাক্তনীরা যোগ দিতে আর উৎসাহ পায় না। ইদানীং গত ২০১৪ সাল থেকে আমাদের প্রাক্তনীদের গ্লোবাল অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন প্রতি বছরের শেষ রবিবারে 'অ্যালামনি ডে' নামে এক সম্মেলনের আয়োজন করে। সেখানে আমরা আমাদের সেই ফেলে আসা রি-ইউনিয়নের স্বাদ ফিরে পাই।

যাই হোক, যে কথা বলার জন্য এই প্রসঙ্গের আবতারণা, সেই প্রসঙ্গে আসি। তখন চার-দিনের রি-ইউনিয়ন হত। একদিন থাকত কলেজের ছাত্রদের করা নাটক ও নানারকমের অনুষ্ঠান, একদিন নামকরা সব আধুনিক গানের শিল্পীদের নিয়ে আধুনিক গানের অনুষ্ঠান, একদিন সারা রাত্রিব্যাপী প্রথিতযশা শিল্পীদের উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান, আর একদিন থাকতো বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে আদান-প্রদান ও প্রশ্নোত্তরের আসর। এটা সাধারণত কোন রবিবার বা জাতীয় ছুটির দিনে দিনের বেলায় হতো, যাতে কর্মরত প্রাক্তনীদের পক্ষে যোগদানের সুবিধা হয়। এই অনুষ্ঠানটির আকর্ষণ আমাদের কাছে এতটাই প্রবল ছিল যে, কলকাতায় থাকলে আমরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতাম-ই। একবার এইরকম এক অনুষ্ঠানে, খুব সম্ভবত ১৯৬৯ সালের পরে সত্তর বা একাত্তর সালে হবে (১৯৬৯ সাল কেন বলছি সেটা পরে প্রকাশ পাবে) প্রক্তনীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক বাদানুবাদ প্রায় যখন শালীনতার শেষ সীমায়, সেইসময়ে হঠাৎ স্টেজে উঠে মাইকটা হাতে নিয়ে ১৯৬২ ব্যাচের সিভিলের সুখেন-দা (সুখেন্দু দাশগুপ্ত) দরাজ গলায় গান ধরলেন,

'পুরানো সেই দিনের কথা .....'। হৈ-চৈ আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে গুঞ্জনে পরিণত হল। গানের শেষের দিকে যখন গাওয়া হচ্ছে, 'হায়, মাঝে হল ছাড়াছাড়ি, গেলাম কে কোথায়—, আবার দেখা যদি হল, সখা, প্রাণের মাঝে আয়।' – ততক্ষণে সভাস্থল একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

ঘোর কাটতে আস্তে আস্তে স্টেজে মাইকের সামনে এলেন নারা'নদা, আমাদের নারায়ণ সান্যাল। ১৯৪৮-এর সিভিলের ব্যাচ। ১৯৬৯ সালে নারা'নদার সত্যকাম বইটি অবলম্বন করে হিন্দি সিনেমা সত্যকাম রিলিজ হয়েছিল। নারানদা স্টেজে উঠতেই চারদিক থেকে আওয়াজ উঠল, 'সত্যকাম কে? সত্যকাম কে—?' কারণ, তখন অনেকেরই ধারণা হয়েছিল সত্যকামের জীবন-কাহিনী হয়তো বা নারা'নদারই জীবনের প্রতিচ্ছবি।

বাকি ব্যাপারটা নারা'নদার জবানীতেই বলি। নারা'নদা সেসব প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে প্রথমেই রি-ইউনিয়নের উদ্যোক্তাদের বললেন, ভাই তোমরা এই রি-ইউনিয়নটি যদি বছরের একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে শুরু কর, তাহ'লে ভালো হয়। আগে থেকে জানা থাকলে আমরাও সেইমত ব্যবস্থা করে অফিসের একটা কাজ নিয়ে কলকাতায় আসতে পারি সরকারী খরচে। আর যদি জানুয়ারী মাসের তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ ও ছাব্বিশ তারিখে করতে পারো, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। উদ্যোক্তাদের বলছি, প্রস্তাবটা ভেবে দেখ ভাই।

এরপরেই প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললেন, আমার কিন্তু কোনদিনই ইঞ্জিনিয়ার হবার ইচ্ছা ছিল না। আমি আসলে সাহিত্যের ছাত্র। আমার প্রথম ভালবাসার বিষয় হচ্ছে বাংলা সাহিত্য। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পরে বাড়ির চাপে ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্সে ভর্তি হই। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পরে একরকম মনস্থির করেই ফেলেছিলাম বাংলা অনার্স নিয়ে পড়ব বলে। বাবা জানতে পেরে বললেন, সাহিত্য-টাহিত্য করবে, সে তো ভালো কথা, কিন্তু উনুন জ্বালাবার ব্যবস্থাটা তো আগে করতে হবে, নইলে খাবে কি? তাই উনুন জ্বালাবার ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করার জন্য বাবার চাপে এই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া। অল্প বয়স থেকেই আমার লেখা-টেখার দিকে ঝোঁক। তবে নাটক লেখার দিকেই ঝোঁকটা ছিল বেশী। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের রি-ইউনিয়নে নাটক হবে। খুব মনোযোগ দিয়ে নাটক করলাম। প্রশংসাও পেলাম খুব। কলেজের মধ্যেও তখন কিন্তু নাটক লেখার কামাই নেই। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে নাটক লেখা চালিয়ে যাচ্ছি। ফার্স্ট ইয়ার শেষ হল। শুরু হল সেকেণ্ড ইয়ার। পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে আমার নাটক লেখার কিন্তু কামাই নেই। একদিন এক সিনিয়র দাদা কি করতে ঘরে এসে আমাকে বাঙলা লিখতে দেখে বলল, কি লিখছো এত মন দিয়ে? বললাম, এই একটা নাটক লেখার চেষ্টা করছি। দেখি, দেখি, করে লেখাটা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। বললেন, বাঃ, তুমি তো চমৎকার লেখো হে ! যাই হোক, পরের বছরে সেকেণ্ড ইয়ারে আমিই কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের ড্রামা-সেক্রেটারী হলাম। সেটা সম্ভবত ১৯৪৫ সাল হবে। সে আমলে হাসির নাটক বিশেষ পাওয়া যেত না। অথচ বার্ষিক সোশ্যালে বা রি-ইউনিয়নে হাসির নাটকই সবাই চায়। ফলে নিজেই লিখে ফেললাম একটি প্রহসন : 'মুশকিল আসান'। নাট্যামোদী কয়েকজন সতীর্থকে পড়ে শোনালাম। তারা রাজী হয়ে গেল। সেটাই মঞ্চস্থ করা হবে। আমিই ড্রামা-সেক্রেটারী, আমিই নাট্যকার আবার আমারই নির্দেশনায় নাটক মঞ্চস্থ হবে। যাকে বলে ত্র্যহস্পর্শ।

প্রথামাফিক সেক্রেটারী হিসাবে নোটিশবোর্ডে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করার

জন্য অভিনেতা বাছাইয়ের জন্য। একে একে হবু অভিনেতারা আসছে, চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে নাটকের একটা সংলাপ পড়তে বলা হচ্ছে। সেইমত অভিনেতা নির্বাচনের পালা চলছে। এমন সময়ে স্কটিশ চার্চ কলেজের আমার এক সহপাঠী, সুধীন্দ্রনাথ সরকার এগিয়ে এসে বলল, 'এই নারান, আমাকে একটা পার্ট দে।'

সুধীনের উচ্চতা পাঁচ ফুট পাঁচের কাছাকাছি। গায়ের রঙ ফর্সা। হাসিটা মিষ্টি। কিন্তু ছেলেটার চেহারাটা মনে কোন দাগ ফেলতে পারলো না। মনে মনে ভাবলাম, একে আর কিসের পার্ট দেবো? ভাবলাম, দেখি, কোন চাকর-বাকরের পার্ট দেওয়া যায় কি না। হাজার হলেও স্কটিশের সহপাঠীর রিকোয়েস্ট। বললাম, ঠিক আছে। নাটকের একটা অংশ দেখিয়ে বললাম, এটা লিখে নিয়ে যাও। ভালো করে পার্ট মুখস্ত করে চারদিন বাদে এসে মহড়ার সময়ে তোমার অংশটুকু বলবে। ছেলেটি খুশি হয়ে ওর পার্টটা লিখে নিয়ে চলে গেল। চারদিন বাদে যথাসময়েই সে এল। বললাম, পার্ট মুখস্ত হয়েছে ? বলল, হ্যাঁ। বলতে বললাম। নিজের পার্টটুকু ও পড়লো। বেশ বাগিয়েই পড়ল। কিন্তু সে বলার মধ্যে না আছে উচ্চারণ ভঙ্গির ঋজুতা, না আছে স্বরের থ্রো বা স্বর ক্ষেপনের ক্ষমতা, না মডুলেশন বা স্বরের ওঠা-নামা। নাটকের পক্ষে খুবই অনুপোযোগী। তিন-চারবার বলার পরেও আমার মনের মত হ'ল না। মুখটা যতখানি দুঃখিত দুঃখিত করে বাধ্য হয়ে বললাম, সুধীন, কিছু মনে করিস না, নাটক তোর দ্বারা হবে না।

সুধীন উঠে দরজার দিকে এগোতে থাকে। আমি আমতা আমতা করে বলি, তুই ইচ্ছে করলে প্রম্পটার হতে পারিস।

ও দরজা অবধি চলে গিয়েছিল। সেখানেই ঘুরে দাঁড়াল। রোষকষায়িত চোখে তীব্রভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা কথা বলে যাই, মনে রাখিস নারান। নাটক লিখে অথবা অভিনয় করে তুই কোনদিন প্রতিষ্ঠা পাবি কি না জানি না, কিন্তু আমি পাব!'

কথাটা এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে কথাগুলো বলেছিল সুধীন্দ্রনাথ, যে আজ কয়েক দশক পরেও সেদিনের ওই ঘটনাটা যেন এখনও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভাসে।

এই পর্যন্ত বলে নারা'নদা একটু থামলেন। তারপরে বললেন, 'মনে থাকার যথেষ্ট হেতু হ'ল, সুধীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল। নাট্যকার হিসাবে আমার প্রথম প্রকাশিত নাট্যগ্রন্থ কলেজের রি-ইউনিয়নে অভিনীত 'মুশকিল আসান'। পরে এই কয়েক দশকে কয়েকটি নাটক লিখলেও তা পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই রয়ে গেছে। পুস্তকাকারে ছাপাবার আর দুঃসাহস হয়নি। নাট্যকার হিসাবে দৌড় আমার ওই পাণ্ডুলিপি পর্যন্তই আর অভিনেতা হিসাবে তো আমার কোন পরিচিতিই নেই।

আর সুধীন্দ্রনাথ সরকার! সেদিনের সেই ছেলেটি, যাকে নাটকের মহড়া থেকে বাদ দেবার পরে বলেছিলাম, তোমার দ্বারা আর যাই হোক, নাটক কোনদিনই হবে না, সে আজ শুধু ভারত নয়, আন্তর্জাতিক নাট্যজগতে একজন খ্যাতনামা নাট্যব্যক্তিত্ব। সে আর কেউ নয়, আমাদের কলেজেরই প্রাক্তনী, বাদল সরকার। আর আমি নাটকের জগৎ থেকে এখন বহু বহু দূরে চলে গেছি।'

Narayan Sanyal – A Tribute

Ashok Chattopadhyay,*1964, Civil*

Narayan Sanyal, whom I came to know as 'Naranda', (b. 26-4-1924), as we know, was a prolific writer of novels of various genres, besides treatise on Civil Engineering. He was basically a civil engineer, an alumnus of Bengal Engineering College, batch of 1948.

In initial phase, his "Dandak Sabari", based on his experiences at Dandakaranya in refugee rehabilitation, brought him in limelight. "Biswasghatak" (1974), based on the ill famous Manhattan Project, Rupamanjari, Satyakam (1965), made into a Hindi film, Pashanda Pandit, Gaja Mukta etc. brought him to the forefront of Bengali literature of the time. His unique story telling style captured the hearts of readers. His writings spread across diverse themes like science fiction, detective stories, adaptations of well-known English novels, technology, engineering, history, art, etc.

I was drawn to his when I read his most exceptional creation "Aparupa Ajanta",that won Rabindra Puraskar in 1969. The book is enriched by his meticulous representation of the numerous Buddhist frescoes in various caves of Ajanta, many of which are in damaged and dilapidated condition. Encouraged by Suniti Kumar Chattopadhyay, he did extensive research to produce such a colossal work that stands as an authentic referral for visitors in times to come.

I was to write a brief note on my acquaintance with Naranda. But before doing that I thought I would only do justice to the subject if I brought out briefly his achievements first. Looking back, I consider working with him even for a brief period was good fortune for me. Now coming to the brass tacks. Sometime in 1971, during the so-called Bangladesh War, I was a young Assistant Engineer, posted in Design Division of Construction Board (PWD) (fresh from North Bengal University Project). One fine morning, Sandeepda (BEC 1958) and myself (BEC 1964) were called by Naranda, our Suptdg. Engineer, to inform that we were being posted to Medinipur on emergency basis to build shelters for the thousands of refugees pouring in from Bangladesh (then East Pakistan) to escape the brutalities of the Pakistani Army. That was the beginning of my close interaction with Naranda on a regular basis during

the ensuing six months or so. We found him a suave, softspoken person, pleasant in his interactions with us, firm in his decisions but very considerate, and a paradigm of simplicity.

Since several lakhs of refugees with women and children, were to be housed in a very short time, we were required to act fast and, in that direction, to simplify the procedures of tendering, billing, apart from selection of various materials etc. Under the guidance of Naranda, we did all these with special approvals obtained from the authorities. It was decided, for example, to divide the jobs into smaller segments and entrust these to local unemployed graduates at estimated cost plus 5% basis, use locally available materials, smoothening the bill payments on a weekly basis etc. These actions were possible because of the trust Naranda reposed in his engineers and his ideas and leadership. His readiness to tread the uncharted path helped in completing the job smoothly and in time.

We had rented a two roomed cottage in Midnapur town for our stay, where somedays, Naranda also stopped over during nights, and we had an opportunity to know him more intimately. A few years later I recall he could not reach my wedding reception due to inclement weather, and sent me a letter of good wishes along with one of his books as presentation.

Narayan Sanyal passed away on 7th Feb., 2005 leaving behind scores of admirers and readers of Bengali literature. Last year passed as his centenary year and I remember him with admiration and reverence.

*****

নারাণদাকে যেমন দেখেছি

মধুজিৎ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৪, *সিভিল*

সৌজন্যে : সনৎ কুমার ঘোষ, ১৯৬৪, *সিভিল*

যতদূর মনে পড়ে নারাণদাকে দেখার আগেই তাঁর নামের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর লেখা 'দণ্ডকশবরী' কিছুদিন হল আত্মপ্রকাশ করেছে। চাকরিসূত্রে তাঁকে দণ্ডকারণ্যে বসবাস করতে হয়েছিল কয়েক বছর। 'দণ্ডকশবরী' সেই অভিজ্ঞতারই এক সার্থক ফসল। এর ফলশ্রুতি, বাংলা ভাষায় একজন শক্তিশালী লেখকের সাহিত্য মঞ্চে আবির্ভাবের ঘোষণা। তার ওপর লেখক তো আবার সাহিত্যসেবী ইঞ্জিনিয়ার। তাই কৌতূহলের মাত্রাটা একটু বেশি। বি ই কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে প্রথম ইঞ্জিনিয়ার সাহিত্যিক যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৯১১ সালের স্নাতক), যার বিখ্যাত কবিতার লাইন 'চেরাপুঞ্জির থেকে ধার দিতে পার একখানি মেঘ গোবি সাহারার বুকে'। অন্য যে সব প্রাক্তন ছাত্ররা সাহিত্যিক হিসাবে কিছুটা স্বীকৃতি পেয়েছেন তারা হলেন নারায়ণ সান্যাল, অভ্র রায় ও কবি বিনয় মজুমদার।

১৯৬৪ সালের বি ই কলেজের প্রাক্তনীদের পুনর্মিলনের উৎসবস্থল, লর্ডসের মাঠজোড়া প্যাণ্ডেলে। মাসটা জানুয়ারি। বি ই কলেজে আমার শেষ বছর। কে যেন জানাল, যে পুনর্মিলন উৎসবে প্রাক্তনীদের মিটিং-এ এবার নারায়ণ সান্যাল আসছেন। চট-জলদি প্যাণ্ডেলে হাজির হলাম। মিটিং শুরু হল যথাসময়ে। এক একজন প্রাক্তন ছাত্র মঞ্চে উঠছেন, তাঁরা তাদের ছাত্রজীবনের কথা, শিবপুরে থাকাকালীন বিভিন্ন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার ছররা পরিবেশন করছেন— যার অধিকাংশই বেশ মজাদার। ছাত্রজীবনে আমি এই ধরনের মিটিং খুবই উপভোগ করতাম। রি-ইউনিয়নে বিভিন্ন লোকের সরস মন্তব্যে যখন সমাবেশ বেশ জমে উঠেছে তখন মঞ্চে উঠলেন সম্ভ্রান্ত চেহারার এক লম্বা ভদ্রলোক, পরনে পাটভাঙা ধুতি আর পাঞ্জাবি, হাতে রি-ইউনিয়ন সংক্রান্ত কোনো স্যুভেনির। মাইকের সামনে এসে তিনি জানালেন তাঁর নাম। তাঁকে মঞ্চে উঠতে দেখে প্যাণ্ডেলের মধ্যে তখন গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। নারাণদা দর্শকদের দিকে চেয়ে প্রথমেই বললেন, 'কী বললেন, আমাকে দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেবেন? অপরাধ নেবেন না। কী দোষ করলাম, বলবেন তো।' এরপর তিনি এক অত্যন্ত সরস বক্তৃতা দিলেন। সেদিন উপযাচক হয়ে নারাণদার সাথে আলাপ করার সাহসটুকু জোগাড় করে উঠতে পারিনি।

এর বছরখানেক পরে একদিন 'মুক্তাঙ্গনে' থিয়েটার দেখতে গেছি। শো আরম্ভ হবার কিছু আগে নারাণদা থিয়েটার প্রাঙ্গণে ঢুকলেন। সঙ্গে বৌদি ও থিয়েটার ক্লাবের জনাদুয়েক লোক। শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে নারাণদা ও বৌদিকে প্রথম সারিতে বসিয়ে দেওয়া হল। নাটকের নাম 'ঠগ', মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন রবি ঘোষ। তখনও তিনি সুবিখ্যাত কমেডিয়ান হয়ে ওঠেননি।

অবশেষে সত্যিসত্যিই নারাণদার সঙ্গে একদিন পরিচয় হল। স্থান হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ। ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ারস (ইণ্ডিয়া)-এর বাৎসরিক সাধারণ সভা। বাৎসরিক এই উৎসব ভারতের কোনো না কোনো শহরে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের ব্যাপ্তি সাধারণত চারদিন। সারা বছরে সংস্থার আর্থিক ও প্রযুক্তির হিসেবনিকেশের সমীক্ষা করার পক্ষে সময়টা পর্যাপ্ত। সেই সুযোগে অনেকেই শহরটা পর্যটকের মতো ঘুরে দেখে নেয় তাদের পরিবার নিয়ে। দুপুরের খাওয়াটা কোনো না কোনো বাণিজ্যিক সংস্থা বহন করে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা বুফে সিস্টেমে। অধিবেশনের প্রথম দিন দুপুরে খাবার সময়ে দেখি নারায়ণ সান্যাল খাবার প্যাণ্ডেলে দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে ওনার স্ত্রী আর কন্যা মৌ। নিরুপদ্রবে সবাই খাচ্ছেন। ওনাদের শান্তিভঙ্গ করার মতো কাছাকাছি কেউ আছে বলে মনে হল না। আমি এই সুযোগটার সদ্ব্যবহারের জন্য ওনাদের কাছে হাজির হলাম।

নিজের পরিচয় দিলাম। পরিচয়পর্ব শেষ হলে খোস গল্প শুরু হল ওই পরিবেশে। যতটুকু সম্ভব। আমরা সেকেন্দ্রাবাদে আলাদা আলাদা হোটেলে ছিলাম। আমরা দু'জনেই সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হলেও আমাদের পেশাগত বিষয় ছিল ভিন্ন। তবু যে ক'দিন নিজামের শহরে ছিলাম রোজই দেখা হত। হায়দ্রাবাদ শহরটা দেখে নেওয়ার এই সুযোগটা আমরা পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছিলাম। টুকটাক কিছু কথাবার্তা হত দেখা হলেই। অন্য একদিন লাঞ্চের সময় যথাস্থানে গিয়ে দেখি টেবিল-ক্লথটি সুন্দরভাবে টেবিলের ওপর পাতা, খাবার তখনও এসে পৌঁছোয়নি। উপস্থিত 'ক্ষুধার্ত' প্রতিনিধিবৃন্দ সবাই খাবারের প্রতীক্ষায়। অধিকাংশের পক্ষে ধৈর্যের শেষ সময় উপস্থিত। শেষমেশ যখন খাবারের প্লেটগুলো ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখা শুরু হল, তখন সব 'ভদ্রসভ্য' ইঞ্জিনিয়াররা (ও তাদের পরিবারবর্গ) খাবারের ওপর যেভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, তা দেখে সভ্য জগতের যে কোনো মানুষ সীমাহীন লজ্জার শামিল হবে। প্রতিনিধিদের পশুপ্রবৃত্তির ক্ষুন্নিবৃত্তি ক্ষান্ত হলে বাসনগুলোতে যেটুকু খাবার পড়ে রইল, বলা বাহুল্য, তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অল্প। তা থেকে যেটুকু সম্ভব খাবার জোগাড় করা গেল।

বেশ খিদে পেয়েছিল। অত্যল্প খাদ্য গলাধঃকরণ করতে তাই বেশি সময় লাগল না। হঠাৎ চোখে পড়ল কিছুদূরে এক গাছের তলায় সপরিবারে নারাণদা দাঁড়িয়ে। ওনার কাছে হাজির হলাম। এ সব কাণ্ড-কারখানা দেখে তিনি বেশ উত্তেজিত। খাবার কথা জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, 'যে দৃশ্য আজ চোখের সামনে দেখলাম, তার পরেও কি খাবার কোনো বাসনা থাকে! এ ঘটনাকে নিন্দা করা মানে পাশবিক ও বন্যকুরুচিকে সম্মান জানানো। আর কী ভাষায় একে নিন্দে করব। ওইভাবে জন্তু-জানোয়ারদের মতো সবাইকে বঞ্চিত করে খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আমি আমার বিবেকের কাছেই বা কী জবাব দিতাম।' জানলাম, ওনাদের কারোরই কিছু খাওয়া হয়নি। তাই যতটা সম্ভব অবশিষ্ট খাবার জোগাড় করে নারাণদাদের হাতে দিলাম। এই পরিস্থিতিতে এর চেয়ে বেশি আর কী-ই বা করতে পারা যায়।

সেকেন্দ্রাবাদে এই ক'দিনের অবস্থানে নারাণদার সঙ্গে এখানে ওখানে দেখা হত। আপনার লেখায় বৈচিত্র্য আছে তো। টুকটাক কথা হত। মনে পড়ে, একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'নারাণদা, আপনার লেখায় বৈচিত্র্য আছে। শুধুমাত্র সৃষ্টিশীল রচনাতেই আপনার লেখনী সীমাবদ্ধ নয়। আপনি জনপ্রিয় অথচ কঠিন বাস্তবকে নিয়ে একটার পর একটা বই লিখে গেছেন। বাঙালি পাঠকেরা আপনার বই থেকে স্থাপত্য-

সম্বন্ধীয় অনেক কিছু জেনেছে ও শিখেছে। আপনি রোঁদ্যার ভাস্কর্যের সঙ্গে কলকাতাবাসীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন যখন শহর কলকাতায় রোঁদ্যার ওপর প্রদর্শনী চলছিল। ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আপনার লিখিত বেশ কয়েকটি বই আছে, যা পাঠককে চমৎকৃত করেছে এবং তারা যথেষ্ট প্রশংসা করতে কোনো কার্পণ্য করেনি। মন্দিরের দেওয়ালের নগ্নতাকে শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। নেতাজী ও রাসবিহারীকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছেন।' 'বিশ্বাসঘাতক'-এর মতো আসাধারণ বইয়ের রচয়িতা আপনি। আবার প্রথাগত বই, যেমন, 'ব্রাত্যঃ বাস্তুবিজ্ঞান', 'গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা' ইত্যাদিও আপনার লেখা। আপনাকে একটা সিধে প্রশ্ন করি, 'লেখেন কেন? না লিখলে কী হয়?'

'অন্তরের চাপে, তা প্রেরণাই বলো, বা উদ্দীপনাই বলো, একবার লিখতে শুরু করলে না লিখে থাকা যায় না। না লিখলে তো মুক্তি নেই, নারাণদা জানালেন তাঁর সহায়হীনতা। আমি জিজ্ঞেস করি, 'আপনার লেখা এত বই, বাজারে কেমন বিকোয়?' প্রত্যক্ষ জবাবে না গিয়ে নারাণদা জানালেন, 'কিছুদিন ধরে লিখতে পারলে লেখকের একটা পাঠকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। অবশ্য রচনাগুলো যদি একটা নির্দিষ্ট মানের হয়। ওদের মধ্যে কয়েকজন অচিরেই লেখকের অন্ধ ভক্ত হয়ে যায়। এদের আনুকূল্যই মূলত লেখককে এগিয়ে নিয়ে যাবার পাথেয়। আমার বই লেখার এরাই মূল প্রেরণা। বোধহয় সাহিত্যিকদের দলগত বিভাজন প্রত্যেক দেশেই আছে। দেখতেই তো পাচ্ছো, যে জন্য আমরা ভারতের সবচেয়ে অগ্রগণ্য সাহিত্যস্রষ্টা ও সমঝদার হিসেবে গণ্য করি, সেখানে দিনের আলোর মতো স্বচ্ছভাবে দেখি আমাদের সাহিত্য মাত্র একটা প্রকাশনার ওপর নির্ভরশীল। আনন্দগোষ্ঠীর সেই দলে বাংলা সাহিত্যিকেরা প্রায় সকলে, আমরা কয়েকজন ছাড়া, যেমন মহাশ্বেতা দেবী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায় আর আমি। এদের কোনো বই আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশ করেনি। এই অল্প ক'জনকে অনেক কঠিন বাস্তবের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়।

আর একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'অজন্তার এতগুলো ছবি আঁকতে কতদিন আপনাকে অজন্তায় কাটাতে হয়েছিল?' নারাণদা হেসে বললেন, 'দু'-দিন'। এবার আমার অবাক হবার পালা। তা দেখে খোলসা করে উত্তর দিলেন, 'অত বড়ো ন্যাশানাল লাইব্রেরিটা কেন আছে? ওখানে হাজির হলে সব খবর মিলবে, যা চাও তুমি, যেমনভাবে চাও।' পরে আমি অজন্তায় গিয়ে দেখেছি পর্যটক বাঙালি ও ওখানকার গাইডরা 'অজন্তা অপরূপা' সম্বন্ধে পুরো মাত্রায় অবহিত।

সেকেন্দ্রাবাদেই ঠিক করে ফেলা হল নারাণদার খড়গপুরে আসার পরিকল্পনা। দিনক্ষণ জানাবেন কলকাতায় পৌঁছে। ওনার দুটো বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। দুপুরেরটা আয়োজক Institution of Engineers Kharagpur Local Chapter। বিষয় ছিল Futurology। তাঁর বই 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' তখন সদ্য প্রকশিত হয়েছে। খড়গপুরে যা বললেন তা মূলত এই বইয়ের অন্তর্গত। তিনি পপুলার সায়েন্সের বিষয়টা উপস্থাপনা করেছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে জনাকয়েক ছিল যারা এ বিষয়ে গবেষণা করেছিল। তাই বক্তৃতার শেষে উপভোগ্য বাদানুবাদ হল। এরপর ওনাকে আমাদের গেস্ট হাউসে নিয়ে গেলাম। ওনার স্ত্রী অর্থাৎ বউদি সঙ্গে ছিলেন।

বিকেলের বৈঠকটি বসেছিল আমাদের স্টাফ ক্লাবে। তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর নতুন বইয়ের পাণ্ডুলিপি 'লা-জবাব দেহলি—অপরূপা আগ্রা'। আলোচনা চলল একে কেন্দ্র করে যে, পাণ্ডুলিপিতে প্রচুর

রেখাচিত্র ছিল। সবগুলোই ওনার হাতে আঁকা। হয়তো অনেকেই জানেন না যে নারাণদা দারুণ ছবি আঁকতে পারতেন। নিজের বইয়ের সব ছবি তিনি নিজেই আঁকতেন। ওপরের উল্লিখিত পুস্তকে দিল্লির স্থাপত্যের ক্রমবিকাশকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনার অনেকটা কেন্দ্রীভূত তাজমহলকে নিয়ে। নারাণদার কথা বলার ভঙ্গী ছিল চমৎকার। আসর বেশ জমে উঠেছিল। তবু একসময় তো থামতে হয়।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর নারাণদা ও বৌদিকে আমার কোয়ার্টারে নিয়ে এলাম রাতের খাবার সমাধা করতে। খাবার পরে দিনশেষের আড্ডা। সে সময় তাঁর উপন্যাস 'সত্যকাম' হিন্দি সিনেমা বিভিন্ন হলে দেখানো হচ্ছে। পত্র-পত্রিকায় সিনেমা সমালোচকরা এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমার কিন্তু সিনেমাটা সেরকম ভালো লাগেনি। তাই জানার ইচ্ছে হল লেখকের কী মত। আপনি তো 'সত্যকাম' নিশ্চয়ই দেখেছেন, আপনার কেমন লেগেছে? তা ছাড়া সিনেমার লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ হলই বা কীভাবে? প্রশ্ন করলাম।

নারাণদা বললেন, 'সে একটা মজার ব্যাপার। একদিন অফিসে যাবার জন্য জুতোর ফিতে বাঁধছি, এমন সময় দেখি এক ভদ্রলোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। একদিকে সেদিন একটা মিটিং থাকার দৌলতে অফিস যাবার তাড়া, তার ওপর আবার উটকো পটকা লোকের আবির্ভাব। লোকটা বাড়ি আসার আর সময় পেল না। আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বেশ কাঠকাঠ গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কী চাই? আমার আজ একটু তাড়া আছে। তাই যা বলবেন তা অত্যন্ত সংক্ষেপে বলুন।' ইতিমধ্যে অন্য লোকের গলার আওয়াজ পেয়ে আমার স্ত্রী ও কন্যা মৌ সেখানে হাজির হল। মৌ ভদ্রলোককে বলল, 'আপনি দয়া করে ভেতরে এসে বসুন।' তারপর আমাকে বলল, 'বাবা, একটু ভেতরে এসো তো।' মেয়ের সঙ্গে পাশের ঘরে গেলাম। মৌ বলল, 'এ তুমি কী করছ, বাবা। ইনি হৃষিকেশ মুখার্জী, বম্বের বিখ্যত হিন্দি ফিল্ম পরিচালক। একটু বিনয়ী হয়ে জিজ্ঞেস করো, কেন তিনি এসেছেন।'

মেয়ের আদেশে গলার স্বরটাকে মোলায়েম করতে হল। জিজ্ঞেস করলাম, 'মহাশয়ের কীসের জন্য আগমন?' ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। তারপর জানালেন, 'আমি আপনার উপন্যাস 'সত্যকাম' ফিল্ম করতে চাই। তাই নিয়ে কথাবার্তা বলতেই এসেছিলাম। তা আপনি আজ ব্যস্ত, অন্যদিন না হয় আসা যাবে। শুধু বলুন, আপনি কি 'সত্যকাম'-এর স্বত্ব কোনো ফিল্মের লোককে দিয়েছেন?' হৃষিকেশবাবুর আগে কোনো সিনেমার লোক আমার কাছে আসেনি। সে কথাই তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, 'আমার লোক আপনার সঙ্গে স্বত্ব কেনার ব্যাপারে যোগাযোগ করবেন আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই। আপনি আপনার সুবিধে মতো সময় দেবেন। পরে আবার দেখা হবে। আজ চলি। নমস্কার।' তিনি উঠে পড়লেন।

আমি তো ভেতর ভেতর খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। সবাইকে বলে বেড়াই, কিন্তু কাউকে মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারি না যে স্বত্বের জন্য কত টাকা চাওয়া যেতে পারে। এই সময়ে মনোজদার কথা মনে হল— সাহিত্যিক মনোজ বসু, জামির লেনে থাকতেন। টেলিফোনে কথা হল। মনোজদা বললেন, 'এটা তোমার প্রথম বইয়ের স্বত্ব বিক্রি। তাই বেশি টাকা চেয়ে বোসো না। আমার মনে হয়, হাজার দুয়েক দিতে চাইলে তাই নিয়ে নিও।

এর ক'দিন পর সত্যি সত্যিই এক সকালে বাড়ির টেলিফোন বেজে উঠল। অপর প্রান্ত থেকে স্বর ভেসে এল, 'মিস্টার নারায়ণ সান্যাল কি আছেন?' 'হ্যাঁ' বলাতে তিনি বললেন, 'আমি রাজশেখর। হৃষিকেশ

মুখার্জীর প্রতিনিধি হয়ে এসেছি আপনার সঙ্গে সত্যকামের deal-টা finalise করতে। আপনার পক্ষে এখন গ্র্যাণ্ড হোটেলে আসা কি সম্ভব হবে?' আমি তখন তো পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যেতে প্রস্তুত। ঘরের নম্বরটা জেনে নিয়ে ওনাকে জানিয়ে দিলাম যে গ্র্যাণ্ডে শিগ্গির আমি হাজির হচ্ছি। ফিটফাট হয়ে আমি গ্র্যাণ্ড হোটেলের উদ্দেশ্যে 'জয় মা' বলে রওনা দিলাম। দেখা যাক বরাতে কী আছে।

যথাসময়ে গ্র্যাণ্ড হোটেলে হাজির হলাম। ঘরের মধ্যে একটা অ্যাটাচি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। সাদর অভ্যর্থনা করলেন রাজশেখরবাবু। একটা চেয়ারে বসতে বললেন। প্রশ্ন – 'চা না কফি ?' তারপর আমাদের কথাবার্তা শুরু হল।

'আপনার বইয়ের স্বত্ব বিক্রির জন্য কত টাকা হতে পারে, নারাণবাবু?' আমি তখন একেবারে আনাড়ি। প্রথম থেকেই নিজে থেকে বলব না, ঠিক করেছিলাম। বললাম, 'আপনারা কত দেবেন বলে ঠিক করেছেন?' উত্তর এল, 'আপনিই বলুন'। দু'জনে 'আপনি বলুন', 'আপনি বলুন' করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠলাম। যত সময় যেতে লাগল, ততই ভেতরে ভেতরে রেগে উঠতে লাগলাম। ভাবলাম, একটা বড়ো সংখ্যা বলে দিই, তারপরে যা আছে কপালে। 'দেব', 'দেব না' করতে করতে নিজের গড়িমসির জন্য আরও কিছুটা সময় গেল। তারপর মরিয়া হয়ে কখন বলে ফেললাম, 'দশ হাজার'।

দ্বিধাহীনভাবে রাজশেখরবাবু হাতে হাত মেলালেন। তারপর উঠে গিয়ে অ্যাটাচিটা খুলে একটা একশো টাকার বাণ্ডিল এনে আমাকে দিলেন। তারপর আবার আমার হাতে হাত মেলালেন। চারিদিকের পরিবেশ এখন অনেকটা শান্ত, টেনশন মুক্ত। মনোজদা বলেছিলেন 'দু' হাজার', আর আমি পেলাম 'দশ হাজার'। আমার এই কৃতিত্ব কখন গিয়ে বাড়িতে জানাব, ছটফট করতে লাগলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কত দিতে প্রস্তুত ছিলেন?' তারপর রাজশেখরের কাছ থেকে যা শুনলাম, তাতে তো আমার চোখ একেবারে ছানাবড়া। রাজশেখর জানালেন, ওই অ্যাটাচিতে আছে পঞ্চাশ হাজার। আপনার চাহিদা পঞ্চাশ হাজারের কম হলে এই টাকা থেকে দিয়ে দিতে বলা হয়েছিল। তাছাড়া আমাকে বলা ছিল যদি টাকার অঙ্কটা এর চেয়ে বেশি হয়, তবে বাদবাকিটা যেন চেকে দিয়ে দিই।

মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। এ যেন জয়ের মুহূর্তে পরাজয়ের মুখোমুখি – খেলার শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি গোলে হেরে যাওয়া। বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই দেখি তোমার বউদি আর মেয়ে উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেটা জনার জন্য এতক্ষণ প্রতীক্ষা। আমি বললাম, 'দশ হাজার।' মেয়ে বলল, 'ওরে ব্বাবা, অনেক তো!' মা ও মেয়ের চোখ-মুখ খুশিতে ভরে গেল। আমি বললাম, 'যা হয়েছে, তা তবে শোন।' পুরো ঘটনাটা ওদের বললাম। সব শোনার পর ওদের মুখ চুপসে গেল। মেয়ে মন্তব্য করল, 'এ-মা, বাবা কী বোকা!' স্ত্রীরও বোধহয় একই ধারণা, যদিও সেদিন তা প্রকাশ করেনি। শুধু বললেন, 'তাই ভাবছি, তোমার মুখ এত শুকনো লাগছে কেন!'

নারাণদা জানালেন, 'হুঁ, 'সত্যকাম' সিনেমা আমি দেখেছি। নিজের লেখা বইয়ের প্রথম সিনেমা দেখাই তো একান্ত স্বাভাবিক। সিনেমাটা ভালোই লেগেছে। ধর্মেন্দ্র সত্যপ্রিয়ের ভূমিকায় ভালোই অভিনয় করেছে' – অর্থাৎ লেখক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর অভিনয়ে সন্তুষ্ট। নারাণদা বলে চললেন, 'যেদিন সিনেমাটি প্রেসের লোকেদের দেখানো হল বোম্বেতে, নিমন্ত্রিত হয়েও কী এক কারণে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যখন 'সত্যকাম'

কলকাতায় রিলিজ করল, তখন সেটা দেখার জন্য ছটফট করতে লাগলাম। বাড়ির কাছে লোটাস সিনেমা হলে 'সত্যকাম' দেখানো হচ্ছিল। এক শনিবার মরিয়া হয়ে লোটাসের সামনে হাজির হলাম 'সত্যকাম' দেখার অভিপ্রায়ে। গিয়ে দেখি সেদিন সব শো-ই হাউস-ফুল। অতঃপর কী করা যায় ভাবছি, এমন সময়ে আমার পাশে এসে কানের কাছে মুখ এনে বলল এক ব্ল্যাকটিকিট বিক্রেতা, 'টিকিট আছে – ডবল দামে নেবেন নাকি?' আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম না। সিনেমা শুরু হতে তখনও আধ ঘণ্টার ওপর সময় হাতে আছে। দেখা যাক, কোনো 'হোয়াইট' টিকিট বিক্রেতাকে যদি পাওয়া যায়! ঘড়ি হু হু করে চলতে লাগল।

একসময়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি যে ছবি শুরু হতে দশ মিনিটও আর নেই। ব্ল্যাক টিকিটওয়ালাকে বললাম, 'দাও, তোমার ব্ল্যাক টিকিটই দাও।' লোকটা বলল, 'আমার সঙ্গে একটু ওদিকে চলুন, স্যার।' আমি লোকটার পেছন পেছন হাঁটতে লাগলাম। ডান দিকে সিনেমার দেওয়ালে হোর্ডিং-এ সিনেমার নায়ক-নায়িকা, কুশীলবদের ছবি। বড়ো করে দেওয়ালে আঁকা সত্যপ্রিয়ের ছবিটা দেখে আমার হৃদয়ের স্পন্দন অন্য রকম হতে শুরু করল, রক্তপ্রবাহ অন্য খাতে বইতে লাগল। মনে হল, এই আমার সৃষ্ট সেই চরিত্র সত্যপ্রিয় আচার্য, যে সত্যের জন্য প্রাণ দিল, সত্য যার জীবনের প্রথম কথা এবং সত্য যার জীবনের শেষ কথা, আর আমি তাকে দেখবার জন্য ব্ল্যাকে টিকিট কিনতে যাচ্ছি। নিজে মনে মনে বলে উঠলাম, 'ছি! ছি!, শেম! শেম!' তারপর ব্ল্যাকারকে বললাম, 'আমার কোনো টিকিটের দরকার নেই।' বলেই জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করলাম। শুনতে পেলাম পেছন থেকে লোকটা বলছে, 'কী লোকটা মাইরি। শালা ভদ্রলোক না পায়জামা।'

এরপর নারাণদার সঙ্গে আর একবারই দেখা হয়েছে। তিনি মাঝেসাজে খড়গপুরে আসতেন অন্য ডিপার্টমেন্টের ছাত্রদের Viva পরীক্ষা নিতে। কোনো ক্ষেত্রেই আগে থেকে খবরটা পাইনি। তাই আর দ্যাখা করা হয়ে ওঠেনি। ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটল। শনিবারের এক অলস দুপুরে বিছানায় শুয়ে 'দেশ' পত্রিকা পড়ছিলাম নারাণদার লেখা তাঁর ডেনমার্ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। রচনাটিতে এক কৃষ্ণকায় মহিলাকে তিনি 'নিগ্রো' বলে অভিহিত করেছেন। 'নিগ্রো' বলতে এক জাতিকে উল্লেখ করা হয়। সাদা ও কালোদের দেশে কাউকে 'নিগ্রো' বলা মানে জাত তুলে গালাগালি দেবার শামিল। সাধারণত তাদের 'ব্ল্যাক' বা 'আফ্রিকান' বা এই জাতীয় কিছু বলা হয়। এই ব্যাপারটা নিয়ে একটা চিঠে লিখে 'দেশ' পত্রিকার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম।

এরপরে অন্য এক শনিবারে আমার চিঠিটা প্রকাশিত হল। শুভানুধ্যায়ীরা বলল, 'কেন লেখকদের পেছনে লাগছ।' নারাণদা কিন্তু চিঠিটার উত্তর দিলেন পত্রিকাতে। তার আকৃতির পরিমাণ আমার চিঠির ছ-গুণ। পড়তেই বোঝা গেল এই জবাবদিহি প্রস্তুত করতে তাঁকে কতটা খাটতে হয়েছে। পরে ওনার সঙ্গে দেখা হলে খুব সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ওইরকম উটকো চিঠির জন্য আমার ওপর রাগ করেননি তো।' সত্যিকথা বলতে কি, নিজেকে দোষী বলে মনে হতে লাগল। নারাণদার কতটা সময় আমি নষ্ট করে দিলাম। তাঁর স্মিত হাসি উত্তরটা জানিয়ে দিল।

শেষবারের মতো নারাণদার সাথে দেখা হয় বছর দুয়েক আগে। খড়গপুরেই। একটা সম্বর্ধনা আসরে। তখন তাঁর বয়স আটাত্তর। ইতিমধ্যে তাঁর এক বিরাট 'স্ট্রোক' হয়ে গেছে। ওই বিশাল আঘাত তিনি যে সামলে উঠেছিলেন তা অসীম করুণা। কলকাতার বইমেলাতে বুকের ব্যথা শুরু হলে তিনি সেখান থেকে ভবানীপুরের চক্রবেরিয়ায় তাঁর বাড়ি অবধি কীভাবে হেঁটে গিয়েছিলেন, তা এক বিস্ময় সন্দেহ নেই। কোনো

এক পত্রিকায় তাঁরই লেখা থেকে তাঁর এই শারীরিক অসুস্থতার কথা জানতে পারি। তিনি যে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন, সে খবরও পেয়েছিলাম। এতদিন পরে তাকে দেখে চিনতে অসুবিধা হয়নি। শুধু শরীরে বয়সের ছাপটুকুর প্রভাব। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে জানলাম যে নারাণদা আমার শারীরিক অবস্থার কথা যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে জানেন। সেদিন অনেকক্ষণ ধরে খোসগল্প করা গেল। তখন কে আর জানত এটাই হবে আমাদের শেষ দেখা। সেদিনের শেষ প্রশ্ন ছিল, 'সত্যপ্রিয়র সত্যতা কতটা – ও কি আপনার পরিচিত কেউ?' নারাণদা চোখ ফিরিয়ে বউদিকে দেখলেন। তারপর আমাকে জবাব দিলেন, 'আমিই সত্যপ্রিয়।' বুঝতে অসুবিধা হল না, নারাণদা তাঁর চাকরি জীবনের প্রথম দিকের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে উপন্যাসটি এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

অবসর জীবন কলকাতায় কাটাবার পরিকল্পনা করে তল্পিতল্পা গুটিয়ে মহানগরে হাজির হয়ে গেছি। এবার নারাণদার বাড়ি যাওয়ার কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয়। যাব যাব করেও যাওয়া আর হয়ে উঠল না। আর এখন কার কাছেই বা যাব। এই আশি বছরের জীবনে তিনি রেখে গেলেন তাঁর লেখা বইয়ের সম্ভার যা আমাদের আগামী দিনে অনুপ্রাণিত করবে।

****

পাদটীকাঃ

আমাদের সতীর্থ (১৯৬৪ সিভিল) মধুজিৎ মুখোপাধ্যায়, DSc, PhD, আই.আই.টি., খড়্গপুরের Ocean Engineering and Naval Architecture বিভাগের প্রফেসর হিসাবে অবসর নেয়। অবসরের পরে আমাদের সাধের বি.ই.কলেজ, শিবপুরের পরিবর্তিত রূপ 'বেসু, শিবপুর বিশ্ববিদ্যালয়'-এ রিসার্চ গাইড হিসাবে যোগদান করে। সেইসময়ে ইংরাজি ২০০৬ সালে আমাদের সতীর্থদের সংগঠন 'বেকা ১৯৬৪'-এর তরফে আমাদের প্রাচীন বি ই কলেজের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি স্মারক সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। 'বেকা ১৯৬৪'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হবার কারণে স্বাভাবিকভাবেই এই স্মারক সংখ্যার সম্পাদনার ভার আমার কাঁধেই পড়ে। প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ, উপরোধ, কাকুতি-মিনতি, চেয়ে চিন্তে লেখা জোগাড় করা, সে যে কী দুঃসাধ্য কাজ, একমাত্র যে করে, সেই জানে। একটাই খালি শর্ত ছিল, কোনো টেকনিক্যাল বা কারিগরি লেখার কচকচি থাকবে না।

এ বছর সবেমাত্র আমাদের প্রিয় নারাণদার (নারায়ণ সান্যাল) জন্মশতবর্ষ পার হয়েছে। সেই কারণে আমাদের ২০২৫ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক প্রাক্তনী সম্মেলন উপলক্ষ্যে যে স্মারক পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে চলেছে, তাতে বর্তমান সম্পাদক আমাদের অনুজপ্রতিম মনোজ (কর) নারাণদার সম্বন্ধে কিছু লেখা ছাপানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে।

তখনই হঠাৎ নারাণদা সম্পর্কে মধুজিতের এই লেখাটার কথা মনে পড়ে। মধুজিৎ আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। যেহেতু ওর সঙ্গে নারাণদার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল, আজ তাই ওর অভাবটা বেশি করে অনুভব করছি। যাই হোক, লেখাটা পুরোনো হলেও এতে একজন মার্জিতরুচির সহজ সরল মনের মানুষ হিসাবে নারাণদার ছবিটা ভালোই ফুটিয়ে তুলেছে আমাদের মধুজিৎ। — সনৎ ঘোষ (১৯৬৪ সিভিল)

শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার সূচনা এবং অধ্যাপক পল জোহানেস ব্রুল

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬, *ইলেকট্রিকাল*

Paul Johannes Brühl
(25 .02.1855 – 07.09 1935)

কেন এই লিখতে বসা

আমার বয়স যখন ১৬ পেরিয়ে আরও কয়েক মাস, স্কুলের গণ্ডি ছেড়ে Centenary Gate-এর রাস্তা ধরে বি ই কলেজে (এখন IIEST, Shibpur) সেই আমার প্রথম অভিযান। দু'চোখে তখনও সেই অপুর প্রথম রেল গাড়ি দেখার উচ্ছ্বাস— এত বড়ো কলেজ— এত সব ভারিক্কি পণ্ডিত মাস্টারমশাইরা ক্লাস নিচ্ছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অনর্গল ইংলিশেই পড়িয়ে যাচ্ছেন। সহপাঠীদের মধ্যে কয়েকজন কলকাতার নামিদামি স্কুলের স্মার্ট ছাত্র। এরই মধ্যে চলেছে আমার নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার অস্থির দুরন্ত প্রয়াস। যদিও বি ই কলেজে তখনও বন্দুকধারী C.R.P.-দের মার্চ করে চলাটা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, তবুও কলেজ চত্বরে (আর হস্টেলে তো বটেই) শৃঙ্খলার বাঁধন তখন অনেকটাই আলগা। এভাবে চলতে চলতেই ক্রমশ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলাম। দু' তিন বছর কাটানোর পর কলেজে আসা যাওয়াটা প্রধানত সীমাবদ্ধ হয়ে উঠল ইলেক্ট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ঘেরাটোপের মধ্যে। এখানে ঢুকলেই অনুশাসনের একটা হাল্কা ঠান্ডা হাওয়া শরীর ছুঁয়ে যেতো, বিশেষ করে যখন করিডর ধরে বিভাগীয় প্রধান ড. শঙ্কর সেনের ঘর পেরিয়ে ক্লাস ঘরে যাতায়াত করতে হত। মাঝেমাঝে চোখে পড়ত ড. সেনের ঘরের পাশে দেওয়ালে টাঙানো একটা গাঢ় বাদামি রঙের বোর্ডে এক সারি নামের বিন্যাস; ভালো করে পড়ে বুঝেছিলাম এদের সকলেই কোনো সময়ে ড. সেনের মতোই বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন।

তারপর এক সময়ে এই বিভাগেই পড়িয়েছি বেশ কিছু বছর। ম্যাগাজিন আর অন্য নথিপত্রে সবসময় পড়েছি W.H.Everett নামে এক ব্রিটিশ অধ্যাপকই ছিলেন এই বিভাগের প্রথম বিভাগীয় প্রধান। ১৯০২ সালে 'Combined Mechanical and Electrical Engineering Department'-এর প্রতিষ্ঠা লগ্নেও তিনিই ছিলেন বিভাগীয় প্রধান। তারপর ১৯১২ সালে স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে Electrical Engineering Department-এর পথচলা শুরু। তখনও ডিগ্রিকোর্স চালু হয়নি। প্রথম ডিগ্রিকোর্সের ছাত্ররা পাশ করে বের

হয় ১৯৩৬ সালে। এর আগে চালু ছিল অন্যান্য কিছু Certificate Course যা পরে Diploma Course-এ উন্নীত হয়েছিল। Degree Course চলার পাশাপাশি এই Diploma Course-ও চলেছিল ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত। ডিগ্রিধারীদের আভিজাত্যের কাছে ১৯৩৬-এর আগের ইতিহাস হয়তো বা দেমাকে কিছুটা চিড় ধরায় নয়তো ইতিহাসের এই অংশটা আলো-আঁধারির ছায়ায় হারিয়ে যাওয়া একটা ঘটনাপ্রবাহ বলে মনে হয়; তাই এর কথা কেউ খুব একটা মনে রাখেনি। আমার এই লেখাটি মূলত এই পর্বটির শুরুর অংশটি নিয়েই।

চিন্তাধারা অন্যখাতে বইতে শুরু করল কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর। ততদিনে অতীত আর বর্তমানের প্রচলিত সংজ্ঞাটা কতটা যে গোলমেলে তা বুঝে ফেলেছি, উপলব্ধি করছি নিজেই ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠছি। তা ছাড়া,

যে চোখে চালশে ধরে, যে চোখেতে ছানি পড়ে যায়
সেও তো স্বপ্ন দেখে— মস্তিষ্কের অদৃশ্য ধাঁধায়।

তাই মনে হওয়া শুরু হল বাদামি বোর্ডে লেখা নামগুলো ছাড়াও অনেক মাস্টারমশাই তো আমারই মতো বছরের পর বছর ডিপার্টমেন্টের করিডর দিয়ে হেঁটে ক্লাস নিয়ে গেছেন— কারা ছিলেন তাঁরা? ইতিহাস হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে নিল। সহকর্মী এবং সহপাঠী অধ্যাপক অরবিন্দ রায়কে নিয়ে হানা দিলাম C. V. Raman Library-র Librarian Dr. Hariprasad Sharma-র ঘরে। তাঁর সহায়তায় আর সুশীলবাবুর (Assistant Librarian শ্রীযুক্ত সুশীল বর্মন) কল্যাণে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম ধুলোময়, জীর্ণ (বা ভাজা লুচির মতো) পাতা দিয়ে ভরা কলেজের পুরোনো ক্যালেন্ডারের মধ্যে দিয়ে এখানকার ইতিহাসের মধ্যে ঢুকে পড়ার রাস্তা, একেবারে ১৮৯০-এর দশকের Civil Engineering College, Sibpore-এ। এছাড়াও অবশ্য অশরীরি Google-এর হাত ধরে দুনিয়া জুড়ে জাল পাতা যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে হাজারও তথ্যভাণ্ডারেও বেশ কিছুদিন হাতড়ে বেড়ালাম। হাতে এল চমকে দেওয়ার মতো এক রাশ পুরোনো নথিপত্র।

উনবিংশ শতকের কলকাতায় বিদ্যুতের আগমন

১৮৮০-র দশক থেকেই কলকাতায় মানুষের তৈরি বিদ্যুত প্রকৌশলের চমক শুরু হয়ে গেছে। দেশী ব্যবসায়ী দে-শীল কোম্পানি আর বিদেশী কোম্পানি P. W. Fleury & Co. (builders & electrical engineers) সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে আর নানারকম পারিবারিক এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে বিজলি বাতি দিয়ে আলোকিত করার ব্যবসায়ে নেমে পড়েছে। ১৮৮৬ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনেও বিজলি বাতির ব্যবহার হয়েছিল। সাহেব, মেমসাহেবদের ঘরে আর আদালত চত্বরে হাতে টানা পাখাকে সরিয়ে বৈদ্যুতিক মোটর চালিত পাখা আনার আয়োজনও শুরু হয়ে গেছে। ১৮৯১ সালে রাতের হ্যারিসন রোডে (এখনকার মহাত্মা গান্ধি রোডে) ঝলমল করে উঠল বিজলির আলো। আর এই দশকেই ১৮৮৭ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে স্বেচ্ছায় শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে বদলি হয়ে এলেন Physical Science-এর জার্মান অধ্যাপক ৩২ বছরের যুবক পল জোহানেস ব্রুল।

পদার্থ বিজ্ঞানের আঁতুড় ঘরে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং

শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপক ব্রুল তখন পড়াচ্ছেন Physics, Chemistry; সম্ভবত

আরও কিছু বিষয়। Electricity তখন Physics-এর syllabus-এ ভালোভাবেই নিজের জায়গা করে নিয়েছে। থিওরি ক্লাসে অধ্যাপক ব্রুল পড়ান Storage (অর্থাৎ Secondary) battery, Armstrong-এর Hydroelectric machine, Brush-এর Arc Lamp— এমন আরও অনেক কিছু যা বিদ্যুতের প্রয়োগে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। কিন্তু পড়ানোর সময় কোথায় যেন তাঁর একটা অস্বস্তি বোধ হত। তাঁর মনে হত নিজেদের হাতে Generator অথবা Storage Battery দিয়ে আলো জ্বালাতে না শিখলে অথবা মোটর না ঘোরালে ছাত্রদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। তাই কথা বললেন Messers. Martin & Co., Engineers and Contractors-এর লোকজনদের সাথে। এই কোম্পানির কর্তৃপক্ষ সানন্দে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। ছাত্রদের Practical শিক্ষার খাতিরে ধার দিল নীচে লেখা যন্ত্রাদি।

1. A Brush Dynamo
2. A Ferranti Alternating Current Dynamo
3. A Gramme Machine
4. An Electric Motor
5. Two Arc Lamps

এ ব্যাপারে অবশ্য Messers. Martin & Co.-র একটা ব্যবসায়িক স্বার্থ ছিল। ভারতে তাদের উদ্দেশ্য তখন বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বেশ বড়োসড়ো ব্যবসা শুরু করা। এদেশে তখন বিদ্যুৎ প্রকৌশল জানা লোকের বড়োই অভাব। অথচ ইংল্যান্ড অথবা ইউরোপের অন্য কোনো দেশ থেকে বিদ্যুৎ প্রকৌশলে দক্ষ লোকজন নিয়ে আসা খুব খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। তার থেকে ভালো হয় যদি তাদের সহায়তায় কিছু ছাত্র এই নতুন প্রকৌশলে প্রশিক্ষিত হয়; তাহলে এরকমই কিছু ছাত্রদের পরে তাদের কোম্পানিতে নিয়োগ করে ভালোভাবে ব্যবসা চালানো যেতে পারে। এভাবেই চালু হয়েছিল ছাত্রদের বিদ্যুৎ সংক্রান্ত Practical শিক্ষা।

অধ্যাপক ব্রুল অবশ্য এখানেই থেমে থাকলেন না। এব্যাপারে কথা বললেন Principal Prof. Slater-এর সঙ্গে। Prof. Slater তাঁকে পরামর্শ দিলেন একটা প্রস্তাবনা (আনুমানিক খরচ-সহ) তৈরি করতে। অধ্যাপক ব্রুলও সেভাবেই এগোতে থাকলেন। এরই মধ্যে তৎকালীন Lieutenant Governor Sir Charles Elliott ১৮৯৫ সালে এলেন কলেজ পরিদর্শনে; সেই সময় Prof. Slater তাঁকে বিদ্যুতের যন্ত্রাদি কেনার জন্য কলেজকে একটা বিশেষ আর্থিক অনুদানের জন্য আবেদন জানালেন; এই আবেদনে সাড়া দিয়ে Lieutenant Governor ৮০,০০০ টাকা অনুমোদন করলেন।

Dynamo House-এর পত্তন

এরপর অধ্যাপক ব্রুলের তত্ত্বাবধানে নানারকম যন্ত্র কেনার জন্য টেন্ডার ডাকা হল। দু'টি কোম্পানি – Messers. Martin & Co. আর Messers. Kilburn and Co. এতে অংশগ্রহণ করে। যে যন্ত্রগুলি কেনা হল তার একটা বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

1. A Chandler's fast running 40 H.P. engine, coupled direct to a shunt dynamo with an output of 240 amperes at 120 volt when at a speed of 425 revolution per minute. The steam for this is supplied from a marine boiler at a working pressure of 125 lbs, and

capable of developing steam for a 50 H. P. engine;

2. A 35 B. H. P. gas engine by Korting, driving directly an eight pole dynamo;

3. A Crossby 10 H. P. gas engine, driving by belting an "Educational" Victoria dynamo with an output of 6000 watts at a speed of 1,300 revolutions per minute;

4. A complete Downson gas generating plant to supply gas for the engine in (2) and (3);

5. A Hornsby-Akroyd safety oil engine of 9.5 H. P., driving by belting a two pole dynamo with an output of 6,000 watts when running at a speed about 1,000 revolutions per minute;

6. An accumulator battery of 56 Epsteim cells, having a capacity of 130 amperes for about 3 hours, together with six other cells to illustrate other types;

7. Slate switchboard with all necessary measuring instruments;

8. Lead covered cables, all necessary wiring and the equivalent of about 400 sixteen candle-power incandescent lamps.

এইসব যন্ত্রপাতি রাখার মতো স্থায়ী ঘর তখন কলেজে ছিল না। তাই অনুমোদিত ৮০,০০০/- টাকার থেকে ১০,৩৬৪/- টাকা খরচ করা হল এই সব যন্ত্রাদি রাখার ঘর নির্মাণ করার জন্য। পরবর্তীকালে এই ঘরটিই Dynamo House হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল।

এইসব যন্ত্র কেনার পিছনে দু'টি মূল উদ্দেশ্য ছিল। একটি অবশ্যই কলেজের বিভিন্ন জায়গায়---যেমন অফিসঘরে, শ্রেণিকক্ষে, অধ্যাপক ও অন্যান্য কর্মীদের কোয়াটার্সে, ছাত্রদের আবাস স্থানে বৈদুতিক আলো ও পাখা চালানোর জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা; অন্যটি হলত বিদ্যুৎ সংক্রান্ত নানাবিধ যন্ত্রাদি সম্পর্কে ছাত্রদের যথাযথ শিক্ষাদান করা। এই প্রসঙ্গে ১৮৯৭ সালের ক্যালেন্ডারে প্রকাশিত (১৮৬ পাতা) ১৮৯৫-৯৬ সালের বার্ষিক রিপোর্টের ছোট্ট একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল।

'A sum of Rs. 80,000 was sanctioned for a complete Installation, and the erection will be done in the coming year by a firm of contractors in Calcutta. The greatest care was taken by Mr. Bruhl, Professor of Science, to include various types of engines, dynamos, cells, etc., so as to give as wide a range of instruction to the students when the plant is at work. It is hoped that the plant will be in working order in a few months. The cost of working expenses will be practically met from the charges it is proposed to introduce for the lighting, Professors, Students, Messes, etc., contributing to defray the cost.'

এই বার্ষিক রিপোর্ট থেকে এও জানা যায় যে ওই বছরেই dynamo, motor ইত্যাদি যন্ত্রগুলোকে চালু করা হয় এবং এদের ওপর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালানো হয়।

Messers. Martin & Co.-র অভিজ্ঞ ও দক্ষ Electrician Mr. Parker-এর সুযোগ্য পরিচালনায় Dynamo House-এর এই যন্ত্রগুলো স্থাপন করা হয়। তিনজন Apprentice ছাত্র এ ব্যাপারে তাঁকে সহায়তা

করে আর এই শিক্ষানবিশীর মধ্যে দিয়ে তারা মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হয়। প্রাথমিক হিসেবে মনে করা হয় এই Plant-টি চালাতে বার্ষিক আনুমানিক ৪,২০০/- টাকা খরচ হবে। এই খরচ বহন করার জন্য সরকারের তরফ থেকে প্রতিটি ছাত্রের জন্য বছরে দশ মাসে প্রতি মাসে ১ টাকা করে লেভি ধার্য করা হল। এ ছাড়াও অধ্যাপকদের কোয়াটার্সে এবং মেসগুলোতে একজন কতগুলো ঘর ব্যবহার করছে তা দেখে নিয়ে তাঁদের জন্য উপযুক্ত লেভি ধার্য করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

Power House-এর স্থাপনা

১৮৯৫ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক ব্রুল একাই Science-এর সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় যখন Agricultural Science-এর কোর্স চালু করা হল তখন (১৮৯৬ সালে) Chemical Science-এর জন্য এক নতুন অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়। অন্যদিকে এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। তখনকার দিনে P.W.D.-র অধীনে থাকা কলেজের workshop গুলোতে (যাতে ছাত্ররাও শিক্ষানবিশী করত) মূলত steam চালিত যন্ত্রাদি ব্যবহার করা হত। Steam উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত boiler-টি বেশ পুরোনো হওয়ার ফলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করছিল। তাই এটিকে সরিয়ে নতুন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি হয়ে পড়ল। সমাধান হিসেবে মনে এল দু'টি বিকল্প ব্যবস্থা। এর প্রথমটি হল পুরোন boiler-টির জায়গায় একটি নতুন boiler স্থাপন করা; অন্যটি হল পুরোনো বাষ্প-চালিত ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বর্জন করে তার জায়গায় আধুনিক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। দ্বিতীয় সমাধানটির খরচ কিছুটা বেশি হলেও (১০০০ পাউন্ডের কিছু কম) তা যুগোপযোগী বলে শেষ পর্যন্ত সমীচীন বলে মনে করা হল। Principal Prof. Slater এক সময় বেশ কিছুদিন ইংল্যান্ডে ছুটিতে ছিলেন; তাঁর এই অনুপস্থিতির সময়েই অধ্যাপক ব্রুল দ্বিতীয় সমাধানটি প্রবর্তন করার জন্য একটা প্রাথমিক নকশা তৈ করেন। এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে D.C. System-এর পাশাপাশি ছাত্ররা যাতে আধুনিকতম Polyphase A. C. System-এও পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে এ ব্যাপারটি তাঁর মাথায় ছিল। পরে অবশ্য Director of Public Instruction, Prof. Pedlar-এর পরামর্শ মতো এই প্রাথমিক নকশাটির কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয় যাতে কলেজ Workshop-এর পুরোটাই এই নতুন বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আওতায় চলে আসে।

বৈদ্যুতিক মোটর চালিত যন্ত্রাদি প্রবর্তনের আর একটি কারণ হল তখনকার দিনের বড়ো বড়ো Workshop-গুলোতেও তখন এই নতুন প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নীচে লেখা নামগুলোর উল্লেখ করা হল।

1. The Calcutta Tramway Company
2. The Cauvery Falls in Madras
3. The East India Railway Workshop at Jamalpur
4. The new East India Railway Workshop at Lilooah
5. The new Bengal Nagpur Railway shops at Kharagpur

এই জন্যই কর্তৃপক্ষ এই বিকল্প সমাধানটিকে যুগোপযোগী মনে করলেন।

ইতিমধ্যে ১৯০২ সালে Combined Mechanical and Electrical Engineering Department- এর

স্থাপনা হয়। Mr. W. H. Everett যিনি ১৯০১ সালের নভেম্বর মাসে এই কলেজে যোগদান করেন, তিনিই এই Combined Mechanical and Electrical Engineering Department-এর অধ্যাপক ও প্রধান হিসেবে এবং Workshop-এর Superintendent হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

কলেজের Workshop-গুলোতে বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে নানারকম যন্ত্রাদি চালানোর জন্য যে আধুনিকীকরণের দরকার হয়ে পড়েছিল তাকে কার্যকরী করার জন্য ১৯০২-০৩ আর্থিক বছরে সরকার ৭০,০০০/- টাকার একটি বিশেষ অনুদান দেয়। এরই মাধ্যমে ১৯০৪ সালে ১৪ মার্চ কলেজে 220V, 3-Phase A.C. System-এর প্রকল্পটি তৎকালীন বাংলার Lieutenant Governor Sir Andrew Fraser-এর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। ১৯০৪ সালের ২০ মার্চ প্রকাশিত The Amrita Bazar Patrika-র দশম পাতায় একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। এর আগে ভারপ্রাপ্ত Principal Prof. Heaton-এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে এই সংক্রান্ত সমস্ত যন্ত্রপাতিগুলো স্থাপন করার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয় যার Power House নামকরণ করা হয়। ১৯০২ সালের অগাস্ট মাসে যন্ত্রাদির অর্ডার দেওয়া হয়। এই সংক্রান্ত নথিপত্র থেকে অনুমান করা যায় যে, হয় ১৯০৩ সালের শেষ দিকে নয়তো ১৯০৪ সালের গোড়ার দিকে এই সব যন্ত্র কলেজে এসে পৌঁছোয়। নীচের অংশে প্রধান যন্ত্রগুলো সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হল।

a. Two nos. Cylindrical multi-tubular boilers of 20 N. H. P., each about 60 actual H.P. from Marshall Sons & Co.

b. Two nos. 16-H. P. nominal compound condensing engines, each about 60 actual H. P. (One jet-condensing, the other surface-condensing) from Marshall Sons & Co.

c. Two nos. 3-phase 50-kilowatt 220-volt generators and switch board from Brown Boveri & Co., Baden

d. Twelve motors varying from 20 H. P. to 1 H. P. from different manufacturers like Brown Boveri & Co.(Baden), British Western House Company(England), Oerlikon Works (Zurich)

e. One 45 H.P. motor generator supplied by Oerlikon Works (Zurich) as an addition and reserve to the present 110-volt direct current lighting plant, also enabling this to supplement the workshop plant.

J. W. Meares-এর দু'টি বক্তৃতামালা

১৯০০ সালের মার্চ মাসে (অর্থাৎ Combined Electrical and Mechanical Engineering Department প্রতিষ্ঠার আগে) তৎকালীন Bengal Government দ্বারা নিযুক্ত ব্রিটিশ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়র, J. W. Meares কলেজের ছাত্রদের ৬টি লেকচার দেন। সেই লেকচারগুলো পরে Bengal Secretariat Press একটি বই রূপে প্রকাশ করে। বইটির নাম দেওয়া হয় Electrical Engineering with particular reference to conditions in Bengal. এই J. W. Meares ১৮৯৭ সালে নির্মিত দার্জিলিং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র

নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। বইটির আলোচ্য বিষয়গুলো সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা দেওয়ার জন্য বইটির সূচিপত্র থেকে আলোচ্য বিষয়গুলো তুলে ধরা হল।

Lecture-1: **Introductory**- Applications of Electricity, Generation of Electricity, Units, Explanation of Technical terms, Ohm's Law

Lecture-2: **Materials used in electric lighting-** Conductors, Lamps, terminals and Holders, Cut-outs , switches, Ceiling roses and wall sockets, General Remarks on Running Circuits, Wood-casing systems, Lead covered cable, Tube and pipe systems

Lecture-3: **House Wiring-** Illuminations, Fittings, Tree systems of Wiring, Distribution system of wiring, General notes on wiring, Examination and testing, Cost of internal wirings, Electric Fans

Lecture-4: **Private Plants-** Mains, Main Switch Board, Dynamo, Prime mover, Combined Sets, Belt Driven Sets, Boilers, Accumulators, Dynamo for Battery charging, Calculation of shunt resistance, Battery Switch Board, Maintenance of installations, notes on existing installations

Lecture-5: **Central Station Supply-** Three-wire systems, Overhead mains, Underground mains, Regulating Gear, Instruments, Lightning Arresters, Potentiometer, Meter Testing, Calcutta Public Supply, Legislations affecting consumers

Lecture-6: **Darjeeling Municipal Supply-** Calculation of conductors, works notes on tests, Dynamo and Motor tests and calculations, Useful memoranda, calculation of shunts, calculation of starting resistance, Central Station Curves

১৯০২ সালে মার্চ মাসে এই Mr. J. W. Meares আবার Electric Traction-এর ওপর ৬টি বক্তৃতা প্রদান করেন। এগুলোও পরে একটি বই আকারে Bengal Secretariat Press থেকে প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯০২ সালেই কলকাতায় প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রামের প্রচলন হয়।

নানা কথা

Civil Engineering College, Sibpore-এ Electrical Engineering শিক্ষার প্রসার ঘটার দু'টি ধারা ছিল। একটি অবশ্যই Civil Engineering Department Degree Course-এর ছাত্রদের একাংশকে Electrical Engineering-এর সাথে পরিচিত করে দেওয়া। এই ব্যাপারে Traction-এর ওপর J. W. Meares প্রদত্ত বক্তৃতার থেকে ছোটো একটি অংশ উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

'I am very pleased to be able to congratulate the students who have taken up the special electrical classes on the success of those who preceded them in obtaining appointments. This has been invariably the case, I believe, and the demand has actually been in excess of the supply up to the present time. And yet it may be safely said that the electrical era in India has scarcely commenced; for so far as I know there are, excluding private plants,

only three public electricity-supply stations and one tramway system actually working, and about half-a-dozen more schemes in contemplation or under construction.'

College Centenary Souvenir-টিতে প্রদান করা নানা তথ্যের দিকে তাকালে বোঝা যায় অন্য ধারাটিতে Electrical Engineering-এর স্বাতন্ত্র্যকে একটি ব্যবহারিক বিষয় হিসেবে প্রাথমিক স্বীকৃতি দিয়ে ১৮৯৫ সালে Foreman Mechanic with Electrical Qualification course-টি চালু হয়। এই batch-এর ছাত্ররা ১৮৯৭ সালে পাস করে। এই course-টির শেষ batch-এর ছাত্ররা ১৯০৯ সালে পাস করে। এর পর এই course-টির গুণগত মান উন্নত করে একটি Overseer course চালু করা হয়। এই course-এ শিক্ষিতদের Upper Subordinates with Mechanical and Electrical Qualification Certificate দেওয়া হত। এই course-এর প্রথম batch-এর ছাত্ররা পাস করে ১৯১০ সালে; এই course-এর শেষ batch- এর ছাত্ররা ১৯২০ সালে পাস করে। এর পর ১৯২১-২২ session-এ এই course-টিকে তিন বছরের Diploma Course-এ উন্নীত করা হয়; এই course-এ পাস করা ছাত্রদের Diplomates in Mechanical and Electrical Engineering এই Diploma দেওয়া হত। এই course-এর প্রথম batch-এর ছাত্ররা ১৯২৩ সালে পাস করে আর শেষ batch-এর ছাত্ররা ১৯৪৪ সালে পাস করে।

প্রসঙ্গক্রমে এটা বলে রাখাটা জরুরি যে তৎকালীন কলেজ কর্তৃপক্ষ Electrical Engineering-এর বিকাশের জন্য সচেষ্ট ছিলেন বলেই ১৯০১ সালে উপেন্দ্র নাথ কর নামের একটি ছাত্রকে Electrical Engineering-এ অনুসন্ধানমূলক কাজ করার জন্য ১ বছর Elliott Research Scholarship (Rs. 100/-) প্রদান করা হয়। বিভিন্ন তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে, কলেজের Physics Laboratory থেকেই Electro-Technical Laboratory-র জন্ম হয়। এই Laboratory-তে নানা গঠনমূলক ক্রিয়াকাণ্ড চলার দৃষ্টান্ত হিসেবে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে এখানে তৈরি করা মোটর চালিত একটি নৌকা ১৯০৬ সালে Calcutta Industrial Exhibition-এ প্রদর্শিত হয়ে স্বর্ণপদক পায়।

অধ্যাপক পল জোহানেস ব্রুল

এ কথা নিঃসন্দেহে বলে ফেলা চলে যে, আজকের IIEST, শিবপুরে অধ্যাপক ব্রুল সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি নাম। এমনকী পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগেও আমি যখন এই কলেজের স্নাতক স্তরের ছাত্র ছিলাম তখনও কোনোদিন অধ্যাপক ব্রুলের নাম শুনিনি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি অন্তত ২৫ বছর (১৮৮৭-১৯১২) এখানে ছিলেন এবং সেই সময়ে বহু মূল্যবান কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ উদ্যাপনের সময় যে-স্যুভেনিরটি প্রকাশিত হয়েছিল তাতে তাঁর ছবি সহ কিছু কর্মকাণ্ডের কথা বেশ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছিল। অধ্যাপক ব্রুলের নাম শিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক বাঙালির কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রখ্যাত পদার্থবিদ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। অন্তত তাঁর তিনটি লেখায় অধ্যাপক ব্রুলকে বেশ শ্রদ্ধা আর প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর কথায় 'ড. ব্রুল তখন শিবপুর কলেজে পদার্থবিজ্ঞান পড়ান তখন সেখানে নানা ধরনের সূক্ষযন্ত্র— তৌলমাপ খাড়া করেছেন যা এ দেশে প্রেসিডেন্সি কলেজেও ছিল না। পদার্থবিজ্ঞানে এম-এস-সি-তে স্বহস্তে কাজের কুশলতা দেখাতে যেতে হত ব্রুলের Laboratory-তে, সে বড়ো কঠিন ঠাঁই। বেশির ভাগ ছাত্র

বিপদে পড়তেন। তবে তাঁর কাছে শিক্ষানবিশী করে কেউ কেউ বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছিল আমাদের পূর্বগামীদের মধ্যে। ...'

'(অধ্যাপক ব্রুল) বিজ্ঞানের সব বিষয়েই পারদর্শী— সামান্য সহায়কের চাকরি থেকে শুরু করে উঠেছেন বহুদূর। পড়ার অভ্যাস চিরকাল আর বিজ্ঞানের নানা বই সংগ্রহ করে রেখেছেন নিজের গ্রন্থাগারে। আমরা সেখানে অনেক মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য বই আবিষ্কার করলাম— ধার নিয়ে এলাম--- Plank, Boltzmann, Wien ইত্যাদি, আর কী চাই!'

আর এক বরেণ্য বৈজ্ঞানিক ড. মেঘনাদ সাহার নিজের লেখাতে অধ্যাপক ব্রুল সম্বন্ধে কিছু না খুঁজে না পেলেও ড. সাহার জীবন কীর্তি নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের একজনের লেখা থেকে কিছুটা তুলে ধরছি।

'He also started learning German from the Austrian Scientist P. J. Bruhl. This knowledge of German would play a significant role in his career later.'

ড. সাহা Intermediate স্তরে পড়ার সময় German ভাষা শিখেছিলেন একথা ঠিক, তবে অধ্যাপক ব্রুলের কাছে German ভাষাটা আরও ভালোভাবে শিখে নেওয়ার ঘটনাটা অবিশ্বাস করার মতো কিছু নয়।

আরও পড়েছি— 'Fortunately Saha got help from Paul Johannes Bruhl, an Austrian Scientist at the Bengal Engineering College who provided him an English translation of The Treatise on Thermodynamics by Max Plank and Die theoretischen und experimentellen Grundlagen des neuen Wärmesatzes (The New Heat Theorem: Its Foundation in Theory and Experiment) by Walther Nernst'

এই সম্বন্ধে আর একটি লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি।

'Among the books they (Saha and Bose) borrowed …the more recent ones such as Plank's Vorlesungen über die Theorie der Wärmestrahlung (1906) and von Laue's Relativitätsprinzip (1911)'

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুরে ১৮৯২ থেকে ১৯০২-এর শুরুর পর্বে নাবালক এবং অনেকাংশে নিজের পরিচয় না থাকা Electrical Engineering-কে কিছুটা পরিণত করে Prof. Everett-এর হাতে তুলে দেওয়ার কৃতিত্ব অধ্যাপক ব্রুলের। ১৮৯৪ এবং ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত Civil Engineering College, Sibpur Calendar থেকে এবং Power House-এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ১৯০৪ সালের অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত Principal Prof. Heaton প্রদত্ত ভাষণ থেকে এই পর্বে অধ্যাপক ব্রুলের অবদানের কথা জানা যায়।

এ কথা শুনলে অনেকেই অবাক হবেন যে অধ্যাপক ব্রুল কিন্তু মূলত ছিলেন উদ্ভিদবিদ্যার (Botany) একজন কৃতী ছাত্র এবং গবেষক। শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের তৎকালীন ডিরেক্টর Sir George King-এর অনুপ্রেরণায় তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে স্বেচ্ছায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শিবপুরে চলে আসেন যাতে অবসর সময়ে উদ্ভিদবিদ্যায় গবেষণার কাজ করতে পারেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর গবেষক ছাত্র ড. কালিপদ বিশ্বাসের লেখা শোকবার্তা থেকে আমরা জানতে পারি—

'His research work in Botany during his off time after the teaching work at the Engineering College found expression in such voluminous publications as A Century of New and Rare Indian Plants in collaboration with Sir George King. This work was published in the Annals of the Royal Botanic Garden, Calcutta,Vol. V Part II with 102-200 plates, most of which are Brühl's own sketches. His papers on 'Plant Immigrants' is an important contribution towards the distribution of foreign plants in India'

১৮৯৬ সালে প্রকাশিত রচনাটি উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মধ্যে এতটাই স্বীকৃতি পেয়েছিল যে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এটির ১৮টি এডিশন বের হয়। এছাড়াও উদ্ভিদবিদ্যায় তিনি বহু গবেষণামূলক কাজ করেছিলেন যা নিয়ে আলোচনা করার যোগ্যতা আমার নেই আর তা এখানে প্রাসঙ্গিকও হবে না। তবে একথা জানিয়ে রাখা ভালো, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শিবপুর থেকে অবসর নেওয়ার পর ১৯১৮ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত দশ বছর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপকের পদে আসীন ছিলেন।

পল জোহানেস ব্রুলের জ্ঞানরাজ্যের সীমানার বিশালতা আর তাঁর কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতির বৈচিত্র্যকে কলকাতার বিদগ্ধ মানুষরা সমীহ জানাতেন বলেই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শিবপুরের শতবর্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিরটি ছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিরে আর প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবর্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিরেও তাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর ছাত্র কালীপদ বিশ্বাসের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে চোদ্দটি ভাষায় তাঁর কম বেশি দক্ষতা ছিল। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শিবপুরে পড়িয়েছেন 'Chemistry, Physics, Geology including Minerology, Heat Engines and Agriculture.' এখানে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, স্বল্পকালীন সময় এখানে Agriculture-এর ওপর একটি কোর্স চালু ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছু সময় পড়িয়েছেন Geology-আর Minerology। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শিবপুরে অল্প সময়ের জন্য কার্যবাহী প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব পালন করেছেন। স্যার আশুতোষ মুখার্জীর অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Registrar, Controller of Examinations and Secretary of the Arts and Science Department of the Post-Graduate Classes'-এর দায়িত্বভার পালন করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্য আর কর্মদক্ষতাকে সম্মান জানিয়ে Rajesh Kochhar লিখেছেন, "Even though his world fame rests on his contribution to botany, he was a versatile scientist. In an era when most senior positions in the colonial education service were filled by 'third rate Scotsmen', a knowledgable and dedicated European was a great asset to colonial and nationalist science and education."

শেষ করার আগে

আমার কথা ফুরিয়ে গেছে এমনটি বলা ঠিক হবে না। তবে লেখা তো এক সময় থামিয়ে দিতেই হয়— এখন নটে গাছটি মুড়োনোর সময়। মামুলি কিছু ইতিহাসের বই পড়া ছাড়া ইতিহাস চর্চা কখনও করিনি। লিখতে বসে অনেক সময় মনে হয়েছে ইতিহাস নিয়ে এই লেখাটি কি সর্বাঙ্গীন সঠিক? আমি নিশ্চিত যে, এর মধ্যে অনেক অসম্পূর্ণতা আছে। যতটুকু পেরেছি আলোচনাটিকে তথ্য-নির্ভর করার আন্তরিক চেষ্টা

করেছি। অবশ্য একথা সত্যি— আমরা যারা কৈশোরের দোরগোড়ায় কবি জীবনানন্দের হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় তাঁর সঙ্গে দশ কুড়ি পা মিলিয়ে দিয়েছি তাদের অনেকের মতোই আমারও অতীতের রাস্তায় হাঁটার একটা সুপ্ত বাসনা আছে। তাই এ লেখার পেছনে সে আবেগও অনেকটা কাজ করেছে।

শুনতে চাইলে নীরবতাও কিছু বলে যায়, নৈঃশব্দেও সুর বাজে। তাই বিস্তীর্ণ বি ই কলেজ জুড়ে ব্রুলের এই প্রগাঢ় অনুপস্থিতিও মাঝেমাঝে তাঁর কোনো এক অস্তিত্বের কথা আমাকে জানান দিয়ে যায়। বে-খেয়ালে ইলেক্ট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের প্রবেশদ্বারে কোলাপ্সিবল গেটের নীচে লোহার পাতের চৌকাঠে হোঁচট খেলে কেন যেন মনে হয় 'ব্রুল, সবই ব্রুল, এই বিভাগের (বি)স্মৃতির পাতায় যা লেখা সে ব্রুল!'

যে রচনাগুলো থেকে সাহায্য নিয়েছি

1. Bengal Engineering College Centenary Souvenir published in 1956
2. University of Calcutta, Calendar for the year 1889
3. University of Calcutta, Calendar for the year 1893
4. Civil Engineering College, Sibpur- Calendar for the year 1894
5. Civil Engineering College, Sibpur -Calendar for the year 1897
6. Civil Engineering College, Sibpur - Calendar for the year 1903
7. Civil Engineering College, Sibpur - Calendar for the year 1904
8. Amrita Bazar Patrika, Calcutta, Sunday, March 20, 1904
9. Domesticating electric power: Growth of industry, utilities, and research in Colonial Calcutta- Suvobrata Sarkar published in The Indian Economic and Social History Review, 52, 3(2015), pp: 357-389
10. S. N. Bose- The Man and His Work Part- II, 1994, S. N. Bose National Centre for Basic Sciences, Calcutta
11. সত্যেন্দ্র নাথ বসু রচনা সংকলন – বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
12. Obituary- Dr. Paul Brühl, K. Biswas, Current Science, Vol. IV, No. 4, 1935, page no. 231
13. Meghnad Saha: work, life and times – Rajesh Kochhar, Proceedings of International Astronomical Union Symposium No. 349, 2019 pp: 161-166
14. Meghnad Saha: Physicist and Nationalist, Somaditya Banerjee, Physics Today, August, 2016, pp: 38-44
15. Calcutta University Commission, 1917-1919, Report Vol. III, Part I, Chapter XXIV on Engineering and Mining Education
16. Electrical Engineering with particular reference to conditions in Bengal (Six lectures delivered in March 1900 at the Civil Engineering College, Sibpur) by J. W. Meares published by Bengal Secretariat Press, Calcutta

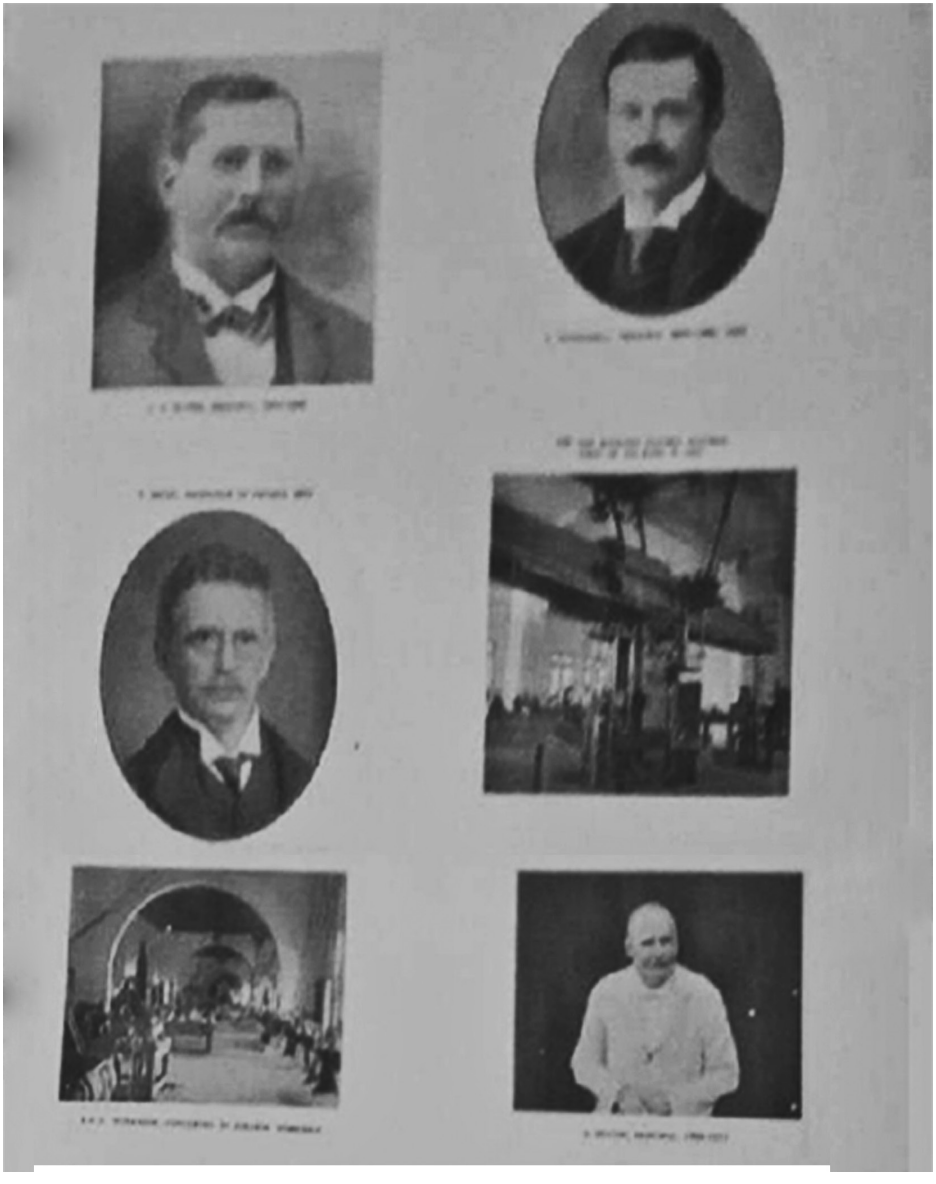

ওপরের ছবিটি Bengal Engineering College Centenary Souvenir published in 1956 থেকে নেওয়া হয়েছে। বাঁ দিকের ওপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে Principal (1892 -1898) Prof. J. S. Slater-কে; তার নীচে Prof. P. J. Bruhl (1895); একেবারে নীচে ডান কোণের ছবিতে দেখা যাচ্ছে Principal (1904 -1921) Prof. Heaton-কে।

Memoirs / স্মৃতিচারণ

Reminiscences of nineteen–sixties

Tathagata Roy,*1966, Civil*

Quoted from his memoirs, titled 'Desires, Dreams and Powers: Reminiscences of West Bengal and the Northeast' with a Foreword by RamNath Kovind, former President of India. Publisher: BluOneInk, Noida,U.P., 2024. Available on amazon.in

In college, I discovered something else about myself: that from my quiet withdrawn state at school I had become an unusually gregarious person and loved to meet new people and make new friends. Not only that, but strangely, I liked to be with and could befriend all kinds of people. In school the class was pretty much homogeneous with the students seeming as if cast in a mould, except for the boarders: they were whether Bengali, Marwari or South Indian, all part of an urban middle class, English speaking lot. However, the 400 students in our class at BE College were a very different and extremely varied kettle of fish. There were rich boys, poor boys, Kolkata boys, Delhi boys, rustic boys from the interior of the country , boys who spoke English, boys who didn't, sportsmen, nerds, quiet boys, flamboyant boys, precocious boys, withdrawn boys. The only thing common among all was that they were above- average students. I wanted to be with all of them and could befriend boys of different types. This posed a problem because those different kinds didn't get along well with one another. It is not that there were mutual dislike in all cases but the different groups were just not on the same page and they didn't speak one another's language. The result was that I formed different, mutually exclusive group of friends. This had some unwanted though not unwelcome consequences later in my fourth year when I was running for the general secretary of the student union. Luckily the acrimony generated didn't last and some of my detractors from those days are among my closest friend today. The strange propensity coupled with my capacity for remembering names and a generally amiable temperament that I was blessed with eventually brought me into public life. But a little later.

Let me come back to the initial days of my admission to BE College. As I was considered a very 'accomplished boy' having ranked 6th in the state there was some pressure on me from my family to enrol for Physics Honours. However, since all of my friends were opting for engineering I decided to do the same and there was no serious opposition. There were some debate about which branch of engineering to choose and after some initial hesitation civil engineering was decided upon. The college options were BE College, Shibpur; Indian Institute of Technology, Kharagpur and Jadavpur University. I was a few months underage for IITs and in those days Jadavpur (where I taught some twenty four years later) was considered slightly below par, perhaps unfairly. So, Shibpur it was where I spent the best five years of my life and made most of my friends who still remain my friends to this day. I also learned good engineering there.

In 1961, the year we entered college, students joined the five year integrated course at two levels-ours in the first year and the ISc students directly in the second year. These students had pursued two year ISc course after completing school final. Integrated course started in 1960 and only 80 students joined in 1st year. In 1961 we had the full strength of 400 in 1st year. Around this time I added one more feather to my cap. I qualified for JB-NSTS (Jagadis Bose National Science Talent Search). I believe if the intent behind this scholarship was to nurture talent in science it might have been somewhat wasted on me, and all recipients pursuing engineering or medicine unless they later ventured into applied research which were very few. The award was princely by the standard of the times –Rs75 per month for first three years and Rs150 for next two.

BE College in those days was truly a celebrated institute with significant international exposure. It may be hard to believe today that a number of students qualified for both IIT, Kharagpur and BE College chose the latter. In our batch of 1961 there were four students including myself had achieved up to 10th position in higher secondary examination. The college had a partnership with the engineering school of the University of Wisconsin, Madison, US leading to a continuous exchange of teachers. Among the visiting professors I can vividly remember Warren C Young, Paul Andersen and Gerald Pickett. On the day I joined college in July 1961 I noticed a few foreigners trying to build something with bamboo sticks in front of the hydraulics laboratory. Later, I came to know that one of them as none other than the famous R Buckminster Fuller and the structure he was trying to build was the 'Geodesic Dome',

a creation he has designed himself. Before we joined college the famous American architect Joseph Allen Stein and the German metallurgist Walter Baukloh taught at the college as full time faculty members. The principal at that time was Atul Chandra (A.C) Roy and the proctor was Prof. Abdul Wahab (A.W) Mahmood with whom we had the greatest interaction as students. The registrar was a dapper man called Amiya Jiban Ghosh. Another person with whom we frequently met was Dr. Chatterjee, the medical officer.

Principal A.C. Roy was a truly a formidable figure for us. Of average height, very dark, bespectacled with piercing eyes and a cutting voice he instilled fear even in the bravest students. Having studied at Glasgow much like many boys of affluent families of that time he was known as black jewel of Glasgow-black due to his complexion and jewel for his academic prowess. He had an English wife and two nubile daughters named Georgina and Denise who were slightly older than us. Georgina had married the tennis player Premjit Lall but the marriage did not turn out to be happy. Nor was our principal's marriage as far as we gathered. I have met Mrs Roy once and never the daughters. A.C.Roy processed such a powerful personality that he could literally cut a path through a crowd of milling students simply by staring at them. It is important to note that those were the days when teachers were generally held in great esteem by students and were not typically talked back to even those lacking in personality. The landscape shifted after 1970.

Prof A.W. Mahmood, the proctor was very flamboyant with salt and pepper hair and always impeccably dressed. He had an engaging way of talking which, though not as intimidating as principal, reflected strong command over English language and a touch of drama. Before joining BE College he had been a professor of history at Presidency College. Rumour had it that he had two wives but there was no way to verify this. Although he was not usually assigned to take classes Mahmood taught us Humanities GST (Guidance, Study and Tutorial). His lectures were so compelling that boys from other sections would sometimes attend them.

On the day of Holi it was ritual for us to dance all around the college campus singing typical Holi songs –some printable, some not. Then we would visit principal's quarters and find him seated in the garden with kurta-pyjama. We would apply some abir on his head followed by some on his feet. After touching it to our heads one of us would shout,' amra ki chai? (What do we want?) '. The rest would respond in unison 'misthi (sweets)'. Then the principal would give Rs10, enough to treat a group of

twenty or so students to sweets.

There were some truly remarkable teachers at BE College. Dr Shankar Sevak Baral, who was HOD –Physics was a highly popular and learned person. He was from Chandernagore and spoke fluent French. Although not particularly skilful as a teacher, somehow what he taught managed to enter our brains. Kamada babu was another teacher of Physics who passed away in 2017 at the age of 103. Professor Brajesh Sen was another good teacher who taught us chemistry. His classes were scheduled at 1pm immediately after lunch when we all felt drowsy. I invariably used to doze off in that class but because I wore glasses with thick frames, I could not be easily caught. A couple of boys giggled upon seeing me doze and were promptly sent out of class. Prof DN Roy ,somewhat uncouth looking, was such a good teacher that I remember fluid mechanics taught by him to this day. Prof Bimal Sen of Apllied Mechanics, Sunil Roy and Chiranjib Sarkar of Civil Engineering were all exceptional teachers. Prof. Kalyan Banerjee had adopted some American mannerisms from his studies in that country. Many of our teachers had done their doctorates and post docs at the University of Wisconsin at Madison and the University of Illinois at Urbana- Champaign.

And now some nick-names of the teachers! God, what were they not called! One was called Ghoda because someone imagined he looked and talked like one. He conducted our physics practical classes and graded students with suffixed Greek letters ratings. Alpha -0ne was superlative. I never heard if anyone had ever got it. Alpha –two was satisfactory, alpha-three a notch lower, beta-one is so-so and delta meant you had to repeat the experiment. Another one was named Opera because he had longish hair like the actors in operas (jatra). Then there was Legoo, called so for no other reason than he recommended the book Chemistry of Engineering Materials by an author called Leighou (pronounced as Legoo) and the name stuck. A professor with the initial A.K was called Anarkali. The word 'funda' ,meaning fundamentals arguably created in BE College were used for two teachers –Nil funda and Bhool funda. One was called Khasi meaning castrated goat for reasons we need not go into. One ingenious name was applied to a professor who used to tie a wide belt around his ample abdomen. He was named Theta likening his midriff to the Greek letter much used in mathematics. There were many others, some with very uncomplimentary names such as Bosta (sack) and Ding-Dong (because he used to sway from side to side while walking). Some names are outright unprintable.

I began my stay on the campus in the E2 hostel which was not a hostel at all but

staff quarters. We were mostly three to a room. My class mates from school except Gautam Ganguli , also known as Apu were mostly in hostel 12 and 13, brand new hostels facing the river. They were four in a room but room size was much bigger. Strangely the ISc passed direct entrance into the 2nd year were put in barracks housing some 24 in a barrack. They did not get the accommodation they deserved. We got preferential treatment because among our first year entrants there was the son of our principal's boss. He was not only the boss but was very powerful person and was very close to chief minister.

I moved to hostel 10 where I would spend next couple of years. I was assigned the same room as Nitai Ray Chaudhuri, a remarkable character. Nitai was a dark burly boy from Entally, CIT Road, born in Barisal in erstwhile East Pakistan. An elder brother of him later became a famous doctor in Kolkata, Dr Abani Ray Chaudhuri. Nitai was an extremely intelligent and compassionate person but did not look like one. He resembled a bull and was subject to many jokes which he laughed off good naturedly. What set him apart was his remarkable brute strength. We became inseparable friends and even became related with one of his elder brothers marrying my second cousin. But fate was cruel to him. He joined public health engineering department of the Govt. of West Bengal after leaving college but unfortunately died in 1971 in an accident when a power transformer exploded near him at Kalyaneswari near Maithon. He was not only a close friend but a conscience-keeper of sorts to me. I remember weeping uncontrollably when I heard the news of his death.

I have not mentioned the girls, but I must –however incongruous it may seem from a septuagenarian. Boys in BE College were adept in pinning sobriquets on everyone with the principal targets being teachers and girls. The most important thing to note about the girls is that they were very few in number- just 13 as opposed to 2000 boys, all just passed the age of puberty. The competition and the resulting frustration can therefore only be imagined. Additionally in those days we could not bring ourselves to speak to girls freely, given the ethos of time, which heightened our frustration. I believe the sobriquet –pinning was largely a result of this. I won't mention the uncomplimentary ones but there is no harm in recalling at least one good nickname today. She was (and still is) a good looking woman whose initials were S.B (coincidentally they remained the same after her marriage and change of last name). The symbol Sb is used in chemistry for the element antimony. So, she was named Antimony. The name stuck and went viral.

In our times BE College was fully residential. Our routine involved classes from 7am to 11am followed by a two hour lunch break and then more classes from 1pm to 4pm. There were no classes on Wednesdays and Saturdays in the afternoon. Those of us from Calcutta or nearby areas almost invariably used to go home on Saturdays with a load of clothes to be washed there. The fashionable thing was to carry them in a blue bag, the type commonly used by airlines at that time. Especially for 1st and 2nd year students there was a great yearning to show the world (and especially the girls) where we studied by carrying a file marked 'BE College' or a book whose cover proclaimed our identity. My favourite book for this purpose was Timoshenko and Young's Engineering Mechanics published by McGrawHill-Kogakusha which had a glossy cover with the title printed in large letters –ideal for this purpose.

I picked up smoking late in my first year. Before that I was anti-smoking, having been influenced by Reader's Digest which had initiated a campaign again smoking in the late 1950's and stopped accepting cigarette ads. Many considered the campaign unjustified, viewing smoking as a harmless habit. Despite my anti-smoking stance peer pressure proved too much and there was no intense campaign against smoking as it is there now. It was considered smart and macho to hold a cigarette between your fore and middle fingers, letting loose a slow, billowing cloud or a jet of smoke while you chat. You weren't regarded as a matured person, a man of the world until you did that. The two most popular brands were Panama and Charminar. Both were economical- I don't remember the cost of Panama but Charminar was 25paisa for a pack of 10 when I started smoking. Almost 99% students smoked. After trying different brands I settled with Charminar. It was made of cheap, coarse-cut roasted tobacco with an acrid smoke and lacking a filter. It was customary to smoke part of cigarette and then pass the stub to someone else who might pass the stub of the stub to yet another. We called the stubs doga. In its heyday, I smoked an average of 10-15 cigarettes which used to go up to 25-30 at the time of stress such as before examinations. But my initial Reader's Digest indoctrination refused to die resulting in a constant sense of guilt which helped me to kick the habit twenty two years later.

The stories that life of BE College generated and the pranks we played are endless. While in the first year and living in hostel 12 Zak, Moloy and others discovered that the steel rods serving as stands for mosquito netting, if carefully aimed and thrown as projectiles at bare overhead wires outside generated interesting electrical flashes and caused a breakdown of power supply. This was 1961 and power was considered

guaranteed, so a power cut was a cause for jubilation not frustration as started happening after 1970. Eventually this particular prank attracted attention of the feared principal, A.C. Roy. The usual technique employed by him in such cases was to pick up a few boys at random from offending hostels, usually from the ground floor, abuse them roundly, tell them that their study of engineering was at an end, take them to office and make them spend the night there, releasing them in the morning. It spread terror among the boys and generally proved effective.

In another case, an epidemic of loud and profane catcalling took hold of several hostels, so much so that several faculty members complained they could not go to sleep and their little children were picking up unwanted words from Bengali vocabulary. The principal got out and rounded up several boys. It was drizzling at that time. He got behind the wheel of his car, started driving it slowly and made the students run in front of the car in drizzle with headlight at high beam blazing on them in full view of all the hostels instilling fear all around. He made them run about a mile inside the campus chasing them with his car in slow motion all the way, then took them to his office to spend the night there.

Among the single seated hostels Macdonald Hall had the reputation of being the abode of good boys, while adjoining Sen and Sengupta Hall had the opposite reputation. Macdonald's superintendent Prof R.C.Pal used to come on a round occasionally to inspect the hostel. One day, he caught some boys playing cards during study hours. He told them such things were not allowed in Macdonald Hall. If they wanted to play cards they should go to Sen Hall and if they wanted to play cards with stake they should go to Sengupta Hall!

While in college we used to watch films like crazy. Some of us, though not me, saw up to ten a week. No discrimination as to quality-any old film and any number of times would do. Jharna was closest to the college with Mayapuri, Aloka, Bangabasi Navbharat being the others. Most of these halls have folded up now.

One day, at 11am when I was on my way to the hostel, Shyamal Mitra who was with me in E2 ,a good friend and a third generation student in BE College called me into a classroom where a large number of students had assembled. I was wondering about the reason when Shyamal proposed and the assembled students encored that I should run for the general secretary of the student union. The first thing that struck me was not that my studies would suffer but my one hour siesta that I used to treasure. To make the long story short after some hemming and hawing, I agreed, subject

to the condition that Nitai also would run for a union executive post. That was my first step into public life. After this there was no turning back, though there were different periods of remaining dormant. I became the candidate for general secretary and stepped into politics for the first time in life. Not politics in the conventional sense because BE College Student Union was apolitical with nothing to do with any political party. But running for office is very much politics. I also learned my first lesson in politics: to win you must polarize the polity in such a way that it works for you. My adversary was Amarnath Chunder, a handsome guy from Mechanical Engineering from an old north Calcutta family. The polarization did take place not on political lines but on departmental line. I belonged to civil engineering which was an ocean compared to others and this helped me to win. Later in the year I was also pushed not altogether unwillingly, into being the general secretary of BE College annual reunion, a pretty big affair. The net result of this was that I messed up my studies and barely scraped through with a first class in my BE Final section A exams.

Santanu Chatterjee was elected president with me as the general secretary of the student union.Santanu was also an ex Lawrencian and an interesting sequence unfolded between two of us. I have followed him throughout my life always one year and one place behind. He was in Hartley's one year senior to me. The pattern continued in St. Lawrence, BE College, JB-NSTS and the union! However our paths diverged thereafter-he joined in CESC while I chose the Indian Railways. In fact in JB-NSTS he was the first in the first batch and I was the second in second batch! The very last case, however was an exception. He passed away in 2012. Now in 2025, by the grace of God, I am still living, though more than a decade has passed since he said goodbye.

Something momentous happened to me in my fourth year –though it took me a couple of decades to realize its impact and start my journey in politics. In late December 1963, a relic considered holy to Muslims, supposedly a hair of Prophet Mohammed went missing from Hazratbal Mosque in Srinagar, Kashmir. Miraculously the hair was returned a few days later, but that was no solace .Jihadi rage had been kindled in the South Asian subcontinent and needed an outlet. And what better target for such rage than the helpless, beleaguered minority Hindus, especially the women of erstwhile East Pakistan. It didn't matter that they were a thousand miles away from Hazratbal Mosque and had no conceivable connection to the missing hair. They were numerous and unprotected, some of them were well-to-do and their

women were pretty! So, they were attacked. One of the places where the attacks occurred was East Pakistan University of Engineering and Technology (EPUET, now known as Bangladesh University of Engineering and Technology). As a result Hindu students fled the university and the country. A significant number of them enrolled in our fourth year class. They were immediately nick named 'Pakistan Party' and distinguished themselves by speaking the East Bengali patois while we spoke chaste Calcutta Bengali.

I became friends with them over time. Many hailed from our ancestors' district of Tipperah. They were a remarkable bright group, as in Pakistan a Hindu had to be exceptionally talented to get admission in prestigious EPUET. One of them Dipak, enrolled in mechanical engineering and consistently topped the class from day one. Two others in Civil Engineering, Dilip Roy from Comilla and Sukomal Talukdar from Hathazari, Chittagong were also forthcoming. I am still in contact with Sukomal; he lives in the Seattle area of Washington State in the US. With my latent interest in politics I began to question them about what led them to leave Pakistan and the circumstances that forced them to leave. They were quite frank and what they said began to challenge some beliefs that I had held sacred. I strongly feel this was the starting point of my taking politics seriously and getting intensely involved in politics later on. The seed that that had been planted through contact with Pakistan Party in BE College had taken root. It would take many more years to grow into a plant and then into a tree, ultimately changing my whole life.

An Interview with Ila Ghose, 1951, Mechanical, the first woman engineer from B.E. College

Interview by Tanusree Chakraborty,*1991, Civil*

This little girl was a bit different from others in her locality. So when she started riding a bicycle at the age of 12 and learned how to drive a jeep at 16, it raised quite a lot of eyebrows amongst her friends and relatives. But when she wanted to become an engineer, and her affectionate father approved it, it was too much for the people to digest! –"kŭ£eh¡h¤l j¡b¡ M¡l¡f qzu zNzR" they said! .....

It may sound a bit out-of date for the present day situation – but we are not talking about the present now. The incident mentioned above happened 62 years ago – in 1947 when the Indian government opened all the avenues for engineering studies for women, and Ila Majumder, now Ghose, went on to become the first ever woman engineer in Mechanical Engineering from Bengal Engineering College, now Bengal Engineering and Science University, Shibpur, Howrah.

Ila-di's interview was published in the leading English Daily newspaper 'The Telegraph' in 2008. An excerpt of the interview was later published in the GAABESU Newsletter (http://www.becollege.org/GAA/docs/AlumniLink9_2.pdf); but her contact details were not available to us till the end of 2008. Finally, in January 2009, it was possible to get in touch with her with the request of an interview which she gladly complied. We promised not to repeat any of the questions that she has already answered in her interview in 'The Telegraph'– and also promised to make the questionnaire interesting enough so that she too would feel interested to answer them.

To which she replied "I shall certainly try to reply at my leisure to your 'prosnoban' but I have no idea whether it will satisfy you and whether publication of the same in your newsletter will be worthwhile. I shall be looking forward to answer your questions. All my good wishes for GAABESU, I shall try to help you in my own way but please do not forget about my age; I am a 1951 graduate." – but the fervour and enthusiasm she showed in answering all our questions on time, and sending them back via post, in a bunch of neatly hand written 5 pages, most certainly defied her age. She also agreed to share with us a cherished possession – a photograph that was taken in the Strength of Materials laboratory.

Q. Engineering not being a common profession for women, at least in your time, what prompted you to choose engineering as a career? What was your long term professional goal?

A.I guess I had only a fancy about studying engineering as I had no idea what it means. But I always liked challenges and liked to do what people said girls can't do. So I could ride a bicycle at the age of 12 and drive a jeep at the age of 16. I was more or less an intelligent student. I wanted a good profession and wanted to be financially independent. Others didn't matter much.

Q. When you expressed your wish to pursue a career, which was (and still is, to some extent) predominantly male-dminated, what was the reaction in your family?

A. My father late Jatindra K. Majumder was very liberal minded. He was a first class first in MSc, a deputy magistrate (Bengal Civil Service), with six daughters (I am the third) all of whom he wanted to educate as best as he could. He resented very much when friends and relations pitied him for having so many daughters. In my family, only my father's approval mattered, so reactions of

Q. Who encouraged you the most? Was there any hindrance from family and the locality/society? Did you hear any funny comment about your decision?

A. With my father's permission, I appeared in the tests for admission to the medical as well as engineering colleges. It was the first time due to India gaining independence, that all areas of study were declared open in the year 1947 for both girls and boys by the government. I got selected in BE College as well as in Calcutta Medical College. I wanted to opt for engineering and my father agreed.Relations and friends thought it was very unwise. General opinion was "zjzuV¡l Jkň£eh¡h¤l j¡b¡ M¡l¡f qzu zNzR".

Q. Did you have any alternative careers in mind in case your wish was not granted? Or were you 100% sure about your family's acceptance and your capabilities to make

it through?

A. I was adamant as a young girl. If I failed I would have gone for medical studies.

Q. From your interview in The Telegraph, we know that you got through an entrance exam. What kind of exams used to be held those days? How different was the format from the present kind?

A. So far I remember there were several papers to appear. Maths was the main subject paper, a little tough. Also the drawing paper. The others were physics and chemistry which I found not so tough. To tell you the truth, I am not acquainted with the present day entrance exam papers. My interest ceased with both my sons entry into IIT Kharagpur in 1977 and in 1990 respectively.

Q. What was the first day in college like? You said students were shocked to see girl-students in the college – tell us some funny reactions/anecdotes about this if you remember.

A. It was rather uneventful; We two girls went to the class. The other girl 'Ajanta Guha' always wore a trouser and a shirt and I wore a sari in front of many curious eyes. In the afternoon, we had drawing class. In those days, we had to carry the drawing board and the T-square ourselves, and we noticed during the class hours, hundreds of boys peeping into our class room from outside.

Q. Where did you use to stay in college? I believe there were no separate hostels in the college campus.

A. The college authority put us up initially in the ground floor of Principal's quarters in a single room flat with an attached bath. This girls' hostel was later shifted to an adjacent flat of the library.

Q. Tell us something about your college and hostel life. (We may use excerpts from your earlier interview with 'The telegraph' if you permit. and please add something if you want to).

A. As far hostel facilities, a maid servant was employed by the college authority to serve us but it was basically to bring the food from the boys' hostel (Downing, it was). For tea, etc. we used to get them from anywhere. Apart from attending classes, life was very lonely.

Q. Tell us something about your husband's role in your professional life. I, as a full- time professional and a full-fledged "c¤ ze±L¡u f¡ ¢czu Qm¡" woman, realize how important it is to have a supportive family structure. Let us know about your support-system.

A. I completely agree with your comment "c¤ ze ± L¡u f¡ ¢czu Qm¡" for all working women. I don't know how to describe my husband's role, as far as attitude is concerned; he was liberal, with very modern ideas. Being educated abroad, he believed in women's emancipation. But as far as sharing chores of daily life was concerned, he was a total failure. I depended on hired maids who were easily available in those days. I married quite late, in the year 1959. My first son was born in 1960, and the second one was born in 1967. There was a stillborn daughter in 1963 – the grief of losing her I could not forget for which I blame myself and my pressure of work. At that time I was working towards setting up the Government of West Bengal's first polytechnic for women in Calcutta (meant only for girls), recruiting mostly woman teachers and as many woman technical staff as possible.

Q. Tell us some of your professional achievements and especially *the assignment* in particular that will always remain close to your heart.

A. After 2/3 years of work in factories and workshops, I joined Delhi Polytechnic in 1955 to teach. This was the only government engineering college at that time in Delhi, under Delhi University. Within a short time I published two books, 1. Applied Mechanics through worked examples and 2. Hydraulics through worked examples. I could do this without much effort because I used to teach these subjects and wrote exactly the way I used to teach. This was very successful and at a very young age I became quite well off; the books sold very well.

Another assignment in particular that will always remain close to my heart is in the year 1985 when I was appointed a CAO in UNESCO for setting up a Mahila Polytechnic in Dhaka, Bangladesh. I was on deputation and spent nearly two year. I completed my assignment of setting up the same, right from the scratches to the entire process of starting classes in architecture and electronics for only girls in Dhaka. Working at Dhaka gave me a lot of satisfaction as I got so much freedom in carrying out my assignment.

Q. Have you ever faced gender bias in your professional life? If yes, how did you overcome it?

A. Of course, I have faced gender bias all the time in my professional life. I think it will take a long time to change the mindset of the society, and there is no other way to bear it. But it hurts when the cases of selection/promotion comes, how the authorities find flimsy excuses not to offer a woman her rightful place as they feel she is not supposed to boss over men. One had to tolerate this.

Q. What are the comparative professional challenges a woman engineer needed to overcome 50 years ago, 25 years ago and now. Is there any fundamental change or "zpC VÊ¡¢Xne pj¡ze QzmzR"

A.Except in the cases of admission, the challenges remain the same as they were 50 years ago or 25 years ago, and probably even now, according to me. I think it will take another 50 years to change the environment completely when men and women will be treated equally in their workplace and probably women will occupy appreciable number of posts in all hierarchy.

Q. This year maiden Alumni Fellowship for Excellence in Civil Engineering (top score in marks obtained in all 8 semesters) goes to a girl student, Pamela Chakraborty (2008 CE). What message you would like to pass on to her?

A. Hats off to Pamela Chakraborty. This kind of news makes me extremely happy. She is the role model for aspiring woman engineers and will always remain so. I would like to meet her personally and congratulate her.

Q. We know you are the first woman engineer from Calcutta University, but we also think you may be the first "Indian" woman engineer in India. To confirm this, we had posted a question in Yahoo (see link below) but the same still remains un-answered! Can you please throw some light on this?

http://in.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080309041742AAlkPnb

A.I may be the first woman engineer in mechanical discipline from India and Calcutta University, but I heard that from Madras 'Guindy University', one woman engineer or two woman engineers graduated in electrical engineering before me. You can try to find this out by writing to south Indian universities, particularly to 'Guindy University'.

Q. And last but not the least; can we get your permission if GAABESU likes to felicitate you?

A. Well, it will be an honour for me if GAABESU wants to felicitate but after 58 years of my graduation as an engineer, is there a need for it? With all those years of experience, I feel deep affection for all my BE College brothers and sisters.

Memoirs of College Days

Biswanath Chatterjee, *1954, Electrical*
as told to Prosenjit Chakraborty, *1987, Elecrical*

Let me start with a funny story to start my memoirs of BE College. I was a student in the Electrical Engineering Department and Prof. K S Rane was our Head of the Department. He had a European wife. Prof Rane was teaching machine design and the classes were of three hours in duration. In the breaks he used to sit with us, smoke and participate in adda. He used to speak in English and so did we. Sometimes we used to talk in Bengali and used bengali slangs which he used to listen but could not react. During our 4th year he was leaving BE College for a better opportunity and we wanted to give him a farewell gift. We asked our senior dadas for their suggestions. One of them suggested 'Rabindra Rachanbali'. We were surprised when we heard that. He laughed and told us that not only he and his wife know Bengali they are regular visitors to Shantiniketan and have plan to translate 'Rabindra Rachanbali' in English. It gave us Goosebumps. We decided to go to him and apologize for what we have done. He laughed and said that he was also a student and there was nothing wrong and he enjoyed it thoroughly.

I was staying in barracks in the 1st year. These barracks were made for soldiers. 16 students used to stay in one hall which was separated in the middle having 8 beds each side. These barracks were abolished later. I stayed in Slater Hall in the 2nd year, Heaton Hall in the 3rd year and Wolfenden Hall in 4th and final year. I remember an incident of Hunger Strike when we were in Heaton Hall. Prof Basak was hostel superintendent those days. Due to some reasons he has scolded two senior students of architecture using slang English and sent them back to barracks. The students felt insulted and started hunger strike till they were not returned to Heaton Hall. Amitabha Mustafi was our batch mate. One day during this period of hunger strike he pretended to be senseless and lay down on the floor of the class room. Amiabha Mustfi has become a professor in B E College later on. This continued for 10-12 days and got resolved by interference of Prof. A.C.Roy, the then Principal.

Let me share with you another interesting story during our college days. After the test examination 10-12 of us decided to have a night-long walk from Ballykhal to Chandannagar. We decided to go to Ballykhal by bus and from there would start walking and end at Chandannagar. It was also decided that we would land up in Amitabha Mustafi's aunt's house for freshening up, having some sleep followed by lunch and then return to hostel by evening. We started walking as planned. On the way we thought of taking some rest on the bank of the Ganges in Rishra. It was midnight. Suddenly a Police Van landed near us and some policemen came and surrounded us saying that they had information that a gang of dacoits were moving this side. We showed our identity cards but they said that number of student dacoits were increasing those days. They have not listened to us, picked us up and took us to Rishra outpost. They asked us to wait till Officer-in Charge would arrive. It was almost dawn. No Officer-in Charge was visible. We were stuck there for the rest of the night with some local pick pockets and thieves. Early in the morning they have taken us to Srirampur outpost and kept us waiting. Officer-in-charge arrived at 9-30am. We requested him to talk to Amitabha's aunt. He has talked to her and asked Amitabha to talk to her. On Amitabha's aunt's request we were released. We took a bus and went to aunt's house. Needless to say we got a nice treatment and food.

We had a friend named D.S. Ahluwalia. Ahlu was heavily build and looked older than his age. In the night he used to dress in a nightgown with a pipe in his mouth and visited 1st year barracks pretended as Chief Hostel Superintend. He used to take another friend Subir (Basu) as his assistant who used to plant objectionable items under their pillows and beds. Ahlu used to unearth those items and fined them Rs 10, 20 depending on the magnitude of the misdeed. This money was used to have feast where these freshers were also invited.

Sometimes we used to go to esplanade for seeing movies in night show and used to return walking from New Empire to hostel. There were some local cinema halls too. I can remember Jharna, Mayapuri, Aloka, and Bangbasi to name a few. I remember another incident of seeing the movie 'Awara' on first day first show at Bangabasi with Bimal (Bimalpati Roy) who moved to England and married an English girl later. When we arrived all tickets were sold out except a few box seats which was Rs 10 per seat compared to Re 1 for normal seat. We were short of some money and started checking every bus (55) coming from BE College to find if we can find anyone who can give the balance on loan. We were not successful. Finally we sold the cigarettes (Capstan)

left with us to a kindhearted person and managed the balance. We requested the kind hearted man to give us back one cigarette for the way. The man obliged us.

Prof Subodh Ranjan Sengupta was the Principal in our times. Sengupta Hall was named after him later. He moved to IIT, Kharagpur and Prof A.C. Roy took over after a year of Prof Sengupta leaving the college. Meantime one Scottish professor was the Principal. Prof A.C.Roy was a legendary person. Famous tennis player Premjit Lal was his son in law. Prof S.K.Sen was a demonstrator during that time. He left for England for higher studies during our time. Prof M L Dasgupta became HOD – Electrical Engineering after Prof. Rane. Prof Ramesh Pal and Prof. Rakhshit were other senior professors in our time. Prof S S Baral was a student of Prof Rakhshit and used to come to our house. He became a professor in B.E. College later. Ila Majumdar (Ghosh), the first lady engineer was our contemporary. She was three years senior to me. Prof B K Chatterjee was a professor in our time. He was the founder of Chaterjee Polk Industries (owner of Chatterjee International Building) co-owned by Benjamin Kauffer Polk. I was the editor of the newsletter of Society of Electrical Engineering and Buddhadeb Dasgupta (the legendary sarod player) was my batch mate and he was the editor of the newsletter of Society of Mechanical Engineering. Gokulnarayan Muju, a Kashmiri Pandit stood 1st in our batch. Students from different parts of the country and outside (Indonesia, Nepal etc) used to come to our college. Salil Ghosh of our batch became Managing Director of Bridge and Roof. One of my batchmates, Sashanka Sekhar Roy (brother of famous eye specialist I.S. Roy) worked in Philips and subsequently started his own company Ronics which was very successful at that time. My brother, Somnath Chatterjee has also graduated from our college in 1961. He was Director of KMDA.

During our time the classes were shifted from old building to new building. The new building was constructed near the old building only. During first few months we had classes in old building. Prof G P Reddy was HOD –Metallurgy in our time. Another distinguished professor of Metallurgy in our time was Prof Baradananda Chatterjee. His wife Prof Asima Chatterjee was a renowned professor in Science College , Kolkata University that time. She was the first lady who received doctorate from an Indian University in 1944. Prof Karuna Roy was HOD-Civil. Prof Fairmont was HOD-Mechanical and Prof. Bhupal Dutta and Prof Durgadas Banerjee were professors in Mechanical Engineering Department. Number of students during those days were less than 200. Civil Engineering Dept. had 80 students, Electrical and Mechanical had 25

students each. There were 10-12 students in Metallurgy. Architecture was another big department.

I started my carrier with WBSEB and left WBSEB after a month of joining and started working in Orient Fan. After a brief stint in a company in Rishra I joined Hastings Jute Mill as Chief Engineer in 1969. Subsequently I have worked as a Chief Engineer in NJMC (national Jute Manufacturers Corporation) having 12000 workers. I have finally worked in Alexander Jute Mill as Chief Engineer and retired from there after spending 14 years in that organization. After retirement I have been giving consultancy to a number of mills like Meghna Jute Mill, Shyamnagar North Mill, Angus Jute Mill, Bally Jute Mill to name a few. I have stopped working and restricted my movements after having a pace maker in 2015.

কিছু টুকরো স্মৃতি

অনিল কুমার দাস, ১৯৫৭, *ইলেকট্রিকাল*

আমি তখন জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াই। ফার্স্ট ও সেকেন্ড ইয়ারের আমি ড্রয়িং এর এক্সামিনার ছিলাম। একটি ছেলে ৩-৪ নম্বরের জন্য পাস করতে পারছিল না। অনেক চেষ্টা করেও ওই কটা নম্বর দেবার সুযোগ পেলাম না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। দু চার দিন পরেই বি ই কলেজ থেকে ভূপালদা এলেন এক্সটারনাল এক্সামিনার হয়ে। খাতাটা তাকে দেখিয়ে কি করা যায় জানতে চাইলাম. খাতা দেখে দাদা বললেন আইসোমেট্রিক ড্রয়িংটা ঠিক করতে পারেনি বলে নাম্বার পায়নি কিন্তু আইসোমেট্রিক স্কেলটা তো ঠিক করেছে তার জন্য ক্রেডিট পাবেনা কেন? শুনে আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল এবং ভূপালদার উপর শ্রদ্ধা শত গুণ বেড়ে গেল। ছেলেটি এক্সট্রা নম্বর পেয়ে পাস করে যেতে খুশী হয়ে ছিল আমি বোধ হয় তার চেয়েও বেশি খুশি হয়েছিলাম।

আমাদের ফার্স্ট ইয়ারএ অর্থাৎ ১৯৫৩ সালের একটা ঘটনা বলার লোভ সামলাতে পারছি না. আমি তখন ফার্স্ট ইয়ার। একদিন সন্ধ্যায় আমাদের দুই দাদা, খুব সম্ভব ফোর্থ ইয়ারের, উলফেন্ডেনের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব ও হাসাহাসি করছিলেন. সেই সময় কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর এবং উল্ফের সুপার ডঃ বসাক হোস্টেলে ঢুকছিলেন।।তিনি ভাবলেন দাদারা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। তিনি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তখনই প্রিন্সিপাল এ সি রায়ের এর কাছে কমপ্লেন করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই দুই দাদা কে ব্যারাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। শুরু হয়ে গেলো প্রতিবাদ। ক্যাম্পাসে প্রচণ্ড উত্তেজনা। ছেলেরা অনশন ঘোষণা করে দিলো। দু তিন দিনে অবস্থা চরমে পৌঁছলো।ছাত্ররা দলে দলে অসুস্থ হয়ে পড়ল। কলেজ এর হসপিটাল ভর্তি হয়ে গেলো। খবর পেয়ে তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান রায় প্রিন্সিপালকে ডেকে পাঠালেন। ম্যাজিকের মত সব ঠিক হয়ে গেলো। দাদারা সগৌরবে মিছিল করে হোস্টেলে ফিরে এলেন। অনশন তুলে নেওয়া হলো। একটা কথা চুপি চুপি বলে রাখি, আমার মত যাদের বাড়ি কলকাতা বা কলকাতার কাছে তাদের অনশন করতে কোন অসুবিধা হয়নি।ব্যাপার টা বোঝা গেল?

একটি ছোট ঘটনা কি ভাবে আমার জীবনের মোড়টা ঘুরিয়ে দিল বন্ধুদের সঙ্গে আজ শেয়ার করবো। কলেজ থেকে বেরিয়ে ট্রেনিং শেষ করে চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে কৃষ্ণনগর পলিটিকনিকের জন্য লেকচারার চেয়ে অ্যাড বেরিয়েছে দেখে অ্যাপ্লাই করে দিলাম। আমার খুব একটা ইচ্ছা ছিলনা। তবুও ইন্টারভিউ পেয়ে চলে গেলাম। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান। আমার পাশের সিটে বসা এক জন মেম্বার খুব আস্তে প্রায় কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি পলিটেকনিকে আসতে চাইছ কেন?' আমি বললাম, 'কোথাও পাচ্ছি না। তিনি বললেন,' আর একটু চেষ্টা কর না পেলে

এস, আমি নিয়ে নেব।' বেরিয়ে এসে জানতে পারলাম তিনি আমাদের কলেজেরই এক জন সিনিয়র দাদা। মনটা আনন্দে এবং কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। এর কিছুদিন পরেই স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডে পেয়ে গেলাম। দাদার কথা এখনো কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

আমাদের সময় (১৯৫৩-৫৭)বি ই কলেজে খরচ হত এই রকম: কলেজ ফি ১৬০ টাকা প্রতি বছর ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ইয়ারে এবং ২০০টাকা প্রতি বছরে থার্ড এবং ফোর্থ ইয়ারে। হোস্টেল ফি ৩৫ টাকা প্রতিমাসে। প্রতিমাসে দু-তিনটে সিনেমা দেখে আর বার দুয়েক আমিনিয়াতে খেয়ে ১০০ টাকায় দিব্যি মাস চলে যেত।

সম্প্রতি সি ই এস সি'র একজন অতি সিনিয়র অফিসার এর মহিলা কর্মীদের হাতে নিগৃহীত হওয়ার খবর জেনে এবং এই সম্বন্ধে আমার বন্ধু দের নানা প্রতিক্রিয়া দেখে আমিও কিছু কমেন্ট করার এবং আমার ব্যাক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করার লোভ সামলাতে পারছিনা। জানিনা এই প্রজন্মের কাছে আমার মতামতগুলো কতটা গ্রহণযোগ্য হবে। আমার উদ্দেশ্য কাউকে সমালোচনা করা নয়, শুধু আমার নিজের ঘুমন্ত মনটাকে জাগিয়ে তোলা। আমার ৪৩ বছর কর্ম জীবন প্রায় পুরোটাই আনন্দের সঙ্গে এবং গৌরবের সঙ্গে উপভোগ করেছি। মনে আছে ১৯৮৩ অথবা ১৯৮৪তে কয়েকটা অযৌক্তিক দাবি তুলে ইউনিয়ন স্ট্রাইক করে দিল। লোকাল ম্যানেজমেন্ট কিছু করতে পারলো না। বেশ কিছু দিন প্ল্যান্ট বন্ধ থাকার পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ আর আন্তুলে এলেন দুর্গাপুরে ঝামেলা মেটাতে। সবচেয়ে ঝামেলার ব্যাপার হলো ম্যানেজমেন্ট আমাকে পাঠালো মন্ত্রীর কাছে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার জন্য।আমার কথা এক-দু মিনিটের জন্য শুনেই মন্ত্রী বললেন,' ঠিক আছে। আমি দেখে নিচ্ছি।' তারপরেই ইউনিয়নের লোকেদের সঙ্গে মিটিং করে তাদের কিছু সাময়িক অনুদান দিয়ে ব্যাপারটা তখনকার মত থামিয়ে দিলেন।

কলেজে আমাদের ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলেন প্রফেসর এস এন রায়।খাঁটি বিলাতি ডিগ্রি। মাঝে মাঝে শখ করে দুয়েকটা ক্লাস নিতেন। তখন মনে হত যে সব সাহেব ওঁকে ডিগ্রি দিয়েছে বা ডিগ্রির জন্য সুপারিশ করেছে তাদের ডিগ্রিগুলো আগে কেড়ে নেয়া উচিত। তিনি ক্যাম্পাসে একাই থাকতেন, ওনার স্ত্রী কলকাতা থাকতেন কারণ শিবপুর এ তাঁর সঙ্গে মেশার মতো কোনো অ্যাসোসিয়েশন ছিলনা। তবে মাঝে মাঝে কোনো অনুষ্ঠান থাকলে লেডি রানু মুখার্জীর সঙ্গে এসে দু চারটা সিগারেট ফুঁকে আমাদের ধন্য করে দিয়ে যেতেন। প্রফেসর রায়ের সাথে আমার একটা সংঘাত হয়েছিল। সেটা পরে বলছি।

'পূর্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি।
ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই তার লাগি আজ বাজাই বাঁশি'

ফাইনালের রেজাল্ট বেরোবার পর গিয়ে প্রফেসর বড়ালকে আমার টেলিকম নিয়ে উচ্চশিক্ষার ইচ্ছা জানালাম। স্যার খুব উৎসাহিত হয়ে বললেন,' তোমাকে VHF Comunication পড়াবো তবে তার জন্য প্রফেসর রায়ের একটা অনুমতি লাগবে। তুমি তার সঙ্গে দেখা কর।' আমি চলে গেলাম প্রফেসর রায়ের চেম্বারে কিন্তু তিনি তখন ছিলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে আসছিলাম। মাঝ পথে দেখা হয়ে গেল। পথ্টা ছিল ইলেক্ট্রিকাল ল্যাবের মধ্য দিয়ে। ল্যাবরেটরি তখন জনশূন্য। সাহেব আমাকে দেখা মাত্র তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে চিৎকার চালু করে দিলেন। আমার কোন কথাই শুনতে চাইলেন না। মনে হলো উনি ভেবেছেন আমি কিছু চুরি করার মতলব নিয়ে ওখানে গিয়েছি। মনটা এত খারাপ হয়ে গেল যে প্রফেসর

বড়ালের এর সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে এলাম। বহু বছর পরে এই সাহেব কে দূর থেকে দেখলাম- মলিন বস্ত্র, কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনি ব্যাগ। দূর্গাপুর স্টেশনের ওভারব্রিজ দিয়ে চলেছেন। বুঝতে পারলাম জ্ঞানের পসরা নিয়ে আর ই সি যাচ্ছেন।

ডিপার্টমেন্ট জানেনা উনি শুধু নিজের অহমিকা বজায় রাখার জন্য আমার কত বড় ক্ষতি করেছেন। ইলেক্ট্রিকাল কমিউনিকেশনের প্রতি আমার যে প্রবল আগ্রহ ছিল এবং এখনও আছে তা অনেকেই জানে। প্রফেসর বড়াল এটা জানতেন এবং এত খুশি হয়েছিলেন যে ভি এইচ এফ কমিউনিকেশনের উপর মাস্টার ডিগ্রি শুরু করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তখন যেহেতু কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট ছিলনা এবং প্রফেসর বড়াল ইলেকট্রিকাল ডিপার্টমেন্টে ছিলেন তাই প্রফেসর রায়ের সম্মতি ছাড়া কোর্স চালু করা সম্ভব ছিলনা। আমি অতি উৎসাহে প্রফেসর রতসাহেসে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জ্বলে উঠলেন এবং তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো আমার ওপর। আজ বুঝতে পারি তীব্র অহমিকাবোধ মানুষকে কোন স্তরে নামিয়ে আনতে পারে। যাই হোক আমি প্রফেসর বড়ালের মত একজন মহান শিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম। পরবর্তীকালে ভারত সরকারের কাছ থেকে হ্যাম রেডিও স্টেশন স্থাপন এবং চালনার লিখিত অনুমতি লাভ করে আমার সারা জীবনের দুঃখ একটু হলেও কিছুটা কমেছিল। আজ ৯২ বছর বয়সেও সেই আগ্রহ এতটুকু কমেনি।

ক্রিস্টাল সেট তৈরি করলাম, সব দুঃখ ভুলে গিয়ে কলকাতা রেডিওর দুটো চ্যানেলই (৩৭০.৪ এবং ৩০০) শুনতে লাগলাম। অবসর সময়ে মাঝে মাঝে কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো বই এর দোকান গুলিতে হানা দিয়ে এই সম্বন্ধে কোনও বই পেলেই নিয়ে আসতাম। কলকাতা রেডিও বেতার জগত নামে একটা পাক্ষিক পত্রিকা করতো তাতে কবে কখন কার প্রোগ্রাম হবে দেয়া থাকত। দাম ছিল আট বা দশ আনা। ওটা পেয়ে প্রথমে আমার পছন্দের আইটেম গুলো বের করে দাগ দিয়ে রাখতাম। আমি স্কটিশ চার্চ কলেজের এর একটা হোস্টেলে কিছুদিন ছিলাম। ওই কলেজের একজন লেকচারার এবং হোস্টেলের অ্যাসিস্টান্ট সুপার আমার পাশে দুটো ঘর নিয়ে থাকতেন। তিনি হঠাৎ হঠাৎ এসে আমার কাছ থেকে হেডফোন দুটো নিয়ে কানে লাগিয়ে আমার খাটে শুয়ে পড়তেন। আমার বলার উদ্দেশ্যে হল তার আগ্রহটা দেখবার মতো। এই ভাবে দিন কেটেছে মহা আনন্দে।

অনেক জল ঘোলা হয়েছে। এবার ওই সব বন্ধ করে এবার একটা বিষয়ের উপস্থাপন করতে চাই যা একান্ত আমার ব্যক্তিগত। অনেকের কাছে বিরক্তিকর লাগতে পারে তবে আমার বিশ্বাস দু এক জন নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন। ব্যাপার টা হল কী ভাবে আমি ইলেক্ট্রিকাল কমিউনিকেশনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলাম। একটু পিছিয়ে যেতে হবে। আমার জন্ম হয়েছিল পূর্ব বাংলার মেঘনা নদীর মোহনায় দক্ষিণ শাহবাজপুর নামে একটা দ্বীপে। জায়গাটা ছিল বরিশাল জেলার অন্তর্গত। একেবারে প্রত্যন্ত এলাকা। না ছিল ইলেক্ট্রিসিটি, না ছিল খবরের কাগজ। প্রথম বৈদ্যুতিক আলো দেখতে পেলাম ১১ বছর বয়সে বরিশাল স্টিমার স্টেশনে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম জানতে পারলাম গ্রামের স্কুল থেকে ক্লাস সিক্স পাস করে যখন সদরের স্কুলে গিয়ে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হলাম। রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখতেন, কবিতা লিখতেন এইটুকুই জানতাম। তিনি যে গান লিখতেন সেটা জানতাম না। রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রথম শুনলাম ১৯৪৯-এ কলকাতা

এসে। শুনতে খুব ভালো লাগতো। পান বিড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শুনতাম। এই গানকে যে রবীন্দ্র সঙ্গীত বলে সেটা জানতে পারলাম আরও কিছু দিন পরে।তখন থেকেই মন ছটপট করছিল একটা রেডিওর জন্য কিন্ত উপায় ছিল না। এই ভাবে আই এসসি শেষ হলো, বি এসসি ভর্তি হলাম। হঠাৎ একদিন ফিজিক্স বইতে ক্রিস্টাল রিসিভারের এর সার্কিট দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠলাম কিন্তু জিনিস পত্র কোথায় পাবো ? কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করলাম ডাঃ বিধান রায়ের বাড়ির পেছনে ব্যাপারিতলা লেনে ডিসপোসাল মার্কেট। সেখান থেকে হেডফোন এবং ডালহৌসি স্কোয়ারের রেডিও সাপ্লাই স্টোর থেকে ক্রিস্টাল, টিউনিং কন্ডেনসার ইত্যাদি কিনে এনে বানিয়ে ফেললাম ক্রিস্টাল রেডিও। আমার জয় যাত্রা শুরু হলো। আনন্দে মন ভরে উঠলো। স্কটিশচার্চ কলেজের হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা এবং অবসর সময়ে ক্রিস্টাল সেটে রেডিও প্রোগ্রাম শুনে দিন বেশ আনন্দে কেটে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে রেডিও টেকনলজি, ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি আর টেলিফোনির কিছু বই ও জোগাড় হয়ে গেছে কিন্তু কাজে নামতে পারছিলাম না কারণ রুমে সোলডারিং আয়রন লাগাবার পয়েন্ট ছিলো না। হোস্টেল রুমে একটি মাত্র আলো। কোনও পাখা নেই, প্লাগ পয়েন্ট নেই। আমাদের যাদবপুরের বাড়িতে ইলেক্ট্রিসিটি ছিলনা কারণ আমরা জবর দখল করা বাড়িতে থাকতাম। আমার অবস্থা ছিল পুরাণের বৃহস্পতির পুত্র কচের মত। শিখবে কিন্তু পারিবে না করিতে প্রয়োগ। বি ই কলেজে চান্স পেতেই আমার দুঃখ রজনীর অবসান হল। ট্রান্সিসটরর তখনও আসেনি আমাদের দেশে,ভ্যাকুয়াম টিউব দিয়ে রেডিও বানানো হতো। নিজের জন্য একটা টুইন ট্রায়োড ভ্যাকুয়াম টিউব দিয়ে একটা রেডিও বানিয়ে ৩ ইঞ্চি স্পিকার লাগিয়ে শুনতে লাগলাম। এত দিনে মনে শান্তি এলো।

১৯৫৭ সালে পাশ করে ট্রাম কোম্পানিতে তে এক বছর ট্রেনিং করে ১৯৫৯ সালে এ ২০০-১৫-৫০০ স্কেলে WBSEB তে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়রের এর চাকরি পেলাম। ৫০টাকা ডিয়ারনেস অ্যালাউয়েন্স। জবরদখল কলোনিতে তে ছিলাম বলে বাড়ি ভাড়া পেতাম না।১৯৮৯ সালে যখন চাকরি ছাড়লাম তখন মাস মাইনে ৩০০০ টাকা।

সিঙ্গল ভাল্ব রেডিওটা পুরনো হতে চললো, ভেবেছিলাম একটা পাঁচ ভাল্বের এর থ্রি ব্যান্ড রেডিও বানাবো। ম্যাডান স্ট্রিটে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম ১০০-১২৫ টাকা মত লাগবে। অত টাকা কোথায় পাবো? দিন চলে যায়, মনে শান্তি নেই। কয়েক দিন পরেই এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে গেল। আমার বন্ধু বিনয় সাহা (মেটালার্জি) বলল,'অনিল, আমাকে একটা রেডিও বানিয়ে দিবি?' আমিতো হাতে স্বর্গ পেলাম। তখনই ওকে নিয়ে ম্যাডান স্ট্রিট চলে গেলাম এবং সব মালপত্র কিনে নিয়ে এসে কাজ শুরু করে দিলাম। দিন তিন চার এর মধ্যে রেডিও বানিয়ে বিনয়কে দিলাম। বিনয় খুব খুশি আর আমি ওর চেয়েও বেশি খুশি। রেডিওটা বিনয় বাড়ি নিয়ে গেলো। এরপর আর কোন বন্ধু রেডিও বানাবার অর্ডার দেয়নি। তবে দুই বন্ধু তাদের বাড়ির রেডিও সারাই করতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। একজন রথীন বর্ধন (সিভিল) আরেকজন মিহির লাল মিত্র (মেকানিকাল) ।মিহির ছিল বেলেঘাটার বিখ্যাত রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের বাড়ির ছেলে। ওর মা আমাকে খুব খাইয়ে ছিলেন মনে আছে। মিহির ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টারে ছিল। কলকাতায় ফিরে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। ও আর আমাদের মধ্যে নেই। কলেজে থাকতে রেডিও আর বানাই নি। থার্ড ইয়ারে উঠে প্রফেসর বড়ালের কাছে অপশনাল পেপার নিয়ে ইলেক্ট্রিকাল কম্যুনিকেশন

পড়তে থাকলাম। আমাদের কলেজ জীবনে ট্রানসিস্টর রেডিও দেখিনি। কলেজে থেকে বেরিয়ে বাজারে ফিলিপ্সের কয়েকটা ট্রান্সিসস্টর যেমন OC44, OC 71, OC 72 দেখতে পেয়ে ছিলাম এবং ওই দিয়ে বাড়িতে কয়লার উনুনে সোলডারিং আয়রন গরম করে একটা লোকাল রেডিও বানিয়ে আমার বান্ধবী কে উপহার দিয়েছিলাম।ওর বাড়িতে ইলেক্ট্রিসিটি ছিল না তাই রেডিওটা পেয়ে খুব খুশি।

প্রসঙ্গ বদল করে একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। জলপাইগুড়ি ইনজিনিয়ারিং কলেজ সদ্য খুলেছে। আমি ইলেক্ট্রিকাল ডিপার্টমেন্টের লেকচারার হয়ে জয়েন করলাম । আমাকে একটা হোস্টেলের সুপার করে দেওয়া হলো। হঠাৎ একদিন রাত দুটোয় খবর এল মৃত্যুঞ্জয় নামে ফার্স্ট ইয়ারের এর ছেলেকে ওর বন্ধুরা খুব মেরে রাস্তায় ফেলে রেখে এসেছে। আমি ছুটে গেলাম এবং জানতে পারলাম মৃত্যুঞ্জয় এক বন্ধুর বাক্সের তালা ভেঙে টাকা চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল। মৃত্যঞ্জয় বন্ধুদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল এবং প্রায়ই বন্ধুদের রেস্টুরেন্ট নিয়ে গিয়ে খাওয়াতো। এবার বোঝা গেল এত দিন ও মাছের তেলে মাছ ভেজে যাচ্ছিল।

বি ই কলেজে চার বছর হওয়ায় ভেসে বেড়ানোর দিনগুলির কথা বলতে গেলে সব একসাথে এসে ভীড় করে মনে। কাকে ছেড়ে কোন কথা আগে বলব ভেবে পাই না। ঘুরে ফিরে আবার সেই ইলেক্ট্রিকাল কম্যুনিকেশনে ফিরে এলাম। আমদের যিনি লাইন কম্যুনিকেশন পড়াতেন সেই প্রফেসরের নামটা আমি মনে করতে পারছি না এত দিন পরে। তার জন্য আমার অনুশোচনার শেষ নেই। তিনিও প্রফেসর বড়ালের মত ছাত্রদের ভালোবাসতেন। একটা

উদাহরণ দিচ্ছি। থার্ড ইয়ারের গোড়ার দিকে তিনি আমাকে একটা ২৫০ ভোল্ট পাওয়ার প্যাক বানাতে বললেন ইলেক্ট্রিকাল ল্যাবরেটরিতে। সব কমপোনেন্টস ওখানে ছিল। আমি কাজ শেষ করে সুইচ অন করার আগে স্যার কে ডেকে নিয়ে এলাম। সব চেক করে স্যার বললেন তুমি ফিলটারিং কন্ডেন্সারটা ২৫০ ভোল্ট রেটিং না দিয়ে একটু বেশি রেটিং-এর দাও। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।আমি বললাম,' কেন স্যার? ২৫০ ভোল্ট ডি সি সাপ্লাই-এর জন্য ২৫০ ভোল্টের কন্ডেন্সার লাগিয়েছি, বাড়াতে হবে কেন? ' স্যার একটু মুচকি হেসে বললেন ,'ঠিক আছে, অন করে দেখ।'আমি পাওয়ার অন করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে কন্ডেন্সারটা বোমার মত আওয়াজ করে ফেটে গেল। স্যার আওয়াজ শুনে চলে এলেন। বললেন যে রেক্টিফিকেশনের পর অ্যাভারেজ ডি সি ভোল্টেজ ২৫০ থাকলেও peak ভোল্টেজ ২৫০-এর বেশি থাকে। আমি বললাম,' স্যার এ কথাটা আগে বললে তো কন্ডেন্সারটা নষ্ট হত না, কত টাকা নষ্ট হয়ে গেল!' স্যার বললেন,' নিজের ভুল থেকে শিক্ষা পেলে তা সারাজীবন মনে থাকে।' এত দিন পরে ও কথা টা আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে যদিও আমি স্যারের নামটা মনে করতে পারছি না।

আমাদের সময়ের ইলেক্ট্রিকাল ডিপার্টমেন্টঃ

হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট – প্রফেসর এস এন রায়

অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর – ডঃ এম এল দাশগুপ্ত, ডঃ এস কে সেন, ডঃ আর সি পাল

লেকচারার – এইচ ব্যানার্জী

ডেমনস্ট্রেটর – এ এম রায়, এ এন দে, এ মুস্তাফি

রিসার্চ – পি মুখার্জী, জে এন দে

প্রফেসর বড়াল ছিলেন ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের হেড। পি কে চ্যাটার্জী, পি এন দাস এবং কে কে মজুমদার ছিলেন লেকচারার।

আমি ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফার্টিলাইজার করপোরেশনের প্ল্যানিং এবং ডেভেলপমেন্ট ডিভিসনের একটা অ্যাড দেখে অ্যাপ্লাই করে সিন্ধ্রি থেকে ডাক পেলাম এবং যথাসময়ে গিয়ে হাজির হলাম। বি আই টি, রাঁচি থেকে থেকে একজন ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রফেসরকে বোর্ড মেম্বার করা হয়েছিল। । যেহেতু আমি টিচিং-এ ছিলাম ওই প্রফেসর আমাকে নিয়ে পড়লেন। অন্য মেম্বাররা দু একটা প্রশ্ন করে আমাকে প্রফেসরের হাতে সঁপে দিলেন। প্রফেসর একটার পর একটা থিওরি এমনকি থেভনিনের থিওরিও জানতে চাইলেন। যেহেতু টিচিং-এ ছিলাম বেশ ভালোই লাগছিল। । উঠে আসবো এমন সময় প্রশ্ন করলেন একটা ডি সি শান্ট মোটর কিছু ক্ষণ চলার পর স্পিড একটু বেড়ে গেল- কেন? আমি জবাব দিয়ে (জবাবটা ঠিক ছিল) বেরিয়ে এলাম। কিছু দিনের মধ্যেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলাম। বেসিক পে ৪১০ টাকা (স্কেল- ৩৫০-৩০- ৮৫০)। দিন কয়েক পরে আর একটা চিঠি এল যে আমার মাইনে ৪৪০ টাকাতে ফিক্স হয়েছে।

আমরা যখন কলেজে ছিলাম বা কলেজ থেকে বেরিয়েছি তখন পাবলিক সেক্টরে অনেক বড় বড় ইনডাস্ট্রি এসে গিয়েছিল এবং নতুন নতুন ইনডাস্ট্রি আসছিল। তবে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড একটা বড় ভরসার জায়গা ছিল। এখন তো সেই সব প্রায় বন্ধ। কোনো নতুন বড় প্রসেস বা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডস্ট্রি হচ্ছে বলে শুনি না। শুধু তথ্যপ্রযুক্তির কথা শুনি। অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়রিং কলেজের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ইয়ং ছেলে মেয়েরা কোথায় এবং কী ধরনের কাজ করছে এবং সেই সব কাজে তারা কতটা খুশি আমার জানতে ইচ্ছে হয়।

কাজের মধ্যে আনন্দ খোঁজা এবং আনন্দ পাওয়া যেটা আমি প্রচুর পেয়েছি তারই একটা আজ বলতে ইচ্ছে করছে। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে আমার সিন্ধ্রি থেকে বদলি হয় আসামের নামরূপ প্ল্যান্ট ইরেকশন এবং কমিশনিং-এর জন্য। একদিন দুপুরে লাঞ্চ এর পর সাইটে পৌঁছে অফিস রুমে না ঢুকে ভাবলাম সাইটটা একটু ঘুরে দেখে আসি। ইউরিয়া প্ল্যান্টের ইলেকট্রিকাল সাব স্টেশনের দরজায় পৌঁছে একটা অদ্ভুত রকমের আওয়াজ শুনতে পেলাম। উঁকি মেরে দেখি একজন লেবার কংক্রিট স্লারির উপর পরে আছে। গায়ের উপর একটা ফ্লেক্সিবল কর্ড। বুঝতে পারলাম ফ্লোর কঙ্ক্রিটিং হচ্ছিল এবং ও ভাইব্রেটর চালানোর সময় শক খেয়ে পড়ে গেছে। ফ্লেক্সিবল কেবল টার ইনসুলেশন ড্যামেজ এবং ওর গায়ের ওপর পরে ক্রমাগত শক দিচ্ছে। কাছাকাছি কোনও সুইচ দেখতে পেলাম না। আমি কেবলটাকে ফলো করে ছুটতে আরম্ভ করলাম। ২৫-৩০ ফুট গিয়ে একটা ছোট খালের ধারে পৌঁছে ওটা পেরোতে না পেরে সুইচ অফ, সুইচ অফ করে চেঁচাতে লাগলাম। ওপারে একজন অফিস থেকে বেরিয়ে এসে মেন সুইচ অফ করে দিল। লোকটাকে হসপিটাল পাঠিয়ে দেওয়া হল। ডাক্তাররা যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে লোকটা বেঁচে গেল। খবর পেয়ে আমরা সবাই খুব খুশি। আমার আনন্দ আরো বেশি এইজন্য যে আমি সময় মতো অ্যাকশন নিতে পেরেছিলাম।কী

অদ্ভুত যোগাযোগ! ওই সময় আমার ওখানে যাবার কথা ছিলো না তবুও আমাকে কোন শক্তি টেনে নিয়ে গিয়েছিল এখনও ভেবে পাই না। লোকটাকে যে বাঁচাতে পেরেছিলাম সে আনন্দ এখনও মন কে নাড়া দিয়ে যায়।

আমার আগের পোস্টে share করে ছিলাম এমন একটা ঘটনা যা ছিল দুঃখে সুখে মেশানো.জীবনে তো অবি মিশ্র আনন্দ বা সুখ হতে পারে না. "আছে দুঃখ আছে। মৃত্যু বিরহ দহন রাজে, তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে''। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি তাই তো দীর্ঘ 29 years সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবন এর শেষ প্রান্তে পৌছে এত আনন্দে আছি এবং young বন্ধুদের সঙ্গে share করে সেটা আর ও বাড়ানোর প্রয়াস করছি। বন্ধুরা কোনো controversial issue তুলে আমাকে বিব্রত করবেন না। খুব বড় হয়ে যাচ্ছে। এখানে শেষ করছি. শীঘ্রই ফিরে আসছি।

সময়টা ১৯৭০-৭১, আমি তখন এফ সি আই, নামরূপে অ্যামোনিয়া প্ল্যান্টে কর্মরত। একদিন সকালে আমি যখন প্ল্যান্ট ঘুরে দেখছিলাম আমাকে ইন্টারকমে যোগাযোগ করতে না পেরে আমার বস প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়রকে ফোন করে জানালো যে অপারেশনের লোকেরা খবর দিয়েছে সিন্থেসিস গ্যাস কমপ্রেসর মোটরের স্পিড চেক করা দরকার কারণ নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন সঠিক পরিমাণে রিঅ্যাক্টরে ঢুকছে না। সিন্থেসিস গ্যাস কমপ্রেসর মোটর ২৫০০ বি এইচ পি ১১ কে ভি সিঙ্ক্রোনাস মোটর। ফোন পেয়েই বসের মাথা গরম, দৌড়ে প্ল্যান্টে চলে গেলেন এবং একজন কে পাঠালেন একটি ট্যাকোমিটার আনতে মোটরের স্পিড চেক করার জন্য। আমি ততক্ষনে স্পটে এ পৌঁছে গিয়ে ব্যাপারটা শুনলাম এবং ওই লোকটিও ট্যাকোমিটার নিয়ে ওখানে পৌছে গেল। আমি বসকে বললাম সিঙ্ক্রোনাস মোটরের স্পিড ট্যাকোমিটার দিয়ে চেক করার দরকার নেই, সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক থাকলে যদি চেক করতেই হয় তাহলে এই লোকটি চলে যাক পাশেই পাওয়ার স্টেশন, গ্যাস টারবাইনের স্পিড চেক করে আসুক।আমার বস খুব ভালো মানুষ ছিলেন কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ছিল না। কেবলমাত্র কর্মদক্ষতার জন্য ওনার পদোন্নতি হয়েছে। এই সিস্টেমটা এফ সি আইতে খুব চালু ছিল তখন। আমি তখন অপারেশনের এর যিনি দায়িত্বে ছিলেন তাকে বললাম,' আমার বসকে ভালো মানুষ পেয়ে খুব নাচিয়েছো, এবার আমি তোমাদের নাচাবো। Now tell me… Synthesis Gas Compressor is a reciprocating compressor. Have you checked that the byepass valve is fully closed for 100 p.c.loading of the compressor? উত্তর এলো, 'Yes'. আমি বললাম, 'I'm not convinced. My doubt is that the Valve is stuck up at some point. Get it checked thoroughly by Mechanical and Instrumentation people". যা ভেবেছিলাম তাই হলো। সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল। আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য হল এই যে যেখানে অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট জড়িত থাকে সেখানে নিজের কাজ বাদে অন্যদের কাজ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। অনেকসময় সেটা আত্মরক্ষার জন্য কাজে লাগে।

এবার এমন একটা ঘটনার কথা বলব যেটা তে আমি আসামীর হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়ে ছিলাম দুটো কারণে। প্রথমত আসামী আমার নিজের ডিপার্টমেন্টের এবং দ্বিতীয়ত ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় শূণ্য। এটা

এফ সি আই, দূর্গাপুরের ঘটনা, আমি তখন দূর্গাপুরে পোস্টেড। একদিন সকালে ইউরিয়া প্ল্যান্ট ভিসিট করতে গিয়ে দেখি জিএম সাহেব বিষণ্ণ মুখে একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি খুব অবাক হয়ে জানতে চাইলাম কী হয়েছে। তিনি একজন মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, নামরূপ প্ল্যান্টে এক সঙ্গে ছিলাম। তিনি চিফ ইঞ্জিনিয়ার আর আমি চুনোপুঁটি। তিনি পরে দূর্গাপুর আসেন জি এম হয়ে। সেই পুরনো বন্ধুত্বের সম্পর্কটা ছিল। তিনি বললেন, 'দেখোনা, মেকানিকালের লোকেরা এই পাম্প এর ওভারহল করেছে এখন ডিসচার্জ প্রেসার ৬০% এর বেশি উঠছে না। শুনেই আমি বুঝতে পারলাম যে আমার ডিপার্টমেন্ট এবং পরোক্ষভাবে আমিই দোষী। আমি সাহেবকে বললাম,' আপনার এখানে থাকার দরকার নেই আমি দেখছি।' সাহেব বললেন,' তুমি বিজলিওয়াল। তুমি কী দেখবে?' আমি বললাম,' আমাকে দশ মিনিট সময় দিন, না পারলে তখন বলবেন।' উনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলে গেলেন আর দশ মিনিটের মধ্যে সমস্যা মিটে গেল। কেউ জানতেও পারলো না কী হয়েছিল।

নামরূপে জয়েন করার পর দূর্গাপুরে বদলি হয়ে এসে প্রায় সাড়ে ন' বছর কাজ করে ১৯৮৫ সালের ১লা মে হলদিয়া ফার্টিলাইজারে বদলি হয়ে এলাম। ওখান থেকে ভলান্টিয়ারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে চারবছর পরে আমার চাকুরিজীবনের ইতি ঘটালাম।

মায়ের স্মৃতি সামান্য কয়েকটি টুকরো টুকরো ঘটনার সমষ্টি মাত্র কারন আমার বয়স সাতবছর পূর্ণ না হতেই আমি মাকে হারিয়েছি কিন্তু আমার এই দীর্ঘজীবনে মায়ের ভূমিকা কী ছিল সেকথা বলতে ইচ্ছা করছে। আমার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রতি আগ্রহ আমি আমার মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছি। শুনেছি আমার মা একটু ব্যতিক্রমী ছিলেন সমসাময়িক অন্য মেয়েদের তুলনায়। আমি দেখেছি মায়ের বঁড়শিতে বড় মাছ ধরা আর দেখেছি কিছু টেকনিকাল কাজ কর্ম। মনে আছে একদিন খেতে বসে থালায় একটা বড় মাছের পিস দেখে মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,' এটা কী মাছ?' মা বলল,' পুঁটিমাছ'। বড় হয়ে বুঝে ছিলাম শরীকি ঝামেলা এড়াতে মা মিথ্যা বলে ছিলেন।

আমি আগেই বলেছি আমার দাদুর বাড়ি ছিল আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে সাতমাইল দূরে সদর শহর ভোলা শহরে। দাদু ভোলা হাইস্কুলের এর শিক্ষক ছিলেন এবং অবসর সময়ে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করতেন। তিনি ঠিক করলেন একটা হোমিওপ্যাথি নার্সিংহোম করবেন। ওই সময় গোটা সদরে দু একটা সরকারী অফিস ছাড়া কোনো পাকা বাড়ি ছিলো না। দাদু একটা ইটভাটা বানিয়ে ইট তৈরি করলেন দোতলা নার্সিংহোম বানানোর জন্য। কিন্তু নার্সিংহোম খোলার আগেই দাদু চলে গেলেন। পরে আমার মামা কলকাতা হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে ওই বিল্ডিং-এ প্র্যাক্টিস শুরু করেন এবং পরবর্তীতে মামার বাড়িতে থেকে পড়ার সময় অবসর সময়ে মামার কম্পাউন্ডার হয়ে কাজ করেছি। লেগে থাকলে হয়তো একদিন প্র্যাক্টিস শুরু করতে পারতাম। যাক মায়ের কথায় ফিরে আসি। দাদুর বাড়ি থেকে গরুর গাড়ি তে ফিরে আসার সময় মা ইট, বালি, সিমেন্ট এবং নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে বাড়িতে অনেক কিছু বানাতেন যেমন ঠাকুরের বেদি, ঘরের মাটির দাওয়ার সঙ্গে ইটের সিঁড়ি এই ধরনের আরো কতো কী। মাঝে মাঝে মনে হয় মাকে বি ই কলেজে ভর্তি করে দিলে নিশ্চয়ই সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরিয়ে আসতেন। মায়ের এই সব কান্ড কারখানা খুব ভালোবাসতাম এবং নিজেকে মায়ের হেল্পার মনে করে খুব গর্ব অনুভব

করতাম। আমার এত কথার একটাই উদ্দেশ্য মায়ের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কী পেয়েছি সেকথা সবাইকে জানানো।

আমার বাল্যকালের কয়েকটা অভিজ্ঞতা খুবই দুঃখের। এরকম অভিজ্ঞতা কারোও জীবনে যেন না হয়। স্কুলজীবনের প্রথম পরীক্ষা পাশ করে ক্লাস টুতে উঠে গেলাম। নতুন বই খাতা কেনা হলো এবং খুব আনন্দের সঙ্গে স্কুল যাওয়া,বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধূলা, একটু আধটু ঝগড়া, মারামারি সব মিলিয়ে দিন গুলো বেশ রোমাঞ্চকর মনে হতে লাগলো।এমনি করে ক্লাস সিক্স শেষ করলাম গ্রামের ছোট ইংরেজি স্কুল থেকে ১৯৪৪-এর ডিসেম্বরে। এবার সদর শহর ভোলাতে গিয়ে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হতে হবে।হঠাৎ একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। আমার চেয়ে চার বছর ছোট আমার বোনের সঙ্গে একটা সামান্য কারণে একটু ঝগড়া হল। বাবা হঠাৎ এসে আমাকে খুব বকতে শুরু করলেন।আমি রান্না ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম বলে বাবা আমাকে পিটতে পারেন নি। তার ওপর আমিও দু চার কথা বলেছি যাতে তাঁর রাগ আরো বেড়ে গেল।তিনি বললেন "তুই খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিস তোকে আর পড়াব না "। ডিসেম্বর শেষ হতে যাচ্ছে, বাবা তার কথায় অনড়। আমি আমার ভবিষ্যৎ ভেবে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। বছর শেষ হবার দু চার দিন আগে এক দিন সকালে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাত মাইল রাস্তা হেটে ভোলা গভর্মেন্ট হাইস্কুলের হেড মাস্টারমহাশয়ের ঘরে পৌঁছে গেলাম।তিনি জিজ্ঞেস করলেন কী চাই। আমি বললাম ক্লাস সেভেনে ভর্তি হতে চাই ।তিনি বললেন এ বছর হবে না, পরের বছর এসো। এ বছরের অ্যাডমিশন হয়ে গেছে এবং দু এক দিনের মধ্যে ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। শুনে আমার মাথায় বজ্রাঘাত। অনেক কষ্টে কান্না আটকে রেখেছি।আমার অবস্থা দেখে তার দয়া হল।তিনি হাত বাড়িয়ে আমার ক্লাস সিক্সের রেসাল্টটা নিলেন এবং হাসি মুখে বললেন, 'আজ পরীক্ষা দিতে হবে, পারবি?'আমি বললাম, 'হ্যাঁ,পারব'। তিনি একজন টিচারের এর সঙ্গে একটা খালি ক্লাসরুমে পাঠিয়ে দিলেন। পরে হাতে লিখে একটা প্রশ্ন পত্র, পিন করে কয়েক শিট কাগজ ও একটা পেন্সিল পাঠিয়ে দিলেন। আমি খুশি মনে পরীক্ষা দিলাম। হেড মাস্টারমহাশয় বললেন পরেরদিন টাকা নিয়ে এসে ভর্তি হয়ে যেতে। টাকা কোথায় পাবো ভাবতেই মামার কথা মনে পড়ে গেল। মামার বাড়ি অর্থাৎ দাদুর বাড়ি ওখান থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে। গিয়ে মামাকে সব বললাম। মামা টাকা দিলেন এবং পরের দিনই ভর্তি হয়ে গেলাম। কয়েকটি দিন শহরে এক মাসির বাড়ি থেকে মামার বাড়ি চলে গেলাম এবং সেখানে চার বছর থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে স্কুলের পড়া শেষ করলাম।স্কুলে ভর্তি হওয়ার দিন কয়েক পরে বাবা এসে বই পত্র কিনে দিলেন আর যা যা দরকার সব ব্যবস্থাই করলেন। বাবার রাগ পড়ে গিয়েছিল এবং হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন এই ছেলেকে কিছুতেই আটকে রাখা যাবে না। সেই থেকেই আমার একক জয়যাত্রা। অবশ্য অর্থের জন্য বাবার ওপর নির্ভরশীল ছিলাম।

আমার ছোটো বেলার যে সমস্ত ঘটনা এখনও মন কে মাঝে মাঝে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়ে যায় তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল বাংলা ১৩৫০ (ইং ১৯৪৩) এর মনুষ্যকৃত বাংলার দুর্ভিক্ষ যাতে ৫০লক্ষ মানুষের জীবনহানি হয়েছিল। আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। দেখেছি একটু ফ্যান এর জন্য কিই হাহাকার! ওই গ্রামে না ছিল খবরের কাগজ, না ছিল বিদ্যুৎ, না ছিল রেডিও। কাজেই এর ব্যপকতা সম্বন্ধে লোকের মনে স্পষ্ট কোনো ধারণাই ছিল না। পরে বড় হয়ে জানতে পারলাম ৫০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল এই দুর্ভিক্ষে অথচ একটাও

চালের দোকান বা খাবারের দোকান লুট হয় নি। আজকের দিনে এটা সম্ভব বলে ভাবা যায়?

এবার আসি একটি নিষ্পাপ শিশুর কথায় যার ভালোবাসা, যুক্তি আর চিন্তাধারা আমি গত ২০ বছরের ওপর উপভোগ করে যাচ্ছি ।এটা ২০০১ বা ২০০২ এর ঘটনা। আমার নাতনির বয়স তখন আড়াই-তিন। একদিন সন্ধ্যার একটু আগে আমি আমার বাড়ির গেটের পাশেই পায়চারি করেছিলাম। নাতনি বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে আমাকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে বললো,'এক্ষুনি ফিরে এসো নয়তো ভীম রুল কামড়ে দেবে'। গেটের পাশেই একটা আম গাছ এবং তাতে একটা বড় ভীমরুলের চাক ছিল। আমি সেই দিকে তাকিয়ে কোনো ভীমরুল দেখতে পেলাম না।হয়তো তারা দিবানিদ্রায় মগ্ন ছিল। আমার শুভাকাঙ্ক্ষিনী ততক্ষনে নেমে এসে আমাকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য টানা টানি করছে। ওকে বললাম,' তুমি কেন এসেছ তোমার ভয় নেই?'। ওর জবাব— 'আমাকে কেন কামড় দেবে? আমি তো মেয়ে, ঢিল তো ছেলেরা মেরে ছিল'।রহস্যটা এতক্ষণে পরিস্কার হলো । দুপুরে কিচ্ছু দুষ্টু ছেলে স্কুল থেকে ফেরার পথে ঢিল মেরে ভীমরুল দের উত্তেজিত করে দিয়ে গেছে। দিদিভাই সেটা দেখেছে এবং নিশ্চিন্ত ছিলো যে ছেলেদের অপকর্মের শাস্তি ভীমরুলরা কোনো মেয়েকে দেবে না, সেটা অবিচার হবে। এই অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে আমি কোনো কথা খুঁজে পেলাম না তাই মেনে নিতে হলো এবং দিদিভাইয়ের সঙ্গে ঘরে ফিরে এলাম ভীমরুলের এর ভয়ে কারণ আমিওতো ওই দুষ্টু ছেলেদের দলেরই ছিলাম এবং বোধহয় ওদের থেকে বেশি দুষ্টু ছিলাম এক কালে।

My Years at B. E. College as a Teacher

Arun Deb,1957, Civil

It was June 1958, after my graduation in Civil Engineering in 1957, I was working as a Trainee Engineer at a construction site to build West Bengal Thermal Power Station at Durgapur, and at that time I received a letter from our Professor A. C. Roy, the Principal, B. E. College. The letter mentioned about my good academic records in the college and offered me to join B. E. College as a faculty and gave an indication that within one or two years, I will be sent to USA for higher studies. Immediately, I decided to accept the offer, and not to continue my present work after the completion of my training period at the end of June 1958.

The following week, I came to see Principal A.C. Roy at B.E. College. After some initial conversations, he phoned Professor Naresh C. Bose, the Head of the Civil Engineering Department, requesting him to come to Principal's office. Principal Roy told Professor Bose pointing to me as a new faculty at the Civil Engineering. This started my career as a teacher at B.E. College Civil Engineering Department. Professor Bose gave me the teaching load that was initially allocated as Teacher X. At that time Principal Roy recruited some excellent engineers and teachers such as Professors Bimal Sen in Applied Mechanics, Bimal Bose in Electrical Engineering, Parthasarathy Banerjee, Sunil Nandy, Sunil Roy, Jiten Kar and Chiranjib Sarkar, all in Civil Engineering, Debajyoti Aichbhaumik in Architecture, and others.

My days as a teacher at B.E. College started in July 1958. One year back those who were my teachers and now became my colleagues. Initially, I had a barrier, but with the help of my senior teachers, I gradually became very cordial with all the senior teachers.

At that time, B.E. College was passing through a transition with only very few faculty members had a PhD degree. But most of the faculty members realized that a Ph.D. degree is essential for each faculty to uplift our Alma Mater to a modern engineering college. Our academic atmosphere at the College was very bright. Most of the faculty members were eager to pursue higher studies and conduct research. This academic

atmosphere was created by the College with collaborations of some American Professors, who joined the College as a part of the Teachers Exchange program funded by Technical Cooperation Mission (TCM) of the United States Government. Most probably, B. E. College is the only engineering institution selected for this program in India to develop excellence in engineering education in collaboration with the University of Wisconsin, USA. Among them were Professor Pickett in Structural Engineering, Professor Villemonte in Hydraulics and Professor Benedict in Electrical Engineering. They were very instrumental in enhancing laboratories and developing postgraduate education in B.E. College. Professor Villemonte developed a modern hydraulics laboratory. Professor Pickette taught us numerical computing and FORTRAN Language for computer programming. This helped us not only in our Ph.D. research computation and analysis, but also in our future research. Under this program, many faculties from B. E. College went primarily to the University of Wisconsin to pursue postgraduate education in engineering. Principal A. C. Roy kept his word, and in February 1960, me along with Arun Roy from Electrical Engineering and Professor Santijiban Mukherjee from Mechanical Engineering were sent to the University of Wisconsin and Parthasarathy Banerjee from Civil Engineering was sent to University of Illinois. I was assigned to specialize in Water and Sanitary Engineering and Parthasarathy Banerjee was assigned to specialize in Soil Mechanics. My life at the University of Wisconsin was very hard but enjoyable. We arrived at the University of Wisconsin in the month of February and found the beautiful campus of the university was covered with snow. In one-year Parthasarathy Banerjee and I completed a master's degree and came back to B. E. College with new vigor and energy. Prior to that, Professor Bimal Sen and Professor Chiranjib Sarkar completed their master's program and returned to college. On returning back from USA, each of us had responsibility to develop postgraduate curriculum and laboratories. I started to develop a new environmental engineering laboratory and new courses and curriculum in environmental engineering including master's program. Parthasarathy Banerjee also developed a geotechnical laboratory and post graduate courses. Later, after returning from the USA, Professors Sunil Roy and Professor Sunil Nandi developed graduate curriculums in highway and traffic engineering and enhanced the Structural engineering respectively. The TCM program by then changed the academic atmosphere of B. E. College with all the young, dedicated, and energetic teachers returning from the USA. In India at that time, B. E. College was one of the topmost engineering

colleges. Government of India started to develop new engineering colleges. Due to lack of engineering teachers, Government of India, started a project "Engineering Teachers Training Program". B. E. College being a pioneer engineering college was selected to conduct Teachers Training Program. Many would-be teachers joined this program from all over the country at B.E. College and completed their master's degree and Teachers Training Program. This program then produced many excellent engineering teachers in the country. During this period, B.E. College produced many brilliant teachers and scholars such as Professors Sukomal Talapatra, Santimoy Chakraborty, Suman Dasgupta, Dipak Sengupta, Kalidas Banerjee, Prodyot Kumar Basu, Amitabha Ghosh, Gautam DasGupta, Amal Kumar Datta, Sushital Roy, Chitta Mahato, Dipten Dasgupta, Prodip Roy and many others. American professors helped tremendously in developing this program. At that time, India started improving and expanding technical education with more engineering colleges. In 1960s, Durgapur Reginal Engineering College (was known as R.E. College, and now NIT), and Jalpaiguri Engineering College started from scratch with the help of the B. E. College faculties. In this vigorous academic environment, most of the young faculties started research on their own to complete PhD degrees. At that time almost all the faculty used to live on the campus, as a result working for research at night was common. In early 1960's Professor Kalyan Banerjee of Civil Engineering department became the first PhD in Civil Engineering of Calcutta University and probably the first engineering Ph.D. among all Indian Universities. After that Professor Amitabha Bhattacharya and Professor Dhruba Nath Roy, both from Mechanical Engineering, Professor Bimal Bose from Electrical Engineering, Professor Bimal Sen from Applied Mechanics completed their Ph.Ds. and after 7 years of struggle, I completed my PhD in Civil/Environmental Engineering in 1968 and Professor Chiranjib Sarkar also completed at the same time as me. At that time there was no research fundings, and no research scholars were available. With the help of a small workshop staff, we had to build our experimental setups. There were no computers and no internet available at that time. One thing I should mention here that with the assistance of the American professors at B. E. College, the first computer an IBM 1620 machine was scheduled to come at the B. E. College from USA in early 1960s. However, the Government of West Bengal did not agree to spend Rupees 1 Lakh per year for its maintenance. The computer then went to IIT Kanpur. That was a great setback for B. E. College in engineering teaching and research. Our researchers had no choice but to go to IIT Kanpur and stay weeks to

complete computations for their research work. Overall, the decade of the 1960s was the Golden Period of B. E. College.

In 1965, Principal A.C. Roy appointed me the Superintendent of the Pandya Hall. At that time Pandya Hall was a Post Graduate Hostel. Very famous alumni such as Professor Amitabha Ghosh, Professor Gautam Dasgupta, Professor Sukomal Talapatra, Professor Dipak Sengupta among others were at the Pandya Hall.

The relationship of teachers with students was also changed and became very cordial with the infusion of many young teachers. We used to mix with the students very openly in all sport and other activities. Homes of faculty members were open to students after college hours. Students often invited teachers to their hostel feasts. I used to play Table Tennis with the students at their hostels. In later years, many of our students became very renowned engineers and teachers in their respective fields. We feel very proud of them.

Social life for teachers on the campus was beautiful. We used to visit each other's home often. We had an excellent Teachers' club and a Professors' Club. We used to play tennis and badminton in the evenings. I was very active in these clubs and served as a secretary for several years. We also had Campus Durga Puja each year. I was also involved and was secretary of the Campus Durga Puja Committee. During the Durga Puja days everybody on the campus used to have lunch sitting together side by side irrespective of status and ranks.

We were lucky to have excellent teachers. We owe a lot to our teachers. I would like to express my regards and pranams to all my teachers. All my teachers (Professors Santosh Kumar Mukherjee, Asim Kumar Mukherjee, Kalyan Kumar Banerjee, Bimal Sen, Paresh Nath Chatterjee, Anil Kumar Chowdhury, Amitabha Ghosh Dastidar, Khaunish Chandra Roy, Sankar Kumar Sen, Durga Banerjee, Kamada Kanta Majumdar, Probodh Kumar Chatterjee, S. C. Chakraborty, Abani Kumar De, Nemai Neogi, G. C. Basak) are no longer in this world. Very recently, our dear Professor Chiranjib Kumar Sarkar also passed away. He lived at Kolkata, at the same place as I live when I come to Kolkata.

The contributions of Principal A.C. Roy were enormous in developing B. E. College to a new high standard. He was a visionary, an excellent teacher, a good administrator and overall, he was an excellent human being. During his time at the B.E. College, he helped many people. In fact, Principal Roy was the architect in helping me in finding a path in my career. I am indebted to him.

Since I left the College in 1971, I have always kept in contact with the B. E. College faculty and administration. I feel very proud that with my initiative, Late Professor Amal Datta and now Professor Anirban Gupta of the Civil Engineering Department in conjunction with Professor Arup Sengupta of Lehigh University of USA, and Water for People of USA, developed a world-renowned Arsenic Remediation from water System for villages of West Bengal. This project is still helping more than 250,000 villagers to receive arsenic free water. The project has become a model of sustainable projects and received many national and international awards. This project brought our Alma Mater to the fore front of social giving back. I feel very proud that I could involve myself in developing the first Local area Network (LAN), Alumni Seminar Hall, the Swimming Pool and improvement of the Gymnasium for my Alma Mater.

I spent 18 years at the B. E. College Campus both as a student and as a teacher. These 18 years of my formative student and professional career significantly helped me in my future career abroad in the UK and the USA. This period of life is most precious to me.

I owe a lot to my Alma Mater, B.E. College.

Memories of BE College

Debabrata Bhattacharjee, *1959, Mechanical*

My first home at BE College was at the Slater Hall. Slater Hall had eight seater rooms on two floors. There was no bathroom per se except some taps and shower heads at the back of the building against the wall. Toilet was a detached building, so also was the kitchen. There was a smaller building next to the main building was called Baby Slater but it was not occupied with any regular students. After few months of time a

Boarders of Sengupta Hall

group of students from IIT Kharagpur came to stay there. They were Naval Architecture students of IIT and had some practical training at the Garden Reach Workshops across the river. I don't know why but there was always some clash with the IIT students but it never reached any serious levels. Our first year batch was about one hundred and fifty students including all branches and eighty percent of the students were either from Presidency or St. Xavier,s college. I was from Presidency so there were a lot

of known faces in the hostel and we never felt lonely of homesick. My home was at Santiniketan where I did my high school. Our principal was R.G.P.S. Fairbairn who was a very soft spoken gentleman who used to teach us Lectures on profession. After about a year he left and Prof. A.C. Roy from Applied Mechanics department became principal. He was a very tough looking person and sometimes used to stand in front of the main building to see if we are coming to the classes in time. Our turion was Rs. 22 per month and mess fee was Rs 35/- per month. Because I did well in my entrance exam I was awarded a need based maintenance scholarship of Rs/- 75 per month for ten months of the year which pretty much covered my expenses.

Every year of the four years of mechanical engineering course, first three months were compulsory workshop. After first period we had to attend various workshops which included Machine shop, Carpentry and smithy. Machine shop supervisor was Karmakar, we used to call him "Kamar". He was very strict and always looked very serious. He used to wear a short sleeve white shirt and a khaki half pant. Carpentry shop supervisor was P.C. Mukherjee but better known as "Gu babu" because he was part time supervisor of the sweage plant at the college. Gu babu retired very soon after we came and a younger foreman took over but I cannot remember his name. Smithy and Welding shop supervisor was Mr. Bhanja. He was a very friendly person and we like him a lot. One of the tasks at smithy shop was to use the sledge hammer which was very heavy and we had a tough time with that hammer. In third or fourth year we had foundry shop and the supervisor was Mr. Thomas Vail. He was an anglo-indian and used to scratch his ball all the time. First couple of weeks at Karmakar,s workshop was tough. Our project wea to chip down a cast iron cube to a certain size, first with a hammer and chisel and then by filing. The right wrist was in pain at night. Eventually we got used to it. The morning session ended at 11:00 am and we returned to the hostel for lunch. After a little rest classes resumed at 1:00 pm until four. In first year we had standard college science courses like physics, chemistry and also humanities like economics and English. Mr, P.N. Mukherjee known as datoo was our super at Slater as well as he was a teacher of humanities department. Food at the mess was not bad, we had fish everyday for lunch and mutton everyday at night for dinner. Our head cook was Kanai and barrack servant was Bhaskar. Bhasker used to serve tea in the morning and snacks in the afternoon with singara, kachori etc. We used to have one improved diet and one grand feast once a month. The grand feast was really grand with all kinds of fisf and meat with polao and ending with pan from college street

market. Some of our first year teachers were Kamada Babu and PN Chatterjee (Ghora) for physics, Niyogi (Legu) and Panchu (P.Das) for chemistry. I think Baroda Babu (Chatterjee) was head of the department of chemistry and Infamous G.C. Basak was another professor in chemistry dept.

We used to play volley ball behind the hostel building in the afternoon. We made a lot of new friends and we had long addas. Because of the workshop the pressure of studies was not that high. I also joined the NCC program, the EME branch. During the puja holidays we went to Agra for the NCC camp. That was a very memorable trip. On the fourth day night we had the ragging. We were awoken by a whole bunch of seniors asking us to strip down so that they can do some medical examination. However things were very controlled and we immediately understood what was happening and did not make any noise. First year hostel life was first time living outside of your own home for a lot of students. First few months many students went home during the weekend but many also stayed because they were from out of Kolkata area like me. Gradually we got used to the hostel and college life and made many new friends among ourselves.

Second year we came back to college and found our new home – this time for me was Richardson Hall. Here we were staying along with third and fourth year students and came to know a lot of seniors who were our "dadas". In the second year we also had the workshop and the same science and humanities courses like first year. We welcomed the new first year batch with mild ragging but had a wonderful welcome meeting at the Institute Hall. The memorable event of our second year was the centenary celebration of our college. This was a once in a lifetime event and we participated in building models, collecting subscription for the centenary souvenir and volunteering in many cultural functions. There was a huge exhibition of student built models and we had the opportunity of explaining various models like solar power plant to Pundit Nehru who was the chief guest at the centenary celebrations.

Prof. Bhupal Dutta was the official-in-charge of the celebrations and coordinated all the different activities. The musical programs were a grand success with one classical function lasting the entire night. It was attended by as far as I remember Bade Golum Ali Khan, Bismillah Khan, Alla Rakha and Bhimsen Joshi. There was a visiting dance party from Check Republic who also performed at the cultural program. There was a centenary dinner arranged by the college authorities for guests and VIPs but the students had to pay Rs/ eight per person. This was out of reach for many of

us. One of our senior dadas (I think his name was Bhupenda) said about the dinner " aat taka toe nichhe , botol fotol cholbe?" One very interesting incident happened during the centenary meeting which was attended by Prime Minister Nehru and many other dignitaries. As Nehru ji stood up to speak, he looked around and said " Koi edhar ladki nei dekhte hai". As soon as he said that the whole crowd became silent and after the meeting we heard that decision has been made to admit women in the college from next year. Most of the weekends were spent going to a movie at Aloka or Mayapuri, the two halls were in Shibpur. Some students went to Kolkata to see movies at Lighthouse or Metro and then have dinner at Aminia.

Third year I was allotted to Sengupta hall which just opened that year and we were the first batch. Also that year Slater Hall closed and all the staff from Slater Hall came to Sengupta Hall. Dattoo was the super. A had picture of all the residents of Sengupta Hall during the 1957-58 year which I will share with you. Third year is when you start classes in your department and we got introduced to Dr. Durga Banerjee, Santi Jibon etc. This year the monthly exam system was introduced and it became a nightmare for most of the students. The idea was that instead of only studying during the final exam time, you will be graded every month so that you are forced to study on a regular basis. The process became became so un popular that the college authorities abandoned it after about six months. Two lady students were admitted that year and when they came to Karmakar,s workshop in a saree, Karmakar sent them back home and told them to wear pants and come back. There were no ladies hostel at that time at the college, so the two female students were accommodated at the gymnasium. Also in that year BE college decided to increase the number new admissions to four hundred instead of one hundred and fifty. We were assigned by the welding shop under Bhanja to make tables for admission exams. This was a challenge because the legs of the tables were fabricated from one piece of steel pipe bent in different ways. It was almost impossible to make those bends right to make table stand stable. Anyway we made quite a few and felt good that we contributed to something good. We had two tragic incidents during our third year. One was two third year students went to the river Ganges to see the tide and were washed away. One survived but the other one was never found. After that incident going to the riverside was prohibited and recently I noticed that there is a big wall built on the eastside by foreshore road soi that the river is out of bounds. The other one was first year architecture student drowned in the lake in front of Slater Hall. What we heard was that after submitting his project the

student with one of his mates took a dive in the pond and was drowned. His body was recovered around ten pm when the entire college population were watching along the shores of the Slater Hall Pond. This was a very tragic Incident that we witnessed.

Finally we became fourth year or final year students and my new home was Wolfenden hall. I had a room on the first floor at the far end of the wing by Heaton Hall. One evening while I was studying I suddenly noticed a very pretty woman standing on the ground floor flat in Heaton Hall by the window. I was curious to know who she was and eventually came to know that she was the newly married wife of Dr. Seal of Metallurgy department. As soon as the word went around, there was a crowd in my room every evening to have a glimpse of Mrs. Seal. This is also the time when we first had our beer at Jagannath Babu,s hotel near Shalimar station. Fourth year was a bit tough with all the mechanical engineering subjects and having Durga Banerjee as the professor. Though he was generally a good man I never got along with him and always apprehended he is going to fail me. Anyway I passed in the first attempt and got out of college with the coveted BE degree.

There are so many memories of those four years – it is not possible to put everything down on paper. There were quiet a few things we learned while in BE college. One of the most important thing was that we all were equal. We never felt the existence of any sign that one is wealthier than the other. We all ate the same food in same mess hall and on the same utensils. We never discussed what our fathers did. When we came out of college we all became ex-students and used to call the seniors as dada. We entered the college as young adults and came out as adults.

Note from Pinaki Chakrabarti,*1961,Civil*

As mailed to Biswajit Sengupta,*1981, Electrical*

Dear Biswajit:

Pleased to get your mail.

I wonder if you personally know me or not.

You lived in NJ, someone may have talked to you about me.

Because we lived there and in NY/NJ for many years.

After graduation from BECollege, in 1961, I worked for BTM (Calcutta) as a trainee.

I mostly worked for Shalimar Tar (Calcutta). I handled the projects like a cooling tower for

AOC Naharkatia, Assam and the first turbine building in Namrup, Expansion of RupnarayanPur Cable factory

(mostly prestressed and post tensioned structures) and

finally in Ranchi Heavy Engineering for a massive project of 50 8 to12 unit multi story residential buildings.*

I came to the USA in 1964.

Lived in many places. (Did my MS in Minnesota and PhD in NJ). I lived in

Minneapolis, Minn/ Pittsburg, PA/ Queens (several places) NY / New brunswick (PIscataway, NJ) ETC.

BE College alumni association / 1st annual picnic happened in NJ (New Brunswick) -- 1970.

Came to California in 1978 -- BE College alumni association started in 1979.

I have published a Bengali book (ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কলকাতা).

One of the essays is on our life (various items) in BE College / also afterwards.

It was published in BE College magazine.

I went to India many times, for conferences and invited lectures.

I always went to BEC and gave technical lectures suitable for the students and the faculty.

On many occasions, Dr. Brotish Sengupta, 58 Civil, (then Chairman Jadavpur

Civil), invited me to lecture on different topics.

Dr. Bimal Sen liked me a lot. We had a lot of good times. I have a lot of contacts with senior BEC alumni in India.

We have a 57-61 club (entered in '57, graduated in 1961). We generally meet through Google. Once a month.

We have an alumni association in So. Cal since 1979 / picnic / Christmas Party / etc our regular events.

I can always send you my experiences and memories (it is a lot / tell me how much you want).

I worked for 22 years (about 2/5 of my professional life) in consulting companies [Peter F Loftus Corpn. Pittsburg (Senior Engineer),

T. Y. Lin Asso, NY (Chief Engineer), Burns & Roe NJ (Senior Engineer), A.C.Martin LA (Principle Engineer),

Ralf M. Persons Passadena (Principle Engineer), Benito Sinclaire Asso (Chief Engineer)].

In the 2nd part of my profession -- I changed it to teaching and research for 33 years (about 3/5 of my professional life)

Taught several structural engineering courses, received several engineering grants, developed the structural engineering lab, published over sixty structural engineering papers, now retired.

I was heavily involved with the local Bengali Clubs/community and all India Associations. Long story.

Please write to me if you want me to do anything. It is always a pleasure to do something for BEC.

Best wishes.
Pinaki R. Chakrabarti.
5-29-2024

Memories of College Days

Arun Banerjee, *1962, Mechanical*

Coming from a family with poor means, I studied with a merit-plus-means "Maintenance Scholarship", which was given to 25 students in a class of 400; the condition of the scholarship award was that it would be struck off, if the student failed in one subject in any one of the final exams, for the remaining years to graduation in the four-year program. The forewarning was a blessing in disguise. I was not a particularly bright student, but I worked hard. One thing that is seared in my memory is studying all through the nights in my second year, which was a particularly tough year with many subjects to cover. I worked out problems from the "GST" sheets, sleeping only a few hours after I came back from the afternoon session of the classes. I remember, I was one of 8 among 80 students residing in Hostel #8, who passed in all subjects, and I was hailed as a "hero". I studied mechanical engineering. One of my two best teachers in life, was Prof. Rajat Chakraborty, (who had a PhD from U. Wisconsin) who taught us Strength of Materials; standing before the black-board, with a chalk in hand, he seemed to me as a real hero, a portrait of confidence and clarity. Later, when I was a Lecturer at IIT/Kharagpur, and taught Strength of Materials, I followed his way of teaching. I graduated from BE College in 1962 at the age of 20, and one of my former IIT "students" who lives in the San Francisco Bay Area asked me one day, "Arun-da, you were so young, how did you teach so well ? I replied, "All the credit goes to BE College !". In my fourth year, Prof. Amitabha Bhattacharya, taught us, Engine Dynamics and Vibrations. Prof. Bhattacharya was a man of great rage, and he would throw out on the floor students' homework solutions if those were wrong. Again, his teaching helped me: I taught this same subject to the final year students of ME at IIT/KGP, and my former students say I was a very good teacher. Again, all the credit goes to BE College !

Later in life, I finished two PhD's, and won recognition for my research, all done in the US aerospace industry. I was the key-note speaker at a European Space Agency conference, presented papers at two International Conferences of Theoretical and

Applied Mechanics, and taught short courses from my book, (see cover on top) upon invitation from ISRO, IIT/Delhi, and the Beijing Institute of Technology, and most recently from IIEST. I retired from the Lockheed Research Lab at Palo Alto, CA, as a Principal Research Scientist. For the free studentship and the sound education I received, I donated one crore rupees, as a token of gratitude to my alma mater, BE College.

The Hunger Strike

Jayanta Mazumdar,*1963,Metallurgy*

1962. First-ever Hunger Strike and Lockout in a century in a residential engineering college. Yes, I am talking about our beloved B. E. College. Like a few other batchmates, I too was a close witness to this tragic drama. And in hindsight, now I believe that the campus chaos was avoidable, only if some restraints were shown by a small group of vengeful batchmates, and also if a firm stand was taken by the 3rd year Metallurgy students against their four class mates who became alcoholic, under the influence of a cunning dada, a repeater from the 3rd year Mining class.

This Dada managed to identify four vulnerable Metallurgy students. In the evening, he would lead them to a shady pub and offer them free drinks. The four would drink like fish and within a month they became alcohol dependents. Dada was waiting for this to happen, and he informs them that he himself was in financial difficulties and would stop going to the pub with them, unless they can pay for his alcohol bills too. So, our four classmates now must raise enough funds, by beg-borrow-stealing methods to buy drinks for themselves and for their former senior cum mentor.

Let me get back to the story. It was well past midnight. Four 3rd year Metallurgy students, sleeping in their separate rooms in hostel 9, face sudden raids by violent folks whom they could not identify (the raiders had quickly slipped-down a gunny bag over each victim's head). They beat them up black and blue, accusing them of stealing money and text books from other boarders to fund their alcohol thirst. All four victims' heads were shaved and then the attackers leave triumphantly. Their midnight shouts in the quiet campus, even woke-up a few Professors sleeping peacefully in their bungalows.

But our college authorities had an amazing intelligence network. Before the news of the night raids could even reach all 3rd year students living in different hostels, the HOD Metallurgy had on his table a complete list of the night marauders: Twelve batch mates of the beaten-up boys, none of them boarders of the hostel 9, and as many as ten of them from the department of Civil Engineering. A Dirty Dozen, the

HOD mutters to himself.

The gang-leader too was identified by the authorities. A repeater bully known for his pranks on the campus, and yet liked by many. This guy decides that he must come forward and save the thirty odd 3rd year Met students silently tolerating thefts by their four alcoholic classmates.

This popular "Taliban", studying Civil Engineering, had a secret agenda too: to embarrass the Met HoD in public, whom he hated. The HoD was also the Professor in charge of Examination for the whole college, and thus had enough power beyond his Metallurgy department.

Our civil guy did believe that he had to lose a year not because of his poor performance in the previous year; that there were so many others poor performers too. But the Professor-in-charge of Examination was soft to his own boys studying Metallurgy, while being ruthless to the poor performers in other streams; that his main target was the students in the Civil Engineering stream. They were his "Bolir pNatha" i.e. sacrificial goats. They must spend another year in the same class, but now with all new faces —boys one year junior to them.

At 1.00 pm, when our post lunch classes would begin, we find a terse notice, signed by the principal himself, pasted on the college Notice Board: that the following students are expelled from the College for grave misconducts and criminal acts, that they must vacate their hostel rooms and leave the campus by 4 pm, that else they will be physically thrown out of the campus along with their belongings.

There is a spontaneous reaction of disbelief and anger among all students specially in the 3rd year batch of 350+ students.

They all boycott the afternoon classes and the Union Secretary, another 3rd year Mech student and a very popular figure, gives a call for an indefinite hunger strike. So, at a lightning-speed, a college that smoothly ran for 106 years, turns into a battlefield in the course of a few hours.

I would not go on narrating the battle that lasted 50 days, as my main purpose of recording this episode is to highlight how one's wisdom can help one to foresee the future, referring to our formidable Principal, AC Roy. Our hunger-strike lasted only 2 days; the authorities had summoned a large contingent of West Bengal police into the campus, giving them the task to arrest the likely cheats among the striking students found taking food surreptitiously. That did not break the students' morale and so the College was declared closed on the third day, exactly 3 weeks before our Puja

vacation to commence, and all students were asked to leave the campus.

I went to Banaras to my parents and in a couple of weeks served with a registered letter from the authorities that I should submit in writing my charges, if any, against the four metallurgy students in the dock. The letter also informs that the College would re-open one week earlier than the scheduled date and the expelled-dozen should also join classes, pending the enquiry on their alleged night violence.

As soon as the college re-opened, the authorities summoned a meeting with the students; to be attended by the Secretary of our Students Union along with those students who were claiming that they knew in advance about the barbaric night raids.

I was one of the few chosen by the union Secretary to join the meeting. I knew all four accused well and one of them was my former roommate. Pradip also came to know about the real culprit; the repeater who would take these four boys every evening to a nearby watering hole; a thek for alcoholics. And once they were hooked by alcohol, the mentor would stop paying for their drinks.

His modus operandi was to target boys he considered vulnerable; initially buying them cheap alcohol for consumption in their hostel rooms, with occasional visits to a shady pub. Once they are hooked, Dada would announce he is broke, and demand that his four chelas have to pay for his drinks. Probably he is the culprit to suggest that they raise money by stealing from roommates. Pity that many of us in Met and Mining streams though suspicious of Prakash, failed to act. Prakash was technically senior to us and a cunning guy, better to be left alone.

The meeting between the College authorities was led by Principal AC Roy himself, while the students were led by Pradip. It is still vivid in my memory. Principal AC Roy gracefully invited Pradip to talk first.

Pradip expressed his anguish that the principal did protect the real culprits, the four Met boys, all of them alcoholic and petty thieves, but awarded the extreme punishment of expulsion to those boys who tried to rectify their four batch mates turned alcoholic and petty thieves, by instilling fear in them by thrashing them.

A. C. Roy's response was truly memorable. He explained that the dozen from Civil department were punished, because they took the Law in their own hands. They ought to have come to the college authorities, with information that some boys had become alcoholic and petty thieves under the influence of a rough and tough class fellow, who was technically senior to them being a repeater. The principal clarifies that the dozen was expelled because they took Law in their own hand, instead of

informing the authorities about the problem that was really serious. However, the College has taken them back with expectation that they have got the message and would act responsibly in future.

Sir AC Roy's prediction on the future of the four delinquent Met boys came incredibly true. He conceded that they were guilty; that their alcohol consumption in hostel room and acts of stealing their roommates' cash and books call for the harshest punishment of expulsion from BE College. However, they are young and immature and must be given one more chance to redeem themselves. He adds that his experience tells him, that given another chance at least three out of these four boys will mend themselves and become good engineers and good citizens, and perhaps just one of them would ignore the warning, not check himself and will go down and down in his life. A sad waste of talents.

Pradip did not raise the issue of Prakash, the notorious guru. However, I got an impression that this issue had already been discussed in a smaller group.

What really happened in next 30 /35 years:

*The dada Prakash declared a CNR. That's he had to leave the college as unsuccessful in exams despite being allowed repeated attempts and not deserving any more chance.

*Premangshu, one of the Met boys who ignored his chance given by the authority with a caution. He barely managed to get passmarks in his B. E. part 2 and had an inglorious career. He joined a large government factory as an assistant foreman where three of his classmates were senior managers then. They gave him protection from likely job-loss due to his frequent absenteeism from duty.

But the other three? They bloomed in their professional lives as was predicted by Principal AC Roy.

*Harishankar: He secured a high first-class in B.E. final, joined armed forces and made his career there; was with Indian Air force and his last posting as an Air Vice Marshal was as the station commander of one of the largest airbases in India. He settled in Kolkata in his retirement.

*Mihir: He is in another story, secured a second class, and yet managed to join University of Birmingham and obtained a Ph.D. He moved to US and joined NASA as a civilian officer based in Alabama. Now retired and before Covid era used to visit Kolkata with his wife every winter and invite his Met friends and their wives to a joyful lunch or dinner together.

*Anjan. He too is in another story secured a high first-class in B. E. final but no rank and went to US for higher-studies. Spent a few years in MIT and eventually secured a D. Sc. in Material Science. Has several patents related to fiber optics. A recluse and avoids BE college buddies with Mihir as an exception,

Late Principal AC Roy in his wisdom, thus gave four culprits in 3rd year Metallurgy a second chance and three of them really bloomed.

I am dedicating this memoir of mine to our late Principal A. C. Roy Sir.

BEC Memoirs

Baidyanath Roy, 1965, Mechanical

I joined BE College (BEC) in 1961 In Mechanical Engineering (ME) after completing Intermediate Science (I.Sc) exam from Scottish Church College, Kolkata. It was the last time that students from the I.Sc program entered BEC. That year 6 of the top 10 I.Sc students joined BEC (most of them in ME), a shining record in BEC's history as we understood then. Many toppers from the Higher Secondary exam also joined BEC the year before, with whom we joined together in Year-2 of the 5-year engineering program. They were however much smaller in numbers. We all graduated in 1965, middle of what in retrospect, may appear to be the last of the glorious decades in BEC's history.

On our first arrival in campus most of us were assigned to hostels E1/E2, converted staff quarters with no cafeteria, so we had to go to Macdonald hall for our meals. Few of us were housed in Downing Hall and a substantial number were put in 22-bed barracks, not an exciting start to the campus life. We had a 2-day orientation cum indoctrination seminar at the Library hall and listened to impressive speeches and words of wisdom and caution from distinguished faculties including Principal A C Roy and the HODs like, Dr. Chakraboty of Math, Dr. Baral of Physics, Prof. Banerjee of ME, Dr. Barada Chatterjee of Chemistry et al.

First few months we lived with in anxiety (of ragging), and adjusting to the life in a new environment and persistent home sickness, with most of Kolkata based students going home every Saturday noon after lunch and returning Sunday evening before dinner. But gradually we started enjoying the taste of freedom in the new campus life; a walk in the Bots, relaxing evening with few at the banks of the Ganga, nightly group visits to movie halls Aloka, Mayapuri etc. A few Romeos amongst us would even spend time near Yogamaya (?) Girls College in Howrah in search of their Juliets.

BTW, most of us living in E1/E2 didn't face any real ragging at all due to a senior dada (a notorious ragger of past years) being stationed there by Principal A C Roy with the strict order to keep the place a 'Zero tolerance' zone for ragging or else he would

be kicked out of college for ever. However, some ragging, like mid-night marches, bare footed and in under-wears, in the Lords, did happen in the barracks.

During this first year we picked up all the buzzwords and slangs ((Funda, Gere(studious), Mal (pretty damsel), Baga & pati-Baga (kids from English medium schools or their Bengali copy cats, these two terms might have been coined by our own batch) etc...)); also,learned nick names of teaching staff (Ghora, Legue, Kath Burman, Bhul Funda, Anarkali, Pagla B, Byom D. etc.) together with their unique talking and walking styles along with the caution not be too loud within hearing distance since they all were aware of these given names. There were also names (some benign others not so) given to the few girl students that were there in campus.

Then off course there were plenty of names assigned to our own classmates mostly by our own extremely creative, multi-talented Ram (Ranabir Ghose), a recipient of the coveted JBNTS award. There were few respectable nick names (like Proff(essor), Mamu etc.), some relatively mild (Buro, Boru, chalku(mro), Chagu (chagal). Mota, Nedo, Guloo, Aloo etc.),and a few ugly ones too (used only behind their backs). On a lighter note, there was one kid-faced guy from Bihar named Rasbehari who was openly told never to pretend as a Calcutta dude otherwise he will be renamed as Rascal instead of Ras-behari. To Ram's credit all these names stuck for life. We still use these when we meet.

In 2nd year we stayed at Hostel-11, a standard main stream hostel housing all of our ME classmates, many other batch-mates as well as seniors. Mess managers amazingly arranged for one feast and one improved diet every month for the Rs 35/ mo that we paid. In the evening after school hours many played volley ball in the nearby court. It used to be hilariously fun-filled equal opportunity game with novices and experts on both sides looking for "khoni" on the opposite sides to throw the ball to, for easy scoring.

In the 3rd year I stayed in Sengupta Hall in a corner room with a skylight but no window, near the stairway, a lonely junior amongst seniors in the floor. Supposedly it was a reward with single occupancy room for superior academic results in the previous year, in reality it was more like a punishment. In the final year it was the Richardson hall with all the classmates to hang around.

Moving along, after graduation all the smarter ones (with connections?) got good job offers in or around Kolkata and quickly settled down in life. Quite a few of us (me included) got interviews for GOI training job (@Rs. 250/mo?) and got offers and

some accepted it. For some reasons the interviewing officer didn't like my demeanor or something and to my surprise (I wasn't a bad student, got first class and placed in the top ten of the class) I never got an offer and that hurt my ego even though I wasn't too keen for the job. Soon after I received an offer from Hindustan Steel(HSL) Design division, Durgapur and joined there. Within 2 years on the job I decided I had to move out and started looking for study opportunities in the US. Eventually got a fellowship offer from SUNY @ Stonybrook, NY and came to the USA. Incidentally I faced major bureaucratic and policy hurdles to get a no-objection certificate from HSL to apply for my passport and visa for US, eventually got it through a loophole, but that's another story.

Finally, before wraping up my story I must acknowledge my immense debt and express my profound gratitude to the great alma mater not just for the engineering degree it conferred on me that allowed me to pursue a satisfying career and a decent livelihood but also for offering me the rare opportunity to meet and develop deep lifelong friendship with so many alumni, juniors and seniors, in India and abroad that enriched my entire academic, professional as well as family/social life. Here are some testaments to that.

My interest and fascination with travel (I have travelled the globe visiting 6 continents and 55+ countries over the years and still have plans for more) has its root in the yearly group journeys [to Darjeeling, Puri etc] we undertook during summer breaks at BEC. The unending days of fun, boundless pleasure, and excitement we experienced during those travels with close college friends left deep lasting memories that still continue to inspire me for more. Another interesting hobby that I picked up from my associations with BEC alumni in Durgapur was for staging and acting in Natoks [dramas]. The Shibpur association in Durgapur under leadership of Basudeb da[55 ME], Arup da [55Met] et al., regularly staged Bangla natoks in the 60s and juniors like me got drawn and hooked into it. We kept that tradition alive with alumni initiatives later in Boston, Pittsburgh, Atlanta, Augusta, Ga, where over the years we staged about a dozen dramas. We still stay in touch with alumni through multiple email and WhatsAp chat groups. We had a big get together in Kolkata on our 25th graduation anniversary and on the 50th we met on campus and established the 65ME award for Excellence in research.

The power and spirit of the BEC global fraternity bond is simply unparalleled, and incredibly durable.

Reminiscence of a B E Collegian

Subrata Mazumder, *1967, Civil*

As I hopped into the cab, a wave of emotions washed over me. Nervousness and excitement mixed, making me feel alive. The seat squeaked as I made myself comfortable, and the familiar smell of the car mingled with the rich aroma of my mother's cooking, lingering from her hug. As the cab drove away, I closed my eyes, letting my senses take over. I am heading to B E College for the first time.

The crisp autumn air brushed against my skin, signaling new beginnings and endless possibilities. The rustling of fallen leaves under my feet echoed as I walked towards the college campus, surrounded by towering trees and historic brick buildings radiating knowledge and wisdom.

The sound of students rushing to their classes filled the corridors, their chatting and laughter like music to my ears. The classrooms were buzzing with debates and discussions, punctuated by laughter that lifted my mood. Amid it all, the aroma of freshly brewed coffee and the mouthwatering smell of spicy samosas and warm bread rolls tempted me towards the college canteen.

Stepping out of the canteen, the vibrant colors of the college gardens greeted me. The sweet fragrance of roses, jasmine, and marigolds hung in the air. The soft petals brushed against my fingertips, and the leaves rustled beneath my feet. The cool breeze carried with it the promise of serenity, a place of solace amid the chaos of college life.

But not everything was sunshine and roses, though. The anxiety and fear that accompanied the early days of ragging still lingered in the air. Seniors subjected freshmen to humiliating tasks and pranks, and the fear of CNR (Can Not Repeat) was always hanging over our heads like a dark cloud, ready to unleash a torrential downpour. We had to perform well in every aspect, from academics to extracurricular activities, or risk being left out without graduation. The pressure was suffocating, and we all felt like we were on the brink of collapse.

Even in the face of adversity, we found ways to laugh and have fun. We snuck over the wall for late-night movie shows at local theaters, a temporary escape from

the chaos and pressure of college life. In those moments of joy and laughter, we found solace, a brief respite from the constant fear and anxiety that had become our companions.

Through it all, we formed friendships that defied all logic and reasoning, bonding over our differences and shared experiences. Some were rich, some were poor, Some were fair, some were sore, Some were smart and bright, Some were slow and trite, Some were smooth with dames, and some were lame with games. But none of that did matter We were linked by ties that never shatter, Friendships that flowed without fetter.

As the final day drew to a close, the setting sun cast a warm glow on the campus, and the sky turned a deep shade of orange and pink. The soft light brushed against my face, and the cool breeze kissed my cheeks. As I look back on those days, I know we have lost some of our friends over the years. But I also know we will meet again someday at another unknown place and continue the journey we started over fifty years ago. Our memories and experiences are forever woven into the fabric of our souls.

Hostel Life in My BE College Days

Debiprasad Palit, *1967, Mechanical*

In my days, the then Bengal Engineering College, popularly known as Shibpur Engineering College, was unique in many ways.

Which other college had the distinction of producing the first Woman Engineer of Bengal-cum-the first Woman Mechanical Engineer of India, or a civil engineer who later became famous by the sobriquet 'Einstein of Structural Engineering', have a half-a-kilometer-long college building whose foundation stone was laid by none other than Dr. Bidhan Chandra Roy who had declined admission for an engineering degree to this very college and then took all the medical degrees under the sun, have two playgrounds with such impressive names as Lords and Oval, have a century-old hostel building called Downing Hall, which provided shelter not only to would-be engineers and the warden's family, but also a ghost?

Add to the list events such as – the Workshop Superintendent locking the main door of the workshop from outside so that 'boys' cannot escape during the 'Workshop period', students staying in different hostels organizing a 'Mass cut' of a particular class by communicating through a simplified form of Semaphore signaling in which just a flag fluttering from the hostel top was enough. It was a time when we did not have even landline phones in the hostels, never mind mobile phones.

To this, one must add unusual phenomena such as – the student leaders contesting in an election for Student Union President without coming under the banner of a political party, that too in a state like West Bengal! Along with this, one must bring up bizarre incidents such as – the students going on a hunger strike for nearly seventy two hours to protest against the beating up of their fellow students by the locals for teasing some girls in their locality!

My batch mates will be able to add to the list. But to make it short, let me declare– the life we spent in the hostels of BEC in those five years was multi-coloured, precious and unforgettable. Let me mention just a few aspects of that bygone hostel life.

The first classes in the morning session and the afternoon session were difficult

to attend for a few sleep-loving mates of ours. But they would bunk these classes consistently with the rock solid assurance that their regular mates would attend these classes, give a proxy attendance during roll call, take lecture-notes and in the evening not only share those notes with their 'sleepy' friends but also give a private lecture outlining the lecture delivered in the missed class; we called it 'Demo'. I don't know whether in these days of intense competition such practices are followed or not.

In the five years we were in BEC, West Bengal was going through a major political upheaval. The Congress party was on its way out and many political parties like Bangla Congress, CPI, CPM, FB, SUC, CPM (ML) etc. were coming in. We followed those political events closely and many of us had our party of choice. But I don't remember any instance in which these political thoughts or party affiliations came in between our camaraderie or kinship.

On the sports field, only those who were better than average played for the cricket or football teams of various years (e.g. the 1st. year, 5th. year team etc.) or for the college team. Hence to fulfill the aspiration of many other students we introduced an informal tournament for football and cricket called the 'Enthu' (short form of Enthusiasm) Cup. It was a bright idea - of the students, by the students, for the students (nee hostellers).

The concept of floor servants was unique to our hostel life. Each floor of each hostel used to be in the care of a person. The greatest care he used to take of the students in his floor was to provide them with breakfast and afternoon tea – served in the room, against payment at the end of the month. While the hostel mess had fixed menus, here we could order (sometimes in advance for special items) items of our choice. Most of us ended up paying more for this than the lunch and dinner in the hostel mess. They would also supply cigarettes (no other more potent intoxicants – to the best of my knowledge) whenever required. Floor servants were integral part of our hostel experience.

We had good teachers, bad teachers and indifferent teachers. We had colourful nicknames for many of them (some of them knew these nicknames and made us know that they knew it) and some of them were source of jokes, even bawdy jokes, among the students. However I never heard of any instance in which the teacher felt disrespected in the class or outside because of some action of ours in the college or in the hostel or outside.

In retrospect, I have one regret about our time at hostel. We had fellow-students

from north-east, north-west, south India etc. But rather than learning something about their languages, foods, arts and culture we totally 'Bengalized' them. As a result, even after college and its hostel life, we remained more or less provincial – more comfortable in our own circles. I don't know whether it came in the way of the development of the future professional lives of any of my friends, but I think it would have been better to have stepped out of our self-restricted social life in those opportune moments the hostel life offered to us.

Let me finish my narration about my BEC days, particularly the hostel days, on a personal note.

Every month, a feast would be held in each hostel. The menu would be elaborate, rounded off with Paan and cigarette. This would mark the occasion when many of our friends started smoking. I did not have to start then since I started smoking formally and ceremoniously on the day our Higher Secondary Examination results were declared. However, I and many of my friends made resolutions such as no smoking except on the day of the feast, moving on to - just one cigarette in a week, followed by no more than one per day etc. However, with the passage of time many of us became habitual smokers.

Somehow, in the final year, it came to my mind that while many of my friends were smoking cigarettes, I should do something different. I went to Kalibabu's Bazar at Howrah, bought a Hookkah and its accessories and the best 'Amburi' tobacco. I also bought a long rubber tube which could be attached to the Hookah to make it look and work like a 'Gargara', which was more aristocratic. I did not tell anybody about it and kept it suitably concealed in my room. Next morning, after lunch when I got the Hookkah going and started smoking it, the whole floor got filled with the fragrance of Amburi tobacco and my room got filled up by several of my smoker friends. They also had a smoke and congratulated me for providing this entertainment. From the very next day, it became a practice for a few of them to gather in my room after lunch and have a smoke of Hookkah. For the convenience of everyone, the Hookkah was tied to one of the bedposts that are used for hanging mosquito nets, and the rubber tube would circulate from hand to hand (mouth to mouth!).

Everything was going fine. Then one day, when a few of us were walking back from the main gate of the college, one of my mates came running from the hostel and informed, "Palit, your father has come to meet you. He is waiting in front of your room. Rush."

As I rushed, the thought came to my mind, "How could I open the door and take Baba into my room?! The Hookah was tied to the bedpost!" He would be terribly angry, or maybe would faint on seeing what his beloved son was doing rather than focusing on studies.

Fortunately, there was no metal grill in the windows of the hostel rooms, and we hardly ever locked the windows. I rushed into another friend's room, climbed through the window in his room, came down to the parapet on the outside; walking on the parapet, I entered my room through its window, removed the Hookkah and kept it under the bed. Then I retraced the path I had taken, came back in front of my room, met Baba and took him into my room. The excellent architecture of the hostel saved me. It had to be; after all the college was founded as CEC - Civil Engineering College.

When I left the college and thus the hostel after the final examinations, I gave away the Hookkah and the remaining consumables to the Floor Servant.

The so called 'Hookkah Bars' came much later. Along with supplying cigarettes to the students in his care, I don't know whether he also started offering them a smoke of Hookkah– free or against payment at the end of the month.

বি ই কলেজে আমার প্রথম দিন

গৌরীশঙ্কর সুর, ১৯৬৭, *আর্কিটেকচার*

সেই ১৯৬১ সাল, জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের একটা দিনের কথা আমি কখনও ভুলব না। বি ই কলেজে ভর্তি হওয়ার অনুমোদন পাওয়ার পর, আমার বাবার সঙ্গে বি ই কলেজের ক্যাম্পাসে এসে পৌঁছেছিলাম। মনে তখন কতই না উদ্দীপনা আর উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। তখনকার দিনে দেশের কঠিনতম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে, এক সেরা মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগটা আমার কাছে হয়েছিল একটা বড়ো অধ্যায়। কলেজের ক্যাম্পাসে ঢুকে, সারি সারি গাছের ফাঁক দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাড়ি দেখে আমি অভিভূত। অবাক তো হওয়ারই কথা, কারণ এত বড়ো এক আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার করার অভিজ্ঞতা আমার কখনও হয়নি। তাছাড়া, আমি এসে পড়েছিলাম কলকাতা থেকে অনেক দূরের একটা জায়গা থেকে, সেটা মফস্বল বলা যেতে পারে। এমন একটা পরিবেশের মধ্যে কয়েকটা বছর কাটাতে হবে, এই ভেবে রোমাঞ্চিত বোধ করেছিলাম। নির্দেশ মতো আমার থাকার জায়গায় পৌঁছে, আমি কিছটা বিমর্ষ হয়ে পড়ি। আমার থাকার জায়গা স্থির হয়েছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তৈরি, সৈনিকদের থাকার জন্যে, সারি সারি চোদ্দটা একতলা মিলিটারি ব্যারাকের মধ্যে একটাতে। লম্বা বড়ো একটা ঘরে ঢুকতেই নাকে এল জীবাণুনাশক গ্যম্যাক্সিনের তীব্র গন্ধ। ঘরের মধ্যে সারি সারি পাতা ছিল কুড়ি-বাইশটা লোহার খাট আর সেই সঙ্গে ছিল একটি করে চেয়ার-টেবিল ও নিজস্ব জিনিসপত্র রাখার জন্য একটা লোহার আলমারি। অচিরে ঘরটা ভরে উঠেছিল অচেনা নবাগতদের মুখ ও তাদের সঙ্গে কিছু নিজেদের লোকের উপস্থিতিতে। দিন গড়াতেই নিজেদের লোক একে একে বিদায় নিয়েছিলেন। ঘরটা সরব হয়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত ও সম্ভাব্য সহপাঠীদের পরিবেশে। এমনি সময়ে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক আমাদের ব্যারাকে উপস্থিত হয়ে, তার নাম ও পরিচয় জানিয়ে, ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনিই আমাদের হস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট। তার কথায় আমাদের মনে হয়েছিল, তিনি হয়তো কলেজের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক। সেদিন তিনি এক লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিয়ে, অভিনন্দন জানিয়েছিলেন আমাদের 'এনজায়িং' (তার ইঞ্জিনিয়ারিং কথাটার উচ্চারণ) পড়ার প্রচেষ্টাকে। পরে কলেজের সিনিয়র দাদাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে তিনি আসলে কলেজের কার্পেন্ট্রি শপের একজন সহকারী শিক্ষক। তার নামের পদবি 'বর্মন' হওয়াতে, অনেকে আড়ালে তাকে 'কাঠ-বর্মন' বলে সম্বোধন করত।

ব্যারাকের সেই প্রথম সন্ধ্যায় আমরা পরস্পরের আলাপ-পরিচয়ের পর্ব সেরে নিয়েছিলাম। ক্রমশই তাদের মধ্যে অনেকেই হয়ে উঠেছিল আমার আজীবনের বন্ধু। দুঃখটা এইখানেই যে তাদের মধ্যে আজ অনেকেই এই জগতে নেই। ব্যারাকের বড়ো ঘরটাতে কোনো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের

রাতের আর দুপুরের খাওয়া সারতে, চলে যেতে হত পার্শবর্তী 'সেন হল' অথবা 'সেনগুপ্ত হলে'। ঝড়-বৃষ্টির সময়ে অসুবিধা হত। সকলে মিলে একই জায়গায় থাকাটা খুবই আনন্দকর ছিল। সেখানে ছিল না বড়োদের চিরাচারিত সজাগ তত্ত্বাবধান আর বাঁকাদৃষ্টির প্রভাব। মনে হয়েছিল, অবশেষে আমরা মুক্ত। কোনো একটা পরীক্ষার পর, নিজেদের হালকা করার জন্যে, আমরা দলবেঁধে চলে যেতাম নিকটবর্তী বেতাইতালার এক সস্তা সিনেমা হলে। এই স্বাধীনতা অর্জন করায়, আমাদের কয়েকজনের পড়াশোনায় কিছু ক্ষতি যেমন হয়েছিল, আবার একসঙ্গে বসে পড়াশোনা, আড্ডা দেওয়াটা আর নানারকম মতামতের বিনিময়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ-সুবিধাটাও হয়েছিল।

ব্যারাকে কয়েক মাস থাকার পর আমাদের জানানো হয়েছিল, আমাদের জন্যে নতুন হস্টেল বিল্ডিং তৈরি হয়েছে এবং সেখানেই আমাদের সবাইকে চলে যেতে হবে। তারপর ওইসব জরাজীর্ণ ঐতিহাসিক ব্যারাক ভেঙে গড়ে উঠবে আরও আধুনিক নতুন আবাসন। বি ই কলেজের ইতিহাসে, ব্যারাকে আমরাই ছিলাম শেষ বাসিন্দা।

বি ই কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার কিছু পরে আমেরিকায় চলে আসি এবং আরও উচ্চ শিক্ষার্থে, খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যলয়ে পড়াশুনা করতে শুরু করি। আবার ছাত্রজীবনে ফিরে আসি কয়েক বছরের জন্যে। দেখেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তীর্ণ সুসজ্জিত প্রাঙ্গণ ও মনমাতানো বিদ্যায়তন, কিন্তু কখনও ভুলতে পারিনি, সেই প্রিয় বি ই কলেজের বর্ণে, গন্ধে, ছন্দে, গতি ও গীতিতে ভরা স্মৃতিময় দিনগুলোর কথা।

‘পুরানো সেই দিনের কথা’

রঞ্জন প্রসাদ (প্রসাদ রঞ্জন দাস), ১৯৬৯, *আর্কিটেকচার*

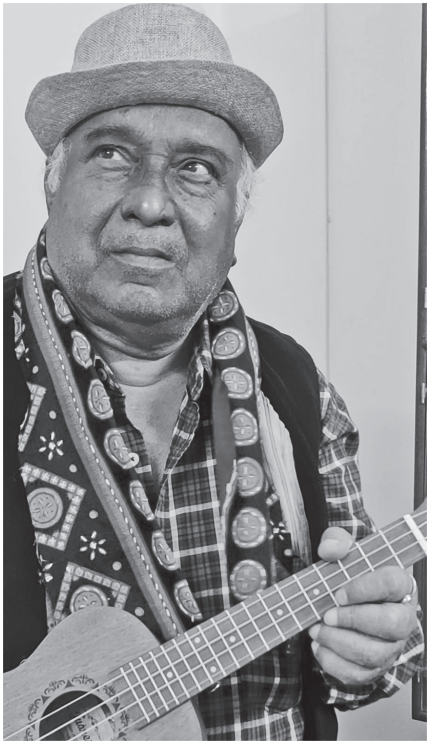

সেটা ষাটের দশকের মাঝামাঝি। আমি শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। হস্টেলে থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। খুব সকালবেলা থেকেই একটা কড়া অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের পড়াশুনো, ওয়ার্কশপ, ল্যাবরেটরি এবং থিওরি আর প্র্যাকটিকাল মিলিয়ে আমাদের প্রযুক্তিবিদ হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল তৎকালীন রক্ষণশীল অধ্যাপকদের মূল লক্ষ্য। তারই মধ্যে কেউ কেউ স্পোর্টস, অ্যাথলেটিক্স এবং সংস্কৃতির চর্চায় মনোনিবেশ করলে সেইসব শিক্ষকরা বড়ো একটা বাধা দিতেন না, তবে খুব উৎসাহও যে দিতেন, তা বলতে পারব না।

সেই ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেও আমাদের মতো কিছু ছাত্র প্রযুক্তি শিক্ষার পাশাপাশি সংগীতে-সাহিত্যে-শিল্পে অনুরাগী হতে প্রয়াসী হয়েছিল। সেটার প্রকাশ ঘটত আমাদের বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসবগুলোর ভিতর দিয়ে। তিনদিন ধরে বিভিন্ন প্যাভেলিয়নে সমস্ত ডিপার্টমেন্টগুলোর ছাত্রদের বিভিন্ন প্রকৌশলের প্রদর্শনী হত, এবং তাতে ইন্ডাস্ট্রির শীর্ষব্যক্তিত্বরা (যাদের মধ্যে আমাদের প্রাক্তনীরাও ছিলেন) এসে উপস্থিত হতেন, সমস্ত ক্যাম্পাসটা আলোয় ঝলমল করত, এবং সেই সাথে সারা রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠান যাতে খ্যাতিমান সেরা শিল্পীরা অংশগ্রহণ করতেন, এবং অবশ্যই ডাক পেতেন উদীয়মান শিল্পীরা, যাঁরা পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হবার প্রতিশ্রুতি রাখছেন। সেই রকম একটি অনুষ্ঠানে আমাদের একদম বোল্ড-আউট করে দিলেন একজন বিরল কণ্ঠের অধিকারী যুবক শিল্পী, বয়সে আমাদের থেকে সামান্য বড়োই হয়তো হবেন, কিন্তু তার কণ্ঠ ও মুখের অনাবিল হাসি একটি চির নবীন তারুণ্যের বার্তা বহন করে আনে। মানুষটির নাম স্বপন গুপ্ত, যিনি এলেন ও না দেখেই জয় করলেন।

পাঠক লক্ষ করুন, আমি ভিনি, ভিডি, ভিসি (veni, vidi. Vici / Latin) অর্থাৎ ‘আসিলাম, দেখিলাম,

জয় করিলাম'-এর মতো বিখ্যাত সীজার-উচ্চারিত উক্তিকে (I came, I saw, I conquired) একটু পরিবর্তন করে নিয়েছি, কারণ যাঁর প্রসঙ্গে এই কথার অবতারণা, সেই স্বপন গুপ্ত আর পাঁচজন যেভাবে দেখতে পান, সে অর্থে দেখতেন না, তবে যা দেখতেন সেটা তার মনের চোখ দিয়ে, শরীরের চোখ দিয়ে নয়।

সেই সময় বেশ কিছুদিন ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা জলসাগুলোতে একটি নাম ঘুরে ফিরেই আবর্তিত হচ্ছিল, বিশেষত কলেজ বা ইউনিভার্সিটির চত্বরগুলোতে। একজন মেধাবী শিল্পী, যিনি শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শিল্পী মহলে নিজের জায়গা করেছিলেন এমন উদাহরণ খুব বেশি পাওয়া যেত না। অতএব ঠিক হল সেবারই আমাদের কলেজের বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে তাঁকেও আহ্বান জানানো হবে। ঠিকানা পেতে দেরি হল না, আমাদের মধ্যে থেকে যে ছাত্ররা এই দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা সেই দায়িত্বটি করে ফেললেন, এবং আমরা একটি ভিন্নধর্মী অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করে রইলাম।

যথা সময়ে সান্ধ্য অনুষ্ঠানে তাঁকে নিয়ে আসা হল, এবং তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত, হাসিমুখটা সবার মন জয় করে নিল। চোখে অবশ্যই একটি কালো চশমা, কিন্তু তাতে কী? মনে হল তার পিছনে তাঁর সারা মুখটি হাসিতে ভরে আছে।

বিস্ময়ের তখনও বাকি ছিল। সাধারণত প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা, যেমন হেমন্ত-সন্ধ্যা মানবেন্দ্র-শ্যামল-ধনঞ্জয় যতটা সময় পেতেন, নবাগতরা তার থেকে কম, এটাই ছিল চালু রেওয়াজ। কিন্তু এই শিল্পী গান শুরু করতেই প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত শ্রোতারা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তার মধ্যে আমিও ছিলাম। কী দরাজ কণ্ঠ, কী পরিশীক্ষিত উচ্চারণ। গাইছেন রবীন্দ্রসংগীত, কিন্তু একসাথে দেবব্রত বিশ্বাস এবং Jim Reeves যেন হাতে হাত রাখছেন। একটির পর একটি গান চলতে থাকল, পরবর্তী শিল্পীর দল গ্রিনরুমে অপেক্ষমান, কিন্তু তাদের ডাকে কে? রবীন্দ্রসংগীতের পর সলিল চৌধুরীর রাণার, গাঁয়ের বঁধু, কবি সুকান্তর কথায়-ঠিকানা, সবগুলোই যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। ওঁকে মঞ্চ থেকে ছাড়ার ইচ্ছে কারও নেই, শিল্পীও শ্রোতাদের ছেড়ে উঠতে চাইছেন না, এই অদ্ভুত রসায়ন চলতেই থাকত, যদি না গ্রিনরুমের অসন্তোষটা মঞ্চ অবধি বিস্তৃত হত। তখন সিনিয়রদের দু'একজন বুদ্ধি দিলেন যে মঞ্চটা পরবর্তী শিল্পীদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে, কিন্তু এই শিল্পীকে ছাড়া হবে না। আমাদের হস্টেলগুলোর কমন রুম আর হল বেশ বড়ো মাপের ছিল, তার লাগোয়া ডাইনিং রুমগুলোও বেশ বড়ো, যাতে একসাথে সত্তর আশিজন বসে অনায়াসে খাওয়া যেত। হস্টেলগুলোও ছিল প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সাহেবদের নামে, যেমন রিচার্ডসন, ম্যাকডোনাল্ড, ডাউনিং, স্লেটার, উলফেনডেন, পান্ডিয়া, সেনগুপ্ত, সেন ইত্যাদি। যাঁদের মধ্যে এখানেই পড়িয়ে, এই মাটিতেই অনেকে শেষশয্যায় শায়িত হয়েছিলেন। ঠিক হল উলফেনডেন হলেই আসর জমানো হবে। মূল মঞ্চে যেমন অনুষ্ঠান চলে, চলুক।

দল বেঁধে সবাই সেখানে জড়ো হওয়া গেল। এদিকে নৈশাহারের সময়ও পেরিয়ে যায়। তাই আগে সবাই মিলে ডিনার সারা হল। আমাদের হস্টেলের খাবার স্বপনেরও ভালো লেগেছিল কারণ সে খাবারে মিশেছিল আমাদের আন্তরিকতা। ততক্ষণে তিনি স্বপনবাবুর থেকে বন্ধুশিল্পী স্বপনে পরিণত হয়েছেন। কারণ বেশিরভাগ শিল্পী আমাদের অনুষ্ঠান মঞ্চে উদয় হতেন, আবার স্বীয় অনুষ্ঠান সেরে মঞ্চ থেকেই বিদায় নিতেন, পারিশ্রমিক পর্বটি সেরে। এক্ষেত্রে যা হল তা পুরোটাই স্বতঃস্ফূর্ত। অনেক রাত পর্যন্ত গানবাজনার আসর চলল। তারপর কয়েকজন তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল, আমরাও এক সুন্দর স্মৃতি নিয়ে মূল মঞ্চে

ফিরে গেলাম, সেখানে তখন অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে।

এরপর অনেক মঞ্চেই আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। কারণ আমিও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে পেশায় প্রযুক্তি এবং নেশায় সংগীতকে নিয়ে দুটো ভিন্ন দিগন্ত মেলানোয় প্রয়াসী হয়েছি। যতবারই দেখা হয়েছে, আমি মঞ্চে বা গ্রিনরুমে পাশে বসেই স্বপনের কানে কানে উলফেনডেন-এর সেই স্মৃতি উসকে দিতেই সানন্দে হাতটা ধরে বলেছেন, 'মনে আবার নেই, সে কি ভোলা যায়।'

সেইসব দিনগুলোর সাক্ষী আমাদের ১৯৬৯ ব্যাচের অনেক সহপাঠী-সতীর্থ—সুহৃদ-সুজন-বন্ধুই আজ আর পৃথিবীতে নেই, সেই শিল্পী-বন্ধু স্বপনও চলে গেছেন না ফেরার দেশে। রয়ে গেছে সেই সুন্দর স্মৃতিগুলো।

এইবার সেই রকম আর একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার ঘটনা মনে পড়ছে, যা এইরকম সুখপ্রদ নয়, বরং খুবই বেদনাদায়ক। আমি তখন থার্ড ইয়ারের ছাত্র। কলেজের ফার্স্ট লবিতে মঞ্চ করে একটি বড়ো অনুষ্ঠান হচ্ছিল (তখন হত)। এখন যেখানে গাবেসুর বার্ষিক পুর্নমিলন উৎসব সেখানেই হয়, একটা তেরপলের আচ্ছাদন বানিয়ে ছাত্র-দর্শক শ্রোতারা সেই অনুষ্ঠান উপভোগ করতেন। শিল্পীরা এসে বসতেন তৎকালীন অধ্যক্ষের ঘরের বিপরীতে বড়ো হল ঘরটিতে। তখন তাঁদের অভ্যর্থনার সঙ্গে সংগীতানুরাগী ছাত্ররাও তাঁদের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেতেন, কেউ কেউ সই সংগ্রহও করতেন অটোগ্রাফ খাতায়, কারণ তখন নিজস্বী বা সেলফির যুগ বাস্তবে তো দূরস্ত, কল্পনাতেও আসেনি। এইরকম একটি অনুষ্ঠানে গান গাইতে এসেছিলেন সুবীর সেন। অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী এই সুদর্শন মানুষটির কণ্ঠে অনেক কালজয়ী গান অমর হয়ে আছে, শুধু বাংলা নয় বম্বেতেও। যথাসময়ে ওঁর নাম মঞ্চে ঘোষিত হতেই উনি হার্মোনিয়াম নিয়ে বসলেন, সঙ্গে একজন তবলচি। বিখ্যাত গান ছড়িয়ে পড়ল মাইকে –

'এত সুর আর এত গান,
যদি কোনোদিন থেমে যায়'

কিন্তু কী আশ্চর্য! একটু বাদেই দর্শক শ্রোতাদের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। ছাত্ররা অনেকে উসখুশ করছিলেন, কারণ এরপরেই কোনো একজন কণ্ঠী-শিল্পী অর্কেস্ট্রা সহযোগে হিন্দি সিনেমার গান পরিবেশন করবেন, যার সঙ্গে দেদার উদ্দাম নৃত্যের ব্যাপক সম্ভাবনা আছে। সুবীর সেন মহাশয়েরও ব্যাপারটা চোখ বা কান এড়াল না। তিনি গানের মাঝেই হার্মোনিয়াম থামিয়ে কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন। তার পরে সবিনয়ে বললেন, 'আমার গান বোধহয় আপনাদের আর ভালো লাগছে না। অতএব আমি এইখানেই আমার অনুষ্ঠান শেষ করছি।' বলেই উঠে চলে গেলেন। এক অপ্রত্যাশিত ইন্দ্রপতন। আমি তার সাক্ষী হয়ে রইলাম আর রইল আমাদের ক্লকটাওয়ার, যে এরকম অনেক ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

ডাউনিংয়ে প্রথম দিন ও আরো কয়েকটা দিন-১৯৬৫

অজয় কুমার দেবনাথ, ১৯৭০, *ইলেকট্রিকাল*

বাবাকে পই পই করে বলেছিলাম যে প্রভাসদার ওই বিদঘুটে আওয়াজওয়ালা গাড়ীতে আমি বি ই কলেজে এডমিশন নিতে যাব না। প্রভাসদা আমাদের শিবপুর মন্দিরতলা এলাকায় ফোর্ডের খোলা জিপ ভাড়া দিতেন কিন্তু হর্নের আওজটা ছিল কানের পোকা মারার জন্য যথেষ্ট। এডমিশন টেস্টের ফর্ম আনা, দুদিন ধরে পরীক্ষা দেওয়া..সব একাই করেছি কিন্তু এবার টাকা পয়সার ব্যাপার আর অন্যান্য ফর্মালিটিসের জন্য বাবাকে যেতেই হত ! বাবা কোন কথাই শুনলেননা; কালো ট্রাংক আর শতরঞ্চি জড়ানো বিছানা রেডি হতেনা হতেই সেই হর্নের আওয়াজে প্রভাসদা জানিয়ে দিলেন তিনিই হাজির হয়েছেন।

সব ঠিক ঠাক চলছিল এই পর্যন্ত ..আমাদের গন্তব্য ডাউনিং হল; ফার্স্ট ইয়ারে আমাকে সেখানেই থাকতে হবে। চোখ জুড়ানো ওভাল মাঠের পাশ দিয়ে বাঁদিকে গথিক স্টাইলের জিমন্যাসিয়ামের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছি তো সেই সময়েই প্রভাসদার গাড়ির বিদঘুটে হর্নটাকে দু তিন বার বেজে উঠতে হল। আর যায় কোথায় যেন ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়লো। সরাসরি পেছনে দশ নম্বর আর একটু সাইড করে এগার নম্বার হস্টেল.. চারতলার সবগুলো তলাতেই বেশ কিছু কালো মাথা খালি গায়ে বা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে নিচের দিকে ঝুঁকে সমস্বরে প্যাঁক দিতে শুরু করলো।

কে এল ড্যা..VIP এসেছে VIP এসেছে ইত্যাদি নানা উচ্চকিত মন্তব্যে আমার কান গরম হয়ে উঠলো। ..বাবার মুখের দিকে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করে জিমন্যাসিয়াম দেখতে ব্যস্ত থাকলাম; গম্ভীর স্বভাবের পদস্থ কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরের আপাত অপদস্থ বা অস্বস্তিকর অবস্থার জন্য নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছিলো।ভাগ্যিস ডাউনিং ওখান থেকে কাছেই।

হস্টেলের সেন্ট্রাল ইস্টের এক তলায় ডানদিকের দু নম্বর ঘরে জিনিসপত্র নামিয়ে বিছানাপেতে চার রুমমেটের সঙ্গে আলাপ হল। মেকানিক্যালের বিশ্বরূপ ধর আর কল্যাণ দেব; সিভিলের গৌর ধর আর শ্যামল দাশ--এই দুজনকে ফার্স্ট ইয়ারের পর থেকে আর কোন দিন দেখিনি। বাবা কিছুক্ষন পরে চলে আসতে চাইলে আমিও বাড়ি এসে বন্ধুদের সাথে সান্ধ্য আড্ডা সেরে রাতের খাওয়া খেয়ে সাড়ে নটা নাগাদ হস্টেলে ফিরলাম।গরমের কারণে খালি গায়ে পাজামা পরে খাটে বসে নতুন বন্ধুদের সাথে গল্পগুজব করছি এমন সময়ে হৈ হৈ করে বিজয়ী বীরের মত কয়েকজন আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ে উল্টো পাল্টা প্রশ্ন ও ভাব ভঙ্গি করে বোঝাতে চাইলো তারা রাগিং করতে এসেছে। সাধারণের তুলনায় আমার শরীর স্বাস্থ্য একটু বেশীই ভাল ছিল তার ওপর আমি পাশেই মন্দিরতলার ছেলে তাই ওসবে কোন পাত্তা না দিয়ে বসেই রইলাম। ওনাদের আঁতে ঘা লাগায় কাছে এসে তুই তোকারি করে কিছু একটা বলতে এসে আমাকে খালি

গায়ে দেখে ওরেব্বাবা বলে সরে পড়লো। বাকি সবাই অনুসরণ করার ফলশ্রুতি আমি বেঁচে গেলাম আর প্রথম কয়েকদিন একই পদ্ধতি অবলম্বনে রয়ে গেলাম এক্কেবারে রাগিং ফ্রী।

এর কয়েকদিন পরে একটা মজার কিন্তু লেখকের কাছে কষ্টদায়ক ঘটনা ঘটলো। মেকানিক্যাল শপে একটা দুই ইঞ্চি স্কোয়ার, হাফ ইঞ্চি মোটা স্টীলের প্লেটকে ছেনি দিয়ে কেটে গোল করা ছিল আমার জব। খুবই যত্ন ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার জন্য অল্প অল্প জ্বালা ধরা ভাব আসছিল। এই সময়ে দেবদূতের মত সামনে এসে হাজির হল সুবোধ। সে অতি সুবোধ বালক, আমাদের পাড়ার ছেলে;কদিন আগেও একসাথে ফুটবল খেলতাম কিন্তু পড়াশুনা বিশেষ এগোয়নি বলে এই ওয়ার্কশপে ট্রেনি হয়ে জয়েন করেছে। আমাকে দেখে এক গাল হেসে বললো কি রে তুই এখানে কি করছিস? আমি বুকে কষ্ট মুখে হাসি নিয়ে বললাম এই আরকি এটাকে হাতুড়ি দিয়ে ছেনির ওপর ঘা মেরে মেরে মালটাকে কেটে গোল করতে হবে.। সুবোধ মুচকি হেসে বললো আমাকে আর বলতে হবে না, ও রকম মাল কত নামিয়েছি! তবে তুই তো বাবামায়ের লালুপোলা;তোর দ্বারা এসব হবে না। তুই জবটা নিয়ে দুদিন নাড়াচাড়া কর, আমি তোকে আমার করা একটা জব দিয়ে দোব তুই সেটা জমা দি বি। আমি তো আকাশের চাঁদ পেলাম যেন হাতে। দিন দুই পরে সুবোধ এসে চুপি চুপি আমার হাতে একটা সুন্দর গোল করে কাটা জব দিয়ে চলে গেল। আমি ঐটার ওপর আলতো করে সারা বেলা ঠুক ঠুক করে বেলা শেষে বুক ঠুকে জবটা স্যারের কাছে জমা দিতে গেলাম! ভঞ্জ স্যার জবটা হাতে নিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন; একবার আমার মুখের দিকে আর একবার জবের দিকে তাকিয়ে জবটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন তুমি এটা করেছো? যাও আর একটা প্লেট নিয়ে নিজে করে জমা দেবে..না হলে ফেল করিয়ে দোব। আমার অবস্থা আবার পুনর্মুষিক ভব হয়ে গেল। আমি লোহা কাটতে কাটতে ভাবছিলাম এই কম্মটি আমার কোন কম্মে লাগবে আর কলেজেরই বা কোন লাভ হবে! যাই হোক কাটাকাটি করে যেটা জমা দিলাম সেটাকে জব না বলে যবাক্ষার বললেই বোধ হয় ঠিকঠাক বলা হয়। মধুরেণ সমাপয়েৎ হলনা ব্যাপারটা কিন্তু ভঞ্জ স্যার খুবই দয়ালু ছিলেন; আমাকে ভালো নম্বরই দিয়েছিলেন।

আমার রুমমেট বিশ্বরূপ খুবই ভাল গান গাইতো; এখন ও ওর অসাধারণ গান শোনার সৌভাগ্য হয় আমাদের। রবীন্দ্র সঙ্গীত বিভাগে ও ইউনিভার্সিটিতে একাধিবার পুরস্কৃত ও হয়েছিল।চর্চা পুর দস্তুর বজায় রেখে এই বয়সেও গান শিখে চলেছে। অন্যদিকে কল্যাণ দেব রাগিং সপ্তাহ কেটে যাবার পর ট্রান্সিস্টর রেডিও বানাতে ব্যস্ত হো পড়লো। কল্যাণ খুব রোগা ছিল আর একদম সোজা হয়ে দাঁড়াতো বলে ওর আদরের ডাকনাম হয়ে গেল ভার্টিকাল। রেডিও পর্ব কাটার পর ও ঠিক করল নতুন কিছু করতে হবে। আমাদের পাশের ঘরটা ছিল ছোট ..মাত্র দুজনের থাকার উপযুক্ত।সেই ঘরে থাকতো মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র (মুতু) আর মিহির মৈত্র (কচি)। আমাদের এই দুই ঘরের মধ্যে একটা যাতায়াতের দরজা ছিল যেটা দুদিক থেকেই খোলা বন্ধ করা যেত। মুতুর নাকি খুব ভুতের ভয় তাই কল্যাণ ঠিক করলো ওকে ভয় দেখাবে। ওরা না থাকা অবস্থায় দেখে নেওয়া হল যে দরজা আমাদের দিক থেকে খোলা যাচ্ছে। রাত্রে সবাই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লে বারোটা নাগাদ কল্যাণ চুপি চুপি দরজা খুলে মুতুর বিছানার পাশে দাড়ালো আর গৌর মগে করে খানিকটাজল হাতে পাশে আসতেই কল্যাণ হাতটা জলে ডুবিয়ে মুতুর জামাটা খানিকটা তুলে ভালো করে হাত বুলিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে আমদের ঘরে ঢুকে পড়লো। একটু পরে তুমুল চিৎকার জুড়ে মুতু তীর

বেগে ঘরের বাইরে এসে ভুত ভুত করতে লাগলো।প্রচুর লোকজন জড় হয়ে গেল আর উত্তেজনার আগুন পোয়াতে লাগলো। আমরাও হৈ চৈ করতে করতে বেরিয়ে এলাম আর জোর গলায় ভৌতিক তত্বকে মদত দিতে লাগলাম। আগেই শুনেছিলাম ডাউনিংএ ভুত আছে তাই এটা অনেকটা জোরদার প্রচার পেয়ে গেল.।

দ্বিতীয় সপ্তাহে বিকালে ক্লাস শেষে রুমে ফিরে ভেজান ছোলা বাদাম সেই সঙ্গে বাড়ি থেকে আনা আঁখের গুড় আর দুটো কাঁঠালি কলা উত্তম রূপে মাখিয়ে বৈকালিক খাবার শেষ করে একেবারে তৈরি হয়ে আমার প্রিয় জায়গা জিমে চলে এলাম ব্যায়ামচর্চা চালিয়ে যাবার জন্য। 'এলাম, দেখলাম আর বিস্ময়াভূত' হয়ে গেলাম। ক্লাসে যতই হাবা গোবা হয়ে থাকি না কেন এখানে এসে আমি বুঝে গেলাম এটাই আমার জায়গা, my cup of tea. ১৯৬৪ সাল থেকে পাড়ায় টানা ব্যায়ামাগারে গেছি.....দৈনিক আড়াই ঘন্টা নিয়মিত শুধু রবিবার বাদ দিয়ে। আমার সবই জানা শুধু বিশালতা, বৈচিত্র আর সুযোগ সুবিধা আমাকে সম্মোহিত করে দিল।

আলাপ হল মৃণালদা, কল্যাণদা, সমীর বিশ্বাসদা, অমলকান্তি দে দা, অশোক মুখার্জিদা, নীলাদ্রি পালিতদা, নিমাই কোলেদা, সুমিত মজুমদারদা, শরদিন্দু (ভগা) ভট্টাচার্যদা দের সাথে আর আমাদের ব্যাচের বরুন মজুমদার, সমরেন্দ্রনাথ নাথ কর্মকার (গোলু), সমীর ঘোষ (দারা সিং), বেণীমাধব শর্মা, মনোজ মিত্রর সাথে। ((এরপরে পরের ব্যাচ থেকে এসেছিলো প্রদীপ আর কল্যাণ দাস)। কোচ ছিলেন ৫ বারের মিঃ এশিয়া দুলাল দত্ত দা। জমজমাট হয়ে উঠল আমাদের জিম।

আমি বাংলা মিডিয়ামের পাতি স্কুল বাজে শিবপুর বি কে পালস ইনস্টিটিউশনের ছাত্র। (গত বছর একটা বিশেষ কাজে আমাদের প্রিয় আনন্দ মোহন ঘোষ স্যারের বাড়ি গিয়েছিলাম । গিয়ে দেখি স্যারের বাড়ি আমাদের স্কুলের ঠিক উল্টো দিকে। রথ দেখা আর কলা বেচা একসঙ্গে পাওয়ায় খুব ভাল লেগেছিল।) তাই ক্লাস শুরু হবার প্রথম দিকে স্যারেরা যা পড়াতেন বুঝতে বা নোট করতে ভীষণই অসুবিধা হত। তার ওপর একটু অবহেলা আর পারিপার্শিক পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নের ব্যর্থতা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো রূঢ় বাস্তবতা নিয়ে। প্রথম টার্মিনাল পরীক্ষার রেজাল্টে জীবনের প্রথম ও শেষ লাল কালির দাগ আমাকে কষাঘাত করে জানিয়ে দিল যা হচ্ছে ঠিক হচ্ছেনা ; এবার সংশোধন দরকার। পুজোর ছুটিতে দুপুর বেলা বাড়িতে একা জেগে ছিলাম এমন সময় পিয়নকাকু চিঠি চিঠি বলে হাঁক পাড়তে আমিই গেলাম চিঠি নিতে। ভাগ্যিস আর কেউ ছিলনা আশে পাশে--কলেজ থেকে আসা চিঠিটা ছোঁ মেরে নিয়ে খুলে পড়তেই মাথা ভোঁ ভোঁ। জীবনের প্রথম প্রেম পত্র .....আমার পরীক্ষার ফলাফল ' extremely poor '. তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে চিঠিটা আমার সেই বিখ্যাত ট্রাঙ্কের একদম নিচে জায়গা করে নিল আর কোনদিন সেটা কেউ পড়েনি। বিস্মৃতির আড়ালে শেষ পর্যন্ত কোথায় তার পরিণতি আজ আর মনে নেই। তবে নিঃসন্দেহে সেটা আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ বাঁক।

ইংরেজিতে অসম্ভব কাঁচা ছিলাম। সেইদিন থেকে বাড়ি এসে সময় পেলে পি কে দে সরকারের গ্রামার নিয়ে বসতাম। আস্তে আস্তে ইংরেজিতে লেখায় একটু সড়গড় হলাম, নোট লেখায় গতি এল। অনেকে গ্রুপে পড়াশুনা করতো, অনেকে খুব ভাল ছেলেদের কাছে গিয়ে বুঝে আসতো। বেশির ভাগ ছেলেই পরীক্ষার আগে একমাস লড়ে যেত; যারা সেটাও করতো না তারা রিপিট করতো। আমাদের সময়ে অন্ততঃ

শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ ছেলেই প্রথম বছরে অকৃতকার্য হত। আমাদের কলেজে যেহেতু স্পোর্টস কোটা ছিলনা তাই খেলাধুলায় যাদবপুরের সাথে আমরা একটু হ্যান্ডিক্যাপড হয়েই থাকতাম। আর যারা খেলাধুলায় একটু ভাল তারা ফেল করার ভয়ে কলেজে ঢুকে মাঠে নামতে একটু বোধহয় দ্বিধায় থাকত। আর বিখ্যাত যাদের নাম কলেজে ঢুকেই শুনলাম খেলাধুলার নানান বিভাগে, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই প্রথম বছরে রিপিট করেছিলেন। আমি একটু আতংকিত ছিলাম ; আত্মবিশ্বাসে ভর করে পড়াশুনার চাপটা নিজেই নিলাম, আড্ডা মারাটা একেবারে বন্ধ করে দিলাম, এক্কেবারে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন বেছে নিলাম। সিনেমা দেখাটা ও ছাড়লাম একই কারণে। কেউ বিশ্বাস করবে না হয়ত, আমি কলেজের বাইরে একটা ই সিনেমা দেখেছি পাঁচ বছরের আবাসিক জীবনে তা ও সেটা পঞ্চম বছরে ফাইনাল পরীক্ষার মাঝে নকশাল আন্দোলনের জন্য প্রথম বার ক্যাম্পাস ত্যাগ করার দিন ঝর্ণা হলে। যদিও ইনস্টিটিউট হলে ২৫ পয়সার টিকিটে দু একটা সিনেমা দাদাদের চাপে দেখেছি ....তার মধ্যে বাক্সবদল ও ' টু স্যার উইথ লাভ' (সিডনি পয়টারের) খুব ভাল লেগেছিল। সময় গড়িয়ে চললো আপন ছন্দে।পড়াশুনার ব্যাপারটা ধাতস্থ হয়ে এল। প্রথম পরীক্ষায় প্রেমপত্র পাবার পর আর কোন ভালবাসার ফাঁদে পড়িনি। এখন বুঝতে পারি ওটা আসলে ছিল একটা সাবধান বাণী। যারা কর্ণপাত করেনি তারা কঠিন মূল্য দিয়েছে।

কলেজে প্রথম বছর থেকেই এনসিসি করতে হত আমাদের। বিকেল ৫ টা থেকে বোধহয় ৬টা পর্যন্ত্য। ভাল লাগতোনা একদম। 'গালে মাল' দার শাসানি আর 'পাই' দার ধমকানি ধীরে ধীরে সহ্য হয়ে আসতে লাগলো। একজন ছোট খাট চেহারার এনসিসি কমান্ড্যান্ট গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে তো থাকতেনই। ভাল লাগতোনা একদমই কারণ আমার জিমের সময় কমে যাচ্ছিল। খানিকটা পুষিয়ে যেত অন্যদিক থেকে ; কাচা ও ইস্ত্রি করা বাবদ কিছু পয়সা পাওয়া যেত। কোনদিন কেচেছি বলেতো মনে পড়েনা কিন্তু ইস্ত্রিটা দারুন করতাম। সুন্দর ভাবে ভাঁজ করে বিছানার তোষকের নিচে দিয়ে দিলেই আমার ওজনের চাপে লন্ড্রির থেকেও ভাল ইস্ত্রি হয়ে যেত।

পাইদাকে পরে ডিসিপিএল অফিসে দেখেছি কিন্তু খুবই মানসিক টলমল অবস্থায়। এত খারাপ লাগতো যে বলার অপেক্ষা রাখেনা। যাইহোক পুরোনো কথায় ফিরে যাই। কিছুদিন এইভাবে চলার পর শুনলাম আমাদের আবাসিক পানাগড় ক্যাম্প আবশ্যিক ভাবে করতেই হবে। অগত্যা বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে রওয়ানা দিলাম। কিভাবে গেছি মনে পড়েনা কিন্তু ওখানে গিয়ে পড়লাম এক মহা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে। প্রায় ১১০০ ছেলে গেছি কিন্তু কতৃপক্ষ বোধহয় এতটার জন্য প্রস্তুত ছিলনা। 'এই যৌবন জল তরঙ্গ রোধিবে কে' ? খাওয়া দাওয়া শোয়া নিয়ে 'মহা কলরব উপস্থিত হইল'। একটা পরিত্যক্ত হ্যাঙ্গারে আমাদের বিছানা পাতা হল। সেইদিন কি খেয়েছি, কখন খেয়েছি কিছুই মনে পড়েনা কিন্তু রাত্রির অভিজ্ঞতা ভয়ঙ্কর। তখন শীতকাল ; পানাগড়ে নিশ্চয়ই আরো ১০ ডিগ্রি কম ছিল কলকাতার থেকে। প্রত্যেকটা ছেলে কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে ; বাতাসের জলীয় বাষ্প হ্যাঙ্গারের শীতলতর ধাতব পদার্থের মধুর চুম্বন স্পর্শে বিন্দু বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে ভালবাসার প্রতীক হয়ে। আমরা শুয়ে পড়েছি এমন সময়ে পাশেই কে রেডিও চালিয়ে দিয়েছে সেখানে সন্ধ্যা মুখার্জির গান শুরু হল ' আয় বৃষ্টি ঝেঁপে' .....তারপর 'কাঠ ফাটা রোদের আগুনে' .....আসতেই মনে পড়ছিল এত ঠান্ডার মধ্যে এই রসিকতাটা না করলেই নয়!! ওই কনকনে ঠাণ্ডায় মাথা ঠান্ডা রাখাই

দায়। যাদের একটু মাথা গরম তারা কিছু ক্ষণ চেঁচামিচি চালিয়ে গেল। আমি ভাবলাম অন্তত এই রাতটা তো কাটাতে হবে আর আমার রাত জাগা অভ্যাস ও নেই। তাই চেঁচামিচি আর শীতের কামড় থেকে বাঁচতে আস্তে আস্তে কম্বল না লেপ, কি জানি ছাই কি নিয়ে গিয়েছিলাম, টেনে বার করে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়েই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভাগ্যিস তখন এখনকার মত রাত্রে উঠে দুয়েকবার বার প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার মত শারীরিক দুর্গতির কষ্ট ছিলনা। 'তাই এক ঘুমেতেই ঠান্ডা, পানাগড়ের (ঠান্ডার) পান্ডা'।

পরদিন সকালে প্রকৃত অর্থেই শুরু হল 'exodus'. আবার মহা কলরব ; আশেপাশে যাদের দেখছি সবারই বাক্স প্যাঁটরা হাতে বা কাঁধে। প্রায় ৭০০ ছেলে সকালেই পাততাড়ি গুটিয়ে 'মন চল নিজ নিকেতনে'। আমরা ৪০০ বীর পুঙ্গব রয়ে গেলাম পানাগড়ে। যতদূর মনে আছে গোলু , কল্যাণ দেব, অশোকদা আমাদের সঙ্গেই থেকে গিয়েছিল। আমাদের তখন প্রচন্ড খাতির। যত পারো লুচি, শাল পাতার কৌণিক ঠোঙায় ঘন ছোলার ডাল আর শেষে বোধহয় গরম রস ঝরে পড়া জিলিপি .....মার্চ, ড্রিল আর প্যারেড শেষে স্নান আর তার পরে দ্বিপ্রাহরিক রাজকীয় খাওয়া দাওয়া .....জমে ক্ষীর। বিকালে মনে হয় ছুটি থাকত কারণ আমার মনে আছে আমি আরো কেউ কেউ ক্যাম্পের চারিধারে সিমেন্টের বাঁধান রানওয়েতে ছুটতে যেতাম।

ঐ কমান্ডান্ট সাহেব কিন্তু খুব কড়া লোক ছিলেন; কোন গোলমাল পছন্দ করতেন না। আর আমাদের ওই বয়সে তখন গোলমাল করাতেই আনন্দ। দু একদিন পরে যখন আমরা পানাগড়ের ঘরের ছেলে হয়ে গিয়েছি সেই সময়ে বোধহয় একদিন একটু বাড়া বাড়ি হয়ে গিয়েছিল। উনি আমাদের থামাতে খুব বকাবকি শুরু করলেন কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। তখন হাতের লাঠিটা মাটিতে দু তিন বার ঠুকে উনি বললেন ' you guys making so much noise but I know how to control children. Do you know I am a son of four fathers' ? মানে উনি রাগের চোটে অনেক ছেলেমেয়ের বাবা বলতে গিয়ে যে অনেক বাবার ছেলে বলে ফেলেছেন সে বিষয়ে খেয়ালই হারিয়ে ফেলেছিলেন ।আমাদের গন্ডগোল তখন থেমে গিয়ে পেটের মধ্যে গুডগুডি দিয়ে হাসির দমক উঠে আসছে। ক্ষনকালের বিরতি দিয়েই সবাই হাসিতে ফেটে পড়লো।কমান্ডান্ট সাহেব রোষকষায়িত নয়নে আমাদের দিকে তাকাতেই আমরা পরস্পরের দিকে মুচকি হেসেই সে যাত্রায় ক্ষ্যামা দিলাম।

ঠান্ডাটা আস্তে আস্তে সয়ে গিয়েছিল। দিন কয়েক পরে এক ছুটির দিনে কিছু বন্ধু মিলে শান্তিনিকেতন যাচ্ছে শুনে আমি ও ভীড়ে গেলাম সেই দলে।কি ভাবে কারা কারা গিয়েছিলাম এখন আর মনে পড়ে না।এখনকার মত এত জাঁক জমকপূর্ণ মেলা তখন দেখতে পাইনি এইটুকুই স্মৃতির মধ্যে এখন ও অবশিষ্ট পড়ে আছে ।হয়তো ১০/১২ দিন ছিলাম কিন্তু খুবই উপভোগ করেছিলাম পানাগড় ক্যাম্প। ফিরে এসে বীরের সম্বর্ধনা পেলাম এনসিসি কতৃপক্ষের কাছ থেকে। কয়েকদিন যাবার পর শুনলাম আর আমাদের কোনদিন বিকেলে এনসিসি করতে যেতে হবেনা। সে যে কি আনন্দ বলে বোঝাবার নয়। আরো বেশি আনন্দ হল যখন শুনলাম আমাদের ভাতা মানে জামা কাপড় কাচা আর ইস্ত্রি করার খরচা যেমন পাচ্ছিলাম তেমনি পাবো । আর যারা পানাগড়ের পানা পুকুরে ডুবে মরতে চায়নি বলে ক্যাম্প পালিয়ে চলে এসেছিল তাদের 'double up' করতে হয়েছিল।

ডাউনিংয়ে প্রথম রাত কাটিয়ে পরদিন ঘুম থেকে উঠে অপরিচিত পরিবেশে মন খারাপ লাগছিল। ঘরের বাইরে এসে ব্রাশ করতে করতে ইস্ট উইংয়ের দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়িটার প্রথম ধাপে (এখন সেই দরজা দেখলাম বুজিয়ে দেওয়াল তুলে দিয়েছে আর সিঁড়িটার ও অস্তিত্ব নেই) বসে ভাবছিলাম আর পাঁচ বছর পরেই আমি ইঞ্জিনিয়ার আর কখন ও মন খারাপ করে হস্টেলে থাকতে হবে না। ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষার শেষে সেই দিনই বাড়ী চলে গেলাম। দাদার সাইকেল নিয়ে এসে বিখ্যাত কালো ট্রাঙ্ক গুছিয়ে বাড়ীতে ফিরে এলাম। যে দিন তড়িঘড়ি করে ডাউনিং হল ছাড়লাম চিরদিনের মতো সে দিন বুঝতে পারিনি সেটা একপ্রকার মায়ের সাথে সন্তানের নাড়ীর বাঁধন কেটে যাওয়ার মতোই। কিন্তু এই নাড়ীর টান যতদিন বেঁচে থাকব, যতদিন হৃদয় সজীব আর সবুজ থাকবে আর মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থ শুখিয়ে না যাবে ততদিন এই টান যাবার নয়।

Timeless Tales: 170 Years of Engineering and the Legacy of Sholay

Debanjan Sengupta, 1997, Civil

This year, our beloved alma mater proudly marks a staggering 170 years since its foundation, a legacy stretching back through generations of students, educators, and traditions that have shaped countless lives. From its early days under different names, identities, and even locations, having evolved into the thriving institution of national importance it is today, our mother ship stands as a living monument to resilience, knowledge, and the spirit of one for all and all for one.

Just as our college has transformed through the decades, so too has Indian cinema gifted us enduring legends. Earlier this year, the iconic film Sholay celebrated its golden jubilee, having cemented its place in the hearts of millions since 1975. Its unforgettable characters, gripping drama, and immortal dialogues echo the timeless power of storytelling.

But what does a half-century-old film have in common with a 170-year-old engineering institution? More than one might expect.

The engineering experience cycles through a somewhat predictable tide. First year murgis navigate a swirl of bewilderment and semi-conscious attendance. In the second year, we engineers enjoy the fusion of academic awakening and social freedom, with the least burden of expectations. In the third year we hit the reality-check speed-breakers, usually after having shifted from the hostel and its multi occupancy rooms to a single seater room in a hall. Finally the final year folks gear up for the existential sprint beyond college gates by getting buried in campus interviews, higher studies prep or saying the final goodbyes to their mates. In Sholay, the script follows a similar rhythm, with comedy, music, and a dash of romance, both expressed and unspoken, dominating the first half. Things get serious with the festival of Holi, and the second half rises rapidly in a crescendo of struggle and violence till the menace of Gabbar is laid to rest.

Those four years (five for some) are much like Sholay, a saga of camaraderie, trials,

and triumphs. It's a place where youthful idealism meets harsh deadlines, where friendships are forged in the crucible of sleepless nights and youthful misadventures, and where generations of students have faced their own battles. Sometimes they have been armed with textbooks, sometimes with stubborn grit, but most often with both, or at least with photocopied class notes.

Engineering education is never a neat cinematic plot but a spirited improvisation, full of cliffhangers like sessionals, project submissions, the infamous non-coll and dis-coll attendance chases, and the grand tradition of the grand viva (voce). Just like the drama on the Sholay screen, the real-life tales from campus blend heroic feats with comic missteps. My own mediocre grades and occasional embarrassing episodes deserve a mention here.

The cyclical nature of college life, its fests, late-night study sessions, friendships, and even those dreaded farewells, washes over each batch anew, echoing the same themes of hope, struggle, and perseverance that Sholay captured with cinematic flair.

While Sholay brought the epic battle of good versus evil to life through frames and reels, our alma mater embodied the daily triumphs and tribulations of the human spirit seeking knowledge, a career, and a life. Hostel (or hall) rooms became sanctuaries of shared hopes, frustrations, and that peculiar joy of surviving another day without a mental meltdown, just like the bottle carried by Dharmendra's Veeru.

Our college functioned like a colossal stage where every student played out a unique role, many with moments of brilliance, some with bouts of comic despair, all woven together in a tapestry of shared memories that bound us far beyond exam halls and Grand Feasts.

Our Professors, the enigmatic mentors, mingled epic statures with occasional human quirks, creating folklore that would rival any legendary Bollywood dialogue. Like Gabbar Singh's infamous quotes, their one-liners and admonitions echoed through batch reunions, bringing equal parts laughter and deep nostalgia, but most often mingled with respect.

The community spirit, whether rallying for a fest, supporting an alumnus in medical distress, or collectively breathing a sigh of relief after results, resembled the unity of the Sholay villagers resisting adversity. Back in the day, impromptu strikes just so one could watch an important cricket match or get a dreaded semester examination delayed were par for course, but things might have changed now.

As we salute 170 years of engineering education, it is clear that the lessons learned

here - patience, resilience, and laughter in the face of chaos - mirror the timeless virtues showcased on screen in Sholay.

So as you walk through the campus precincts, recall the flickering stories of Sholay, the legacy of our alma mater, and the ongoing drama of student life. Both inspire courage, camaraderie, and the capacity to confront life's unpredictable script with hope and humour.

And if you ever find yourself wondering why you barely managed to stay awake during morning lectures or how you survived yet another brutal semester, do remember that your story is part of a 170-year epic that combines the sacred, the sublime, and plenty of laughter.

With gratitude, respect, and a touch of humble pride, I tip my imaginary hat to all the batches past, present, and future. May you continue to write your chapters with the same spirit of resilience, rebellion, and joy.

বনমালী ঘোষালের ঘড়ি

ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, ১৯৯৮, *সিভিল*

রজত দাসের (১৯৯৮, সিভিল) স্মৃতির উদ্দেশে রচিত

একদিন রাত্রে সৌরভ গুপ্ত নেই। তাই আমাদেরও বেশ একা একা লাগছে। আমি, ম্যাড়া (দীপক সঞ্চিতি) আর খোঁট্টা (শান্তি ভূষণ) মনের দুঃখে রজত দাসের লকার থেকে দু বোতল "Syrup" বার করে খাওয়া শুরু করলাম ।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, রজত দাস মনে করতো জ্বর, জ্বালা, পেট ব্যথা, হার্ট এ্যাটাক — পৃথিবীর যে কোনো অসুখের একটাই ওষুধ — "Syrup", তাই আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে সব সময় ৫-৬ বোতল স্টকে রাখতো ।

কিছুটা খাবার পর খোঁট্টা বলল চল graveyard এ যাওয়া যাক। ওখানে প্ল্যানচেট করা যেতে পারে। দারুন অ্যাডভেঞ্চার হবে ।

যেমন বলা , তেমন কাজ । এক বোতল " Syrup "আর একটা মোমবাতি নিয়ে তিনজন পৌঁছলাম ।

নিশুতি রাত , ঝিঁঝিঁর শব্দ । ঘড়িতে ১ টা ছুঁই ছুঁই । চারদিকে ঘন কুয়াশা ।

বাউন্ডারি ওয়াল টা পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার পর একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলো । এতো গুলো কবর , সব মিলিয়ে গোটা ১৫-২০ ভূত । ডাকবো কাকে ? সবাই একসঙ্গে এসে গেলে একটা বিপত্তি হতে পারে ।

কবরস্থ মানুষগুলোর অধিকাংশই সাহেব । ম্যাড়ার ধারণা সেনাদা (জয়দীপ সিনহা) যখন HCL এর GD ক্লিয়ার করেছে , তখন ইংরিজিতে কথা বার্তা চালাতে গেলে ওকে ডাকতে হবে ।

কিন্তু খোঁট্টার বিশেষ ভরসা নেই । যে সেকেন্ড ইয়ার এ থাকতে ফোর্থ ইয়ার কে মারতে পারে , সে যে কোনো ছুঁতোয় ভূতেদের দু ঘা দেবে না , তার দায়িত্ব কে নেবে ?

ম্যাড়া অনেক ভেবে চিন্তে বললো বনমালী ঘোষাল (মৃত্যু ১৫ই আগস্ট ১৮৫২) কে টার্গেট করা হোক । উনি ঘোষাল , আমি ঘোষ --- তাই ভাষা জাত গোত্র নিয়ে কোনো সমস্যা নেই ।

তিন জন মিলে অনেক কষ্টে মোমবাতি টা জ্বালানো হলো । আমরা একাগ্র চিত্তে বনমালী বাবুকে স্মরণ করা শুরু করলাম ।

মিনিট পাঁচেক কেটে গেলো , কোনো সাড়া শব্দ নেই ।

ম্যাড়া বললো ঘুমিয়ে পড়ে নি তো ?

খোঁট্টা বললো সে তো ১৪৬ বছর আগেই পড়েছে ।

আমার বিশ্বাস হলো না । রজত দাস ছাড়া আমি আর কাউকে এতক্ষন ঘুমোতে শুনিনি ।

এদিকে মোমবাতি টাও নিভু নিভু। যা কিছু করবার তাড়াতাড়ি করতে হবে ।

উপায় না দেখে ম্যাড়া বললো তাহলে কবর টা খোঁড়া হোক । দেখা যাক ভিতরে কি আছে ?

আমার বরাবরই এইসব প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে আগ্রহ ছিল । ভাবলাম তুতেনখামেনের পিরামিড খুঁড়ে লর্ড কার্নার্ভন যেরকম বিখ্যাত হয়েছেন , একদিন আমার নামও সেরকম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে ।

কবরের ওপরের ঢাকনাটা বেশ ভারী । ধারের মাটিটা আলগা করে মিনিট পনেরো ঠেলাঠেলি করে গলদঘর্ম হয়েও কোনো সুরাহা হলো না ।

আমি আর বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছিলাম না । একটা হালকা ঝিমুনিও আসছিল ।

খোঁট্টা সবাইকে উৎসাহ দিতে বললো -- না না এটা খুলতেই হবে , সাহেবরা মারা যাবার সময় কবরের মধ্যে প্রচুর সোনাদানা রেখে যান । কিছু হোক না হোক , আমাদের ৭-৮ মাসের মেস বিল তো দেওয়া হয়ে যাবে ।

এটা শুনে আমার বেশ লোভ হলো । ব্যাপারটা মন্দ নয় ।

খোঁট্টা আমাকে চাঙ্গা করতে আরও বললো ওর বিশ্বাস এই কবরের মধ্যে সোনার ঘড়িও পাওয়া যেতে পারে ।

৯০ এর দশকের শেষ দিকে একটা ভিনটেজ পাত্তেক ফিলিপ মানে টিসিএস এর ২০ বছরের মাইনে।

আমি তবুও সন্দেহ বশত জিজ্ঞাসা করলাম " তুই ঠিক জানিস ? ঘড়ি পাওয়া যাবে তো ?

খোঁট্টা ঝুঁকে পড়ে মাথা নিচু করে কানটা কবরের ওপরে ঠেকিয়ে বললো " এই তো -- টিক-টক টিক-টক শব্দ শোন যাচ্ছে"

তখন আমায় আর পায় কে!! আমার 45 কেজি ওজনের শরীর তখন 405×10^{13} kilojoule এনার্জি তে কনভার্ট হয়ে গেছে ।

মরি মরবো , ঘড়ি পরেই মরবো --- এই বলে দিলাম এক রাম ধাক্কা ।

আর তাতেই বোধহয় ১৫০ বছরের পুরনো মরা জেগে উঠলো ।

কবরের ভিতর থেকে একটা হিমশীতল হাওয়া বেরিয়ে এসে আমাদের শিরদাঁড়া কাঁপিয়ে মোমবাতি টাকে এক ঝটকায় নিভিয়ে দিল ।

আধো অন্ধকারে দেখতে পেলাম একটা মনুষ্য আকৃতির সাদা ধোঁয়ার মতো কিছু বেরিয়ে এলো , হাতে একটা রিপিটার ---- ঘড়ি নয় , বন্দুক ।

ব্যাক্তিগত ভাবে আমার দৈত্য, ভূত , পেত্নী এসবে বিশ্বাস ছিল না ।

কিন্তু সেই রাতে যা দেখলাম , তাতে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেলো ।

উদভ্রান্তের মতো পাঁচিলটা টপকাতে গিয়ে খোঁট্টা পড়ে গেলো । আমার বাঁ হাতটা কবরের পাশের গাছটায় আটকে গেলো ।

কোনো রকমে হাতটা ছড়িয়ে কিভাবে সেদিন Wolfenden Hall এ ফিরেছিলাম আমরাই জানি ।

ঘরে এসে আবিষ্কার করলাম আমার হাতঘড়িটা পড়ে গেছে । সম্ভবতঃ কবরের পাশের ওই গাছটার

নীচে ।

ভয়ে , আতঙ্কে বিনিদ্র রজনী পার করে দিনের আলো ফুটতে তিনজন চুপিসারে আবার graveyard এ গেলাম ।

দেখলাম চতুর্দিকে শতাব্দী প্রাচীন ঝোপ ঝাড় জঙ্গলের মাঝে বনমালী ঘোষালের কবরের ঢাকনাটা বন্ধ হয়ে আছে । আর ঘড়িটারও কোনো অস্তিত্ব নেই.....

প্রতিবেশী পাখিরা

অঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৪, *মাইনিং*

আমি বহু বছর ধরে পাখিদের ছবি তুলছি, কিন্তু নিজের পরিবারের সদস্য বা কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব ছাড়া সেইসব ছবি কাউকে পাঠাইনি। সনৎ বলেছে যে, আমাদের কলেজের বিশ্বজোড়া প্রাক্তনীদের বার্ষিক মহাসম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য স্মারক পত্রিকায় আমার সংগ্রহে থাকা কিছু পাখি ও তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারা যাবে। সেই ভরসায় এই প্রয়াস। প্রাক্তনীরা নিঃসঙ্কোচে তাদের মতামত জানালে ভবিষ্যতের রচনাগুলো আরও তথ্যবহুল ও সুখপাঠ্য করার সুযোগ থাকবে।

প্রথম পর্ব

আমাদের ফ্ল্যাটবাড়ির আশেপাশে কিছু বড়ো বড়ো গাছ আছে, যেমন শিমূল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, জাম, শিরীষ, কদম্ব, নিম, বাদাম, অনেকগুলো সজিনা, ইত্যাদি। আর আছে বছর দশ-বারো আগে আমারই লাগানো একটি স্বর্ণচাঁপা গাছ, যেটি এখন চারতলা সমান উঁচু আর সারা বছর ফুল হয়। এই গাছটি পাখিদের খুব প্রিয়— বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে আর ছানারা বড়ো হয়ে উড়ে যায়। এইসব গাছে ছোটো ছোটো পাখিরা থাকে, যাদের আমি বহু বছর ধরে চিনি আর তাদের ছবি তুলি। কারও কারও দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্ম চলছে।

(১) 'বেনে বউ' [ব্ল্যাকহেডেড অরিওল]

একটু কল্পনাশক্তি থাকলেই বোঝা যাবে, কেন এই নাম— গোলাপী ঠোঁট, চোখ লাল, মাথায় কালো ঘোমটা, বুক উঁচু, পিঠে বাহারি ডিজাইনের হলুদ শাড়ি। সব সময়ে জোড়ায় জোড়ায় থাকে। গরমকালে এদের 'খোকা হোক' ডাক শোনা যায়। মৌমাছি, পোকা ধরতে ওস্তাদ।

(২) 'বাঁশপাতি' [গ্রিন বী-ইটার]

সবুজ রঙের, মাথায় ও ঘাড়ে মরচে ছোপ। ট্রেডমার্ক হচ্ছে লেজের ঠিক মাঝখানে সরু কাঠির মতো একটা পালক আছে আর চোখ ও গলায় কালো টানা দাগ। একটা মজার ব্যাপার— এরা প্রায়ই বিনা কারণে যে জায়গায় বসে থাকে, সেখান থেকে উড়ে একটু ঘুরপাক খেয়ে আবার সে জায়গায় ফিরে এসে বসে। আসলে, পোকামাকড় ধরার জন্য ঝাঁপ দেয়, কিন্তু সবসময়ে সফল হয় না।

(৩) 'লাল মাথা বাঁশপাতি' [চেস্টনাট হেডেড বী-ইটার]

এরা মিশ্র পর্ণমোচী জঙ্গলে জলের ধারে থাকে— উত্তরবঙ্গে খুব দেখা যায়, শীতের সময়ে দক্ষিণবঙ্গে নেমে আসে। আমার বাড়ির কাছের সজনে গাছে একবারই ছবি তুলতে পেরেছি। সাধারণ বাঁশপাতির মতো এদের লেজের মাঝখানে সরু পালক নেই।

(৪) 'বসন্তবৌরী' [কপারস্মিথ]

চড়াই-এর থেকে একটু বড়ো এই পাখি খুবই রঙচঙে— ঠোঁটের ওপরে কপালে টকটকে লাল একটা ঢিবির মতন, গলা হলুদ, পেটে লাল ছোপ, তার নীচে হলুদ, পিঠ গাঢ় সবুজ। বট প্রভৃতি ছোটো ফল প্রিয় খাদ্য। শীতকালে চুপচাপ থাকে, গরম যত বাড়ে গলা থেকে টক-টক-টক আওয়াজ বেরোয়— মনে হয় কামারের হাতুড়ি লোহার ওপর পেটা হচ্ছে। তাই ওই ধরনের ইংরাজি নাম।

(৫) 'নীলকণ্ঠ বসন্তবৌরী' [ব্লু-থ্রোটেড বারবেট]

শালিখের আকারের এই পাখিও বাহারি রঙের— মাথার ওপরে লাল গোলক, সারা শরীর সবুজ, গলা উজ্জ্বল নীল, চোখে কে যেন কাজল পরিয়েছে। বট প্রভৃতি ছোটো ফল প্রিয় খাদ্য। এদের খুব কম দেখা মেলে।

(৬) বুলবুলি [রেড ভেন্টেড বুলবুল]

সাধারণ প্রজাতিটির গায়ের রঙ কালচে বাদামি, পিঠে নক্সা কাটা, মাথায় ছোটো ঝুঁটি, লেজের গোড়ার তলার দিকে একটু লাল আঁচ। মানুষের কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসে। আমার বারান্দায় রোজ বিস্কুট খেতে আসে।

(৭) ঝুঁট শালিখ [জাঙ্গল ময়না]

গায়ের রঙ কালচে ছাই, চোখ গোলাকার ও ছোটো, সাধারণ শালিখের মতো চোখের পাশে চওড়া টানা হলদে রঙ নেই। ঠোঁটের সামনের অংশ হলুদ ও ঠোঁটের ওপরে খাড়া লোমের গুচ্ছ। জঙ্গলের কাছাকাছি লোকালয়ে মাঝেসাঝে দেখতে পাওয়া যায়।

৮) দুর্গা টুনটুনি [পারপ্‌ল সান বার্ড]

গায়ের রঙ ধাতব বেগুনি, সূর্যের আলো পড়লে নীল আভা বার হয়। সরু লম্বা ঠোঁট সামনের দিকে বাঁকানো। ফুল ফোটা গাছ বা লতায় ছটফটিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর ফুলের সামনে উড়তে উড়তে ফুলের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে মধু খায় হামিংবার্ডের মতো।

(৯) হলদে মৌটুসী [পারপ্‌ল-রাম্পড সান বার্ড]

এদের বুক হলদে, পিঠ খয়েরি। মাপে এবং স্বভাব চরিত্রে এরা দুর্গা টুনটুনির সমতুল্য। এরাও বাঁকানো ঠোঁটে মধু খায়।

(১০) হাঁড়িচাঁচা [ইন্ডিয়ান ট্রী-পাই]

আকারে শালিখের মতো হলেও লেজটি বেশ লম্বা যার তলার দিকে সাদা বলয় আছে। দেখতে সুন্দর, কিন্তু কাকের মতো এঁটোকাঁটা খায় বলে এবং তৎসহ কর্কশ স্বরের জন্য এইরকম একটা বিশ্রী নাম দিয়েছে।

(১১) হরিয়াল [ইয়েলো-ফুটেড গ্রিন পিজিয়ন]

এরা সাধারণত ঘন জঙ্গলে থাকে, কিন্তু মাঝেমধ্যে লোকালয়ে আসে। আমার এখানে শীতকালে আসে। হলদে পা। সকালে রোদ পোহায়। এরা মহারাস্ট্রের 'স্টেট বার্ড'।

(১২) কাঠঠোকরা [গোল্ডেন ব্যাকড্ উডপেকার]

এদের ডানা সোনালী-হলুদ, লেজ কালো, গাল সাদা, মাথায় লাল ঝুঁটি। গলার নীচের দিক থেকে বুক ও পেট পর্যন্ত ছিট ছিট লম্বা দাগ আছে। এরা মানুষকে ভয় পায় না। আমার বারান্দায় রোজ বিস্কুট খেতে আসে। আবার ঘাড় কাত করে আমাকে দেখে।

(১৩) চড়াই [হাউস স্প্যারো]

প্রতিদিন সব থেকে বেশি দেখা যায় (কাক বাদে) বলে এই পাখি সম্বন্ধে কারুর কোনো কৌতুহল নেই। এরা আজ খুব বিপন্ন। এরা অন্য পাখিদের মতো বাসা বাঁধতে জানে না বলে বাড়িঘরের ফাঁক-ফোকরে অপরিচ্ছন্ন বাসা বানায়। কিন্তু এখনকার বাড়িগুলো নিশ্ছিদ্র— ডিম পাড়ার জায়গা নেই। এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। পুরুষ পাখি বেশ জমকালো বাদামি আর স্ত্রী পাখি ধুসর রঙের কিন্তু কমনীয়তা আছে, লক্ষ করলে বোঝা যায়। এরা সারা জীবনে সঙ্গী বদলায় না। এই হিসেবে পাখিদের মধ্যে অনন্য। অথচ এরা ঝাঁকের মধ্যে থাকতে ভালোবাসে। আমার বারান্দায় রোজ দল বেঁধে বিস্কুট খেতে আসে।

(১৪) কোকিল [এশিয়ান কোয়েল]

শীত শেষ হতে না হতেই পুরুষ পাখিটা আমাদের সজিনা বা কৃষ্ণচূড়া গাছে ডেরা বাঁধে আর রাত তিনটে থেকে উচ্চস্বরে ডাকাডাকি শুরু করে সবার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। মেয়ে পাখিটা দূরে একটা গাছে বসে উত্তর দেয় কিন্তু তার দেখা আমি আজ পর্যন্ত পাইনি। এদের গায়ের রঙ কালো, কিন্তু কাকের মতো নয়, কেমন যেন নীলাভ। চোখ টকটকে লাল। মেয়ে কোকিলের সারা গায়ে ছিট ছিট, ডাক কর্কশ।

প্রতিবেশী আরও অনেক পাখির কথা লেখা হল না। যেমন, ছিটে ঘুঘু, শালিখ, নানা রঙের পায়রা, ছাতারের দল, টিয়া, মাছরাঙা, গো-শালিখ। আর কাকেদের জন্য তো আলাদা একটা পর্বই করতে হবে।

*****

লেখক পরিচিতি :

অঞ্জন মুখোপাধ্যায় আমাদের খনি কারিগরী বিভাগের সতীর্থ। তার কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে আছে ভারত তথা বিশ্বের নানা কয়লা খনির পরিচালন ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রস্তর কঠিন এলাকায় খনিজ উত্তোলন তার পেশা হলেও তার নেশা তাকে ছুটিয়েছে ক্যামেরা কাঁধে বনেজঙ্গলে, পথেপ্রান্তরে, সবুজ গাছ-গাছালির রাজ্যে, যেখানে গাছে গাছে উড়ে বেড়ায় নানা রঙ-বেরঙের মুক্ত বিহঙ্গের দল। তাদের নানা ভাব-ভঙ্গী সে ছবিবদ্ধ করেছে বহু বছর ধরে। তারই কিছু উপহার দিয়েছে আমাদের দুনিয়াজুড়ে থাকা প্রাক্তনীদের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারক সংখ্যায়।

জঙ্গলের অনুশাসন

সুব্রত মজুমদার, ১৯৬৭, *সিভিল*

ভুত আছে কি নেই, এই নিয়ে তর্কের শেষ নেই। ভয় থেকেই যদি ভুতের জন্ম হয় তা হলে ভুত থেকেই বা ভয়ের জন্ম হবে না কেন? ভগবানের অস্তিত্ব নিয়েও এই ধরণের তর্ক আদিম জুগ থেকে চলে আসছে, দুটো তর্কেরই আজও কোনও রকম নিস্পত্তি হয় নি। আর হবে কিনা বলাও যায় না।

বিজ্ঞানের যুগে কেউ এসব মানতে চাইবে না এবং এটা অস্বাভাবিক কোন ব্যাপারও নয়।

অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যদি কোন কিছু দেখা না যায় তা হলে তার অস্তিত্ব কিছুতেই সম্ভব নয়। এটাই বাস্তব, এটাই সত্যি।

ভুতের কথা আমিও বিশ্বাস করতাম না। অনেক জায়গা থেকে ভুত দেখার জন্য আমন্ত্রণও এসেছে। পোড় বাড়ীতে রাত কাটিয়েছি, ঘোর অমাবস্যায় শ্মশানে ঘুরেছি, ভুত আছে এরকম নির্জন রাস্তায় একা ঘুরেছি। কিন্তু চামচিকে, ইঁদুর, সাপ, শেয়াল ছাড়া আর কিছু নজরে আসে নি।

ভুত সমন্ধে ঘোরতর অবিশ্বাসি হয়ে উঠেছিলাম, এমন সময়ে এমন একটা ঘটনা ঘটল যা আমার জীবনে না ঘটলেই বোধ হয় ভাল ছিল। সেই ঘটনার কথাই আজকের গল্প। অবশ্য এটাকে গল্প না বলে ঘটনাই বলা উচিৎ কারণ এটা ঘটেছিল, আর ঘটেছিল বলতে গেলে আমার চোখের সামনেই। তা হলে শুরু করা যাক।

বাইরের হিমেল ঠাণ্ডা হাওয়া ভিতরে ঢোকার আপ্রান চেষ্টা করছিল, কিন্তু কাঁচটা বন্ধ থাকায় ঢুকতে পারছিল না। আমি সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা রাস্তা ধরে সন্তর্পণে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, আমার নিস্বাস প্রশ্বাসের জন্য গাড়ির সামনের কাঁচটা ধোঁয়াটে হয়ে যাওয়াতে দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল।

অবিরাম তুষারপাত অব্যাহত ছিল, অনুর্বর ভূদৃশ্যে একটি ভয়ংকর শিখাহীন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে তারা একটা একটা করে পড়ছিল সাদা পালকের মত হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে। সমস্ত পৃথিবীটাকে অদৃশ্য কোন শক্তি যেন একটা শ্বেতশুভ্র চাদরে মুড়ে দিয়ে দূর থেকে লক্ষ্য করছিল কেমন লাগে দেখতে। কি অপরূপ সেই দৃশ্য। নৈসর্গিক ওই দৃশ্য অন্য সময় হলে আমিও উপভোগ করতাম। কিন্তু এই দৃশ্য যেমনই নৈসর্গিক

তেমনই ভয়ঙ্কর। আমার স্টিয়ারিং হুইলটাকে সাঁড়াশির মত চেপে ধরলাম, গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করছিলাম প্রানপনে। এদিক থেকে ওদিক হলে রক্ষে নেই, একেবারে সোজা নিচের খাদে পড়ে যাবে গাড়ি, মৃত্যু অবধারিত । হৃদপিণ্ড এত জোরে ওঠানামা করছিল, মনে হল বোধ হয় ফেটে বেরিয়ে আসবে।

আমার ইন্দ্রিয়গুলি এমনিতেই উচ্চ সতর্কতায় ছিল, তবে প্রায় শূন্য দৃষ্টিগোচরতা সব কিছু দেখতে কঠিন করে তুলছিল। হঠাৎ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় স্মরণ করিয়ে দিল নীচের খাদে ছায়াময় একটা কিছু নড়াচড়া করছে। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমি তেরছা চোখে সেই দিকে আবার তাকালাম, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

দেখলাম আমার বন্ধু আলি শিকারের পোশাক পরে ঘোরাফেরা করছে , খাদের নিচে সমতল জায়গায়। কাঁধে তীর ধনুকের সরঞ্জাম। কিন্তু আলি এখানে এই সময়ে কি করছে? হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে এটা হরিণ শিকারের মরসুম। এই সময়টা হরিণদের সঙ্গমের সময় আর শিকারিদের শিকারের সময়। আমি জানতাম আলি খুব বড় ধরনের শিকারি। আমি গাড়ির স্পীড কমিয়ে হাত নাড়লাম, কিন্তু আলি উত্তর দিল না। আমি সাবধানে ধোঁয়াটে জানলার কাঁচটা পরিষ্কার করার জন্য চেষ্টা করছিলাম, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আমার হৃদস্পন্দন থেমে গেল। আমি না গত সপ্তাহে আলির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগদান করে ছিলাম? তবে কি...।?

আচ্ছা এমন কখন হয়েছে যে আপনি একজনের সঙ্গে আগের দিন কথা বলেছেন আনেক্ষন ধরে আর তার পরের দিন শুনলেন যে সে মারা গেছে। এটা যে কি অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা বোঝানো যাবে না। আমার ঠিক তাই হয়েছিল। লোকটির নাম ছিল আলি। মিডিল ইস্টের কোন একটা দেশ থেকে এসেছিল অ্যামেরিকায়, আমারই মত ভাগ্যের সন্ধানে। আলি বয়সে আমার থেকে একটু ছোটোই হবে। দেখতে সুন্দর, লম্বা, চালাক চতুর ও চটপটে। অল্প দিনের মধ্যেই অফিসের সবাইকার সাথে বেশ ভাবসাব করে নিয়েছিল। আলির বউয়ের নাম নর্মা, সাদা অ্যামেরিকান মেয়ে। কলেজ থেকেই আলাপ দুজনের। তারপর প্রেম তারপর বিয়ে। ওদের একটি ছেলে, তিন বছর বয়স, নাম জন। নর্মার দ্বিতীয় সন্তানের প্রেগনেনন্সি খুব এডভ্যান্স ষ্টেজে। আমি মাঝে মাঝে গেছি ওদের বাড়িতে। ওদের বাড়িটা এমনিতেই খুব সুন্দর, আর নর্মার ফেঙ সুইর ছোঁয়াচ লেগে সেটাকে মনে হত যেন মডেল হোম।

আলির সঙ্গে কথা হচ্ছিল ব্রেক রুমে, সকালবেলা কফি খেতে খেতে। ও বলছিল উইক এন্ডে ও আর ওর আরেক বন্ধু মিলে গিয়েছিল “ডিয়ার হান্টিং” করতে। খুব গর্ব করে বলছিল যে ও একটা খুব বড়সড় হরিণ মেরেছে। আলি আবার বন্দুক ব্যবহার করে না। তীর আর ধনুক দিয়ে শিকার করে। ওর ধারনা তাতে নাকি পশুকে একটু সুবিধা দেওয়া হয়। ওর আরও ধারনা তাতে বীরত্বও একটু বেশি অর্জন করা যায়। আলি খুবই গর্ব করে বলছিল যে যদিও দিনটা ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল, ও শুধু শব্দের ওপর ভরসা করে যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল সেইদিক লক্ষ্য করে তীরটা ছুঁড়ে দিয়েছিল। হরিণটা সেই একটা তীরেই ঘায়েল হয়েছিল। আলি যখন আধ্বরা হরিণটার কাছে গেল, দেখল তীরটা কোমরের কাছ দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে। হরিণটা মাটিতে শুয়ে ছটফট করছে, তার শরীরের রক্তে মাটিটা লাল হয়ে গেছে। দেখল অদুরে দাঁড়িয়ে আছে ওর সঙ্গিনী হরিণীটি, দেখে মনে হল গর্ভবতী, বাচ্চা হবে যে কোনদিন। আরও দেখল একটা বাচ্চা হরিণ তার মার চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছে , কি করবে বুঝতে পারছে না। আলি বলল যে দয়া পরবশ

হয়ে ওই দুটোকে আর মারেনি। আলির কথা শুনে গাটা কিরম যেন ঘিনঘিন করে উঠল, আর কিছু শুনতে ইচ্ছে করল না। খুব জানতে ইচ্ছে করছিল আধ্বরা হরিণটির কি হল। আলি কি আর একটা তীর ছুড়ে তার প্রাণটা বের করে দিল? না ছুরি দিয়ে তার গলাটা কেটে দিল? প্রায় মাঝপথে ওকে থামিয়ে দিয়ে একটা জরুরী কাজের বাহানা করে ওখান থেকে সরে পড়লাম।

নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসে বসে ভাবছিলাম আচ্ছা ওই মেয়ে হরিণীটির কি হবে? আর বাচ্চা হরিণটাই বা কি করবে? মনকে বোঝালাম ওরা তো জঙ্গলেই থাকে, ওরকম হয়েই থাকে। তীর লেগে না মরলে ওকে হয়ত হায়নায় খাবে বা অন্য কিছু হবে। সারভাইব্যাল অফ দা ফিটেষ্ট এর দোহাই দিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম। কাজে মন বসাতে পারলাম না। আফিস ছুটি হওয়াতে মনে হল বেঁচে গেলাম। কিছু মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক। পরের দিন কি ঘটে ছিল সেটা শুনলেই বুঝতে পারবেন। আমার অফিস বাড়ি থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। ভোর পাঁচটায় উঠতে হয়, ছটার মধ্যে আমাদের গাড়ি হাইওয়ে ধরে অফিসের দিকে ছুটতে থাকে। আমাদের বলছি এই কারনে যে সাধারনত আমরা কারপুল করে যাতায়াত করে থাকি। কিন্তু যে দিনটার কথা বলছি অর্থাৎ আলির সঙ্গে কথা বলার পরের দিন আমার একটা ভোর বেলায় জরুরী মিটিং থাকার জন্য ওইদিন আমাকে একাই গাড়ি চালাতে হয়েছিল। গাড়ি কিছুটা দূর যাওয়ার পরই বৃষ্টি শুরু হল। গাড়ির রেডিওটা অন করাতে শুনতে পেলাম যে প্রবল বর্ষণ ও ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা। খুব সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালানোর সাবধান বানীও শুনলাম। কিছুটা যাওয়ার পর বৃষ্টির তেজটা আরও বাড়ল, তার সঙ্গে কুয়াশার ঘনত্ব। সামনেটা ভালো দেখতে না পাওয়ার জন্য গাড়িটা আস্তেই চালাচ্ছিলাম। মনে মনে ভাবলাম ভালই হয়েছে একটু আগে বেরিয়ে। প্রায় চল্লিশ মাইল যাওয়ার পর একটা একজিট নিতে হয়। পার হতে হয় একটা খুব ছোট শহর । এই ছোট শহরটা পার হওয়ার পর যে স্টপ সাইনটা পড়ে সেখান থেকে আমাদের অফিসে পৌঁছোতে বাকি থাকে আর নয় মাইল। আমেরিকার যে কোন ছোট শহরের মতই এই শহরটা।

আজ এই ছোট শহরটার ওপর দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম, শহরটাকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছিল। শহরটা ঘুমিয়েই থাকে আমরা যখন যাই ওর ওপর দিয়ে। ল্যাম্পপোস্টের টিম টিমে আবছা আলোয় আজ কেমন যেন মনে হচ্ছিল নিঝুমপুরী। আশেপাশের বড় বড় বাড়ির ছায়াগুলো যেন মনে হচ্ছিল আমার গাড়ির পেছন পেছনে আসছে। কাছেই কথাও বিরাট আওয়াজ করে একটা বাজ পড়ল। আকাশটাকে দু ফাঁক করে এক ঝলক আলো দেখিয়ে আবার গাড় অন্ধকারে ঢেকে দিল। আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। মনে হচ্ছিল একটা ভৌতিক পরিবেশ যেন শহরটাকে ঘিরে রেখেছে।

ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে গাড়িটাকে সাবধানে চালিয়ে কখন যে ছোট শহরটা পার হলাম মনে নেই। হঠাৎ দেখি স্টপ সাইনটার কাছে এসে গেছি। স্টপ সাইনটার পরে যে রাস্তাটা পড়ে সেটা আরও খারাপ, তার দুদিকে খাদ। নজর শুধু রাস্তাতে রাখলেই হবে না, চোখ রাখতে হবে সামনে যেন কোন জন্তু জানোয়ার এসে না পড়ে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতের হোক বা যে কোন কারনেই হোক আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলো খুব সজাগ হয়ে উঠল। সেইজন্যেই কিনা জানিনা মনে হল বেশ কিছুটা দূরে কিছু একটা ঘটনা ঘটছে। কিন্তু কিছু বুঝতে বা দেখতে পেলাম না। আমার ইন্দ্রিয় নিজের থেকেই সজাগ হয়ে উঠল, গাড়ির স্পিডটাকেও কমালাম। হঠাৎ আমার সামনে থেকে কে যেন ঘন কুয়াশার পর্দাটা সরিয়ে নিল। বৃষ্টিটাও মনে হল অনেকটা ধরে গেছে।

আমি আবার সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। সুন্দর পরিষ্কার একটা দিন, যেন কিছুই হয় নি। মনে হল প্রকৃতি আমার সঙ্গে রসিকতা করছিল এতক্ষণ। আর একটু এগোনোর পরেই ঘটনাটা চোখে পড়ল। যার কথা আমি জন্মজমান্তরেও ভুলতে পারব না।

একটা ছোট নীল রঙের গাড়ি রাস্তা থেকে গড়িয়ে গিয়ে পাশের খাদে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। অন্তত দশ ফুট নিচে তো হবেই। আর একটা সবুজ রঙের মাঝারি সাইজের গাড়ি রাস্তার ধারে পার্ক করা। আরও লক্ষ্য করলাম রাস্তায় গাড়ি স্কিড করলে যে রকম দাগ হয় ওইরকমের গভীর দাগ। দাগটা সোজা নেমে গেছে যেখানে গাড়িটা কাৎ হয়ে পড়ে আছে সেই অবধি। রাস্তার ধারের রেলিঙটার অর্ধেকটা ভাঙ্গা। দূর থেকে বুঝতে পারলাম না গাড়িটার ভিতরে ড্রাইভার আছে না নেই। একটু এগিয়ে গিয়ে আমার গাড়িটা পার্ক করলাম। গাড়ির থেকে নেমে দেখলাম একটা লোক প্রাণপণ চেষ্টা করছে কাৎ হয়ে পড়ে যাওয়া গাড়িটার ভেতর থেকে ড্রাইভারকে বের করার। চোখটা গিয়ে পড়ল ড্রাইভার এর ওপর। চমকে উঠলাম, আরে এ তো আমাদের আলি। গোঙাচ্ছে, কাৎরাচ্ছে, আসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। যে লোকটা আলিকে সাহায্য করছিল এতক্ষণে তার ওপর আমার চোখ পড়ল। চিনতে পারলাম, আমাদের অফিসেই কাজ করে, নাম গ্রেগ। আমায় বলল, প্রায় দশ মিনিট ধরে আলিকে বের করার চেষ্টা করছে, কিন্ত কিছুতেই পারছে না। আমায় বলল পুলিশে আর এম্বুলেন্সে খবর দিতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কথামত আমার সেল ফোন থেকে কল করে দিলাম। মিনিট দশেকের মধ্যে পুলিশ আর এম্বুলেন্স চলে এল। আমি দেখলাম আমার আর কিছু করার নেই, তাছাড়া মিটিং এরও দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আমি গ্রেগের কাছে বিদায় নিয়ে অফিসে চলে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই অফিসে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। ঘনঘন আমার কাছে ফোন আর লোকজন আসতে শুরু করল, খবর নেওয়ার জন্য। খবর এল যে দরজা কেটে আলিকে গাড়ি থেকে বের করতে হয়েছে। হেলিকপ্টারে করে আলিকে কাছের বড় শহরের হাসপাতালে নিয়ে গেছে। বেলা চারটের সময় খবর এল অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আলিকে বাঁচান যায় নি।

প্রায় দুদিন পরে আলির ফিউনারালের খবর পেলাম অফিসের ইমেলে। অফিসের অনেকেই গেল ফিউনারালে, আমিও গেলাম। সকাল দশটায় চার্চে হাজির হওয়ার কথা। গাড়ি পার্ক করে চার্চে ঢোকার মুখে দেখা গ্রেগের সঙ্গে। সেই গ্রেগ যাকে দেখেছিলাম এক্সিডেন্টে ঠিক পরেই, আলিকে যে গাড়ির ভিতর থেকে টেনে বের করার চেষ্টা করছিল। গ্রেগ বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। আমাকে দেখে একটু অপেক্ষা করতে বলল। একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল "তোমাকে একটা কথা বলার ছিল, কাউকে বলবে না কথা দাও তো বলব।"

আমি একটু অবাক হলাম, সাধারনত আমেরিকানরা এরকম ভাবে কথা বলে না।

যাই হোক ওকে আশ্বাস দিলাম যে বলব না।

গ্রেগ বলতে শুরু করল "এক্সিডেন্টটা যদিও আমি দেখিনি কিন্তু মনে হয় পৌঁছেছিলাম মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। গাড়টা পার্ক করে যখন আলির কাছে নামলাম, তখনও আলির জ্ঞান ছিল, কথা বলছিল। আলি আমাকে বলেছিল কি ঘটেছিল।

একটু দম নিয়ে সিগারেটে একটা টান দিয়ে গ্রেগ বলল "আলি নিজের মনে গাড়ি চালাচ্ছিল, হঠাৎ দেখে

সামনে একটা বেশ বড়সড় হরিণ তার রাস্তাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। হেডলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখল হরিণটার কোমরের কাছে একটা তীর এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে, অথচ হরিণটা মাটিতে পড়ে ছটফট করছে না। রক্তও বেরোচ্ছে না। হরিণটা শুধু তাকিয়ে আছে আলির দিকে। কি বিভৎস সেই চাহনি। আলির শরীরে যত রক্ত ছিল মনে হল যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ঠিক এর পরেই আলি একটা বিরাট জোরে পাশবিক চিৎকার শুনতে পেল। আওয়াজটা এতোই জোরে যে আলির মনে হল তার কানের পর্দাটাই বুঝি ফেটে যাবে। আলিকে স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে দিয়ে দুটো হাত দিয়ে কানটাকে ঢাকতে হল। আলির মাথাটা ঘুরতে লাগল বনবন করে। আওয়াজটা কিছতেই বন্ধ হচ্ছে না। হঠাৎ আওয়াজটা যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি বন্ধ হয়ে গেল। আবার একটা বিরাট জোরে আওয়াজ হল কোথাও। যেন ভারি কিছু একটা পড়ার আওয়াজ। ভয়ে ভয়ে যখন চোখ খুলল, দেখল ওর গাড়িটা খাদের মধ্যে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। প্রথমেই ওর চোখটা গেল রাস্তার অপর, দেখল হরিণটা নেই। অবাক হল আলি। একটা তীরবিদ্ধ হরিণ কোথায় যেতে পারে? গাড়ির থেকে বেরতে চেষ্টা করল, কিছুতেই পারল না। মনে হল কোমরের নিচের দিকটা অবশ হয়ে আসছে। পা দুটো বশে নেই। কি হল কিছুই বুঝতে পারল না। কথাগুলো বলতে বলতেই আলি ক্রমশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ঠিক এই সময়ে তুমি ঘটনাস্থলে এসেছ। এরপরের সব ঘটনাই তোমার জানা।

সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে ফেলে দেবার আগে গ্রেগ বলল "আলির গাড়িটা খাদে পড়ার আগেই রাস্তার ধারের রেলিংটায় জোরে ধাক্কা মারে, রেলিংটা ভেঙ্গে যায়। আর সেই ভাঙ্গা রেলিংটা সোজা ড্রাইভারের দিকের দরজা ভেদ করে আলির শরীরের মধ্যে ঢুকে যায়। রেলিংটা আলির কোমরটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। আলির নিচের দিকটা যে অবশ হয়ে গিয়েছিল সেটা ওই কারনেই। পুলিশ আর এম্বুলেন্সের লোকেরা যখন দরজা কেটে আলিকে বের করে তখনই এসব জানা জায়।"

গ্রেগের কথা শেষ হওয়ার পর আমরা দুজনেই চার্চের ভিতরে ঢুকলাম। একটা সুন্দর গন্ধ জায়গাটায় ছড়িয়ে আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শান্ত পরিবেশ, ডান দিক থেকে দেখলাম অর্গানের আওয়াজ আসছে কিন্তু কোন বাদককে বাজাতে দেখলাম না। আলির বন্ধুবান্ধব, আত্মিয়সজন সবাই এক এক করে ওর সমন্ধে ভাল ভাল কথা বলছে। সামনের সারিতে আলির বউ নর্মা বসে আছে, খুব কাঁদছে। খুব এডভান্স প্রেগনেন্সি নর্মার, যে কোনদিন বাচ্চা হবে। আলির ছোট ছেলেটা অবাক চোখে তার মার চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছে, কি করবে বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ আলির সেই হরিণ শিকারের কথাটা মনে পড়ে গেল। মনটা চলে গেল সেই জঙ্গলে। মনে পড়ে গেল সেই হরিণটার কথল, সেই হরিণীটির কথা। কোথায় যেন একটা ভীষণ মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম সমস্ত ঘটনাটার মধ্যে। কত কথা মনে হচ্ছিল। সেই হরিণটাই কি সত্যি এসেছিল, না ওটা আলির মনের ভুল।

কানে এল এক ভদ্রমহিলা আর একজনকে বলছেন "ভগবানের এ কি অন্যায়, একজন স্বামিকে এত অল্প বয়সে তার স্ত্রীর এর কাছ থেকে কেড়ে নিল?

আমার আর সহ্য হল না। উত্তরের অপেক্ষা না করে, কাউকে কিছু না বলে আমি আস্তে চেয়ার থেকে উঠে, কাউকে বিরক্ত না করে চার্চ থেকে বেরিয়ে এলাম।

দিলীপ ভৌমিক (১৯৬৫, আর্কিটেকচার)— এক অন্তঃসলিলা বিরল প্রতিভা

নিবেদনে সনৎ কুমার ঘোষ, ১৯৬৪, সিভিল

দিলীপ ভৌমিক। ১৯৬০ সালে স্থাপত্য-বিদ্যা বিভাগে ভর্তি হয়। স্থাপত্য-বিদ্যা পাঠক্রম পাঁচ বছরের হওয়ার কারণে দিলীপ কলেজ থেকে পাশ করে বার হয় ১৯৬৫ সালে অন্যান্য স্থাপত্য বিদ্যার ছাত্রদের সাথে। ছোটোখাটো মাপের শ্যামবর্ণের ছেলেটির চেহারায় কোনোরকম জৌলুস ছিল না। কিন্তু ছিল অসম্ভব বুদ্ধিদীপ্ত মন। যে কোন ঘটনা, বা কারও কথাবার্তা বা আচার-আচরণ ততক্ষণাৎ নকল করে পরিবেশন করা, সেটা নিয়ে ছড়া বা কবিতা রচনা করা, অনেকসময়ে তাতে সুরসংযোগ করে গানে রূপান্তরিত করে পরিবেশন করা, এসব ছিল সহজাত। হঠাৎ কি মনে হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী ভারতীয়দের জীবন যাত্রা, তাদের উচ্চাশা, হতাশা, প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে প্রচুর চরিত্রকে পাথেয় করে লিখে ফেলল দু-খণ্ডের এক উপন্যাস ‘অন্তরালে’। এ-ছাড়া লিখেছে প্রচুর কবিতা, গান। নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিল, তাই শুধু গান লেখা নয়, তার সুরারোপিত বহু গান নামী শিল্পীরাও পরিবেশন করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে মর্মান্তিক বিষয়, কোভিডকালে হঠাৎ তার ‘ডিমেনশিয়া’ বা স্মৃতিভ্রংশের লক্ষণ দেখা যায়। ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। ২০২৩ সালের ১৭ই আগষ্ট আমাদেরই এক সহপাঠী তার হাতে একটা নোটবই আর কলম ধরিয়ে দিয়ে একটা কবিতা লেখার জন্য অনুরোধ করে। নিমেষে বোধহয় জোয়ার ওঠে তার সেই ফল্গুধারার মত বয়ে চলা অন্তঃসলিলা সুপ্ত প্রতিভার। লেখা হয়ে যায়—

কেন লিখি

ভেবেছিলাম কোনদিনই
লিখব না আর গান
থামতে আমি পারছি কোথায়
নেই যে কোন স্থান।।
লিখতে গেলেই ভাবি তখন
কী হবে এত লিখে
কে দেবে এর মূল্য এখন
লিখছে চারিদিকে।।
লেখার মূল্য সে জন দেবে
যে বোঝে এর মর্ম
সাহস করে বুঝে নেবে
নিজের যত কর্ম।।

*****

১৯৬৫ সালে কলেজ থেকে পাশ করার পর কর্মক্ষেত্রে হাতেখড়ি তখনকার কালের বিখ্যাত আর্কিটেকচারাল ফার্ম 'ব্যালার্ডি থম্পসন অ্যাণ্ড মাথিউস'-এ। কয়েক বছর একনাগাড়ে কাজ করার পরে ১৯৬৯ সালে আমেরিকা যাত্রা। সেই থেকে সারাটা জীবনই সে কাটিয়েছে সুদূর আমেরিকায় প্রবাসী ভারতীয় হিসাবে। যৌবনের মাদকতা, পশ্চিমী দুনিয়ার চাকচিক্যের মোহ কেটে গেলে সব প্রবাসী ভারতীয়দেরই বোধ হয় দেশের প্রতি একটা টান অনুভব করে। জন্মভিটের টান -- শিকড়ের টান। এই রকমই এক অদম্য বাসনা বোধহয় জেগে উঠেছিল ২০২২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারীর দিলীপের মনে, তারই ফলশ্রুতি বোধহয় তার কলম থেকে স্বেচ্ছায় বার হওয়া এই কবিতাটি—

খুঁজে বেড়াই

কেন যে তুমি এনেছো আমায়
এত দুরে দূর দেশে।
বুঝি না কেন যে পারিনা বোঝাতে
এ মনকে আমার অক্লেশে।।
তবুও এখানে বসে লিখি কত
কত অজানার বাণী।
বুঝেও নিজেকে বোঝাতে পারি না
হই কেন এত অভিমানী।।
লিখি তবু আজও হারানো দিনের
যত আছে স্মৃতি জুড়ে।
খুঁজে কি পেয়েছি মনের কোণায়
এত পথ ঘুরে ঘুরে ।।
হয়তো খুঁজে পাবো আমি শেষে
এই জীবনের সন্ধান।
সেদিন আমার নিভৃত হৃদয়ে
রবেনাত অভিমান।।

৮ ফেব্রুয়ারী ২০২২
নিউ জার্সি (ইউ.এস.এ)

--- XXX ---

গত ১১ নভেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার দিলীপ আমাদের ছেড়ে না-ফেরার দেশে চলে গেছে। সে কি পেলো খুঁজে তার জীবনের সন্ধান ? না কি নিভৃত হৃদয়ের অভিমান নিয়েই চলে গেল?

দিলীপের সঙ্গীত জীবন সম্বন্ধে কিছুই প্রায় বলা হয়নি। পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী যার গুণমুগ্ধ, সেই দিলীপের সঙ্গীত-প্রতিভা নিয়ে পরবর্তী সংখ্যায় কিছু লেখার ইচ্ছা রইল।

একটি অনৈতিক যুদ্ধ

সনৎ কুমার ঘোষ, ১৯৬৪, *সিভিল*

ভূমিকা

ইউরোপীয় দেশগুলোতে চিনদেশ থেকে চা, সিল্কের কাপড়, চিনামাটির জিনিসপত্র ও অন্যান্য নানা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রপ্তানি হত। কিন্তু এসবই আসত স্থলপথে প্রাচীন রেশম পথ অনুসরণ করে। সুদূর চিন থেকে সেই সব জিনিসপত্র তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, জর্জিয়া, আজারবাইজান, তুরস্ক হয়ে ইউরোপের ভেনিসে পৌঁছোত। যাতায়াতে সময় লাগত প্রায় দেড় বছরের মতো। পায়ে হেঁটে বা ঘোড়া এবং খচ্চরের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে নিয়ে মাইলের পর মাইল দুর্গম হিমালয় পর্বতের গিরিকন্দর পেরিয়ে এই ব্যবসা চলত। স্বভাবতই এই সুদীর্ঘ দুর্গমপথে ব্যবসা করার জন্য পথে বহুবার হাত-বদল হওয়ার কারণে জিনিসপত্রের দামও হয়ে যেত আকাশছোঁয়া। ইউরোপের ব্যবসায়ীরা বহুদিন ধরেই পূর্ব এশিয়ার এইসব দেশে পৌঁছোবার একটা সহজ পথের সন্ধান করছিল, যাতে করে তারা সোজাসুজি ওইসব দেশ থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এসে ব্যবসা করতে পারে। এদের মধ্যে ইউরোপের সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশগুলো, বিশেষ করে পর্তুগাল, ইংল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের ব্যবসায়ী ও নাবিকেরা ক্রমাগত সমুদ্রপথে প্রাচ্যদেশে পৌঁছোবার একটা সহজ পথ খুঁজছিল। অবশেষে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে সমুদ্রপথে ইউরোপ থেকে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে প্রাচ্যের দেশগুলোতে, বিশেষ করে ভারতবর্ষ, চিন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে যাতায়াতের পথ আবিষ্কার করেন। এর পর থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যথা ব্রিটেন, নেদারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন, সুইডেন তাদের নিজ নিজ দেশে প্রাচ্য দেশগুলোর সাথে একচেটিয়াভাবে ব্যবসা করবার জন্য তাদের দেশের রাজাদের কাছ থেকে সনদ নেয়।

১৬০০ খ্রিস্টাব্দে রানি প্রথম এলিজাবেথ 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' নামে একটি নতুন বাণিজ্যিক সংস্থাকে গ্রেট ব্রিটেনের হয়ে ভারত ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে একচেটিয়া বাণিজ্য করার জন্য রাজকীয় সনদ দেন। পরবর্তীকালে এই 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' বিভিন্ন দেশে তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েম করতে শুরু করে। উনবিংশ শতকে রানি ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে এই প্রবণতা সব থেকে বৃদ্ধি পায়। তারা ভারত জয় করে ও চিনকে পরাজিত করে একটি জাতির অসাধারণ ইতিহাস সৃষ্টি করে। চিনের হংকং ছাড়া আর কোনো ভূখণ্ড ইংরাজরা অধিকার করেনি বটে তবে অসম চুক্তির বন্ধনে অন্যভাবে চিনের ওপর অধিকার কায়েম করেছিল। এর ফলে ইংরাজদের চাহিদামতো চিন ভারতে তৈরি আফিম কিনতে বাধ্য হয়েছিল, আর আফিম বিক্রির সেই টাকায় ইংরাজরা চীচিন থেকে চা কিনে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে রপ্তানি করে অর্থ উপার্জনের ব্যাপারটা সুনিশ্চিত করেছিল।

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে তৎকালীন মাত্র দু'কোটি ষাট লক্ষ জনসংখ্যার একটি দেশ গ্রেট ব্রিটেন পাঁচ হাজার মাইল দূরে থাকা ছেচল্লিশ কোটি জনসংখ্যার দেশ চিন ও সাতাশ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করত।

এটা সত্যই খুব লজ্জার বিষয় যে প্রধানত ইংরাজ এবং কিছু কম মাত্রায় রুশ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা এশিয়ার চারটি বৃহৎ দেশ যথা, চিন, ভারত, পারস্য ও অট্টোমান সাম্রাজ্য দমন করে রেখেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল এইসব ইউরোপীয় দেশগুলোর উন্নত সামরিক শক্তির কৌশলী প্রয়োগ, সরকারি প্রধান ও সেনাপতিদের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং শত্রুকে অসতর্ক সময়ে ও স্থানে অতর্কিতে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করার জন্য। যুদ্ধজয়ের পরে বিজিত দেশকে অসম চুক্তিতে রাজি হতে বাধ্য করা হত। উনবিংশ শতকে যেখানেই কোনো এশীয় দেশের সঙ্গে ইউরোপীয় দেশের যুদ্ধ হয়েছে সেখানেই এই ধরনের বাধ্যতামূলক অসম চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

যুদ্ধের সূত্রপাত

উদ্ভিদবিজ্ঞানী জর্জ ওয়াটস তাঁর ভারতের অর্থনৈতিক পণ্য অভিধানে আফিমকে একটি অর্থনৈতিক পণ্য হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী এর ফুলটি খুবই আকর্ষণীয় এবং এমনকী ফলটি সব্জি হিসাবে কাঁচাও খাওয়া যেতে পারে। এই ডোরাকাটা ফলের খোলা ছাড়ালে যে রস নির্গত হয় তা থেকেই তৈরি হয় আফিম।

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের আফিম যুদ্ধ চিনের চিঙ্ সাম্রাজ্য ও রানি ভিক্টোরিয়ার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বলতে গেলে প্রথম বড়ো ধরনের সামরিক সংঘাত। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে চিন সরকারিভাবে আফিমের ব্যবসা নিষিদ্ধ করে দেয়। উপরন্তু চিঙ্ সরকার ইংরাজ ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের চিন থেকে বহিষ্কার করে খ্রিস্টাব্দে ক্যান্টন বন্দরের চিনা কমিশনার লিন জেক্সু দশ লক্ষ কিলোগ্রামেরও বেশি পরিমাণ আফিম বাজেয়াপ্ত করে পুড়িয়ে দেন। প্রত্যুত্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সেনাবাহিনী পাঠায় ও প্রথম আফিম যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধে চিনের যে শুধু হংকং দ্বীপটি হাতছাড়া হয় তা নয়, চিঙ্ সরকারের সামরিক দুর্বলতাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের আগে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো চিঙ্ সাম্রাজ্যকে সমীহ করে চলত। কিন্তু এই যুদ্ধের পরে ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলো চিনের ওপর নানা ধরনের অসুবিধাজনক অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

এবারে দেখা যাক, এই যুদ্ধের পিছনে কী কী কারণ ছিল। সেজন্য একটু পিছনের দিকে যেতে হবে। চিন চিরকালই বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যের ব্যাপারে খুবই রক্ষণশীল। তাই পাশ্চাত্য দেশগুলোর সাথে খুবই নিয়ন্ত্রিতভাবে বাণিজ্যে অংশ নিত। একমাত্র ক্যান্টন বন্দর থেকেই দেশের সমস্ত বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পন্ন হত। বিদেশী বণিকরা একমাত্র ক্যান্টন বন্দরে চিন সরকারের নিয়োগ করা মাত্র কয়েকজন চিনা ব্যবসায়ীর সাথে যোগাযোগ করতে পারত। এদের 'হঙ' ব্যবসায়ী বলা হত। বিদেশী বণিকদের সাথে ব্যবসা করার ব্যাপারে এই 'হঙ'-দেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। এরা কেবলমাত্র ক্যান্টন প্রদেশের শাসকের কাছে দায়বদ্ধ ছিল। বিদেশী বণিকদের শহরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতে হত এবং অন্য কোনো চিনা নাগরিকের সাথে মেলামেশা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। বলতে গেলে,

নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদেই তাদের এই রক্ষণাত্মক অবস্থান। আসলে যান্ত্রিক বিপ্লবের পরে ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব বাড়তে দেখা যায়। তার ওপর ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে পাশ্চাত্য শক্তির অনুপ্রবেশ, জাপানে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের বিদ্রোহ, সর্বোপরি চিনের প্রতিবেশী ভারতের পরাজয় চিনকে আরও বেশি মাত্রায় রক্ষণশীল করে তোলে।

কিন্তু এত কঠিন বাধানিষেধ সত্ত্বেও চিনের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাড়তেই থাকে। কিন্তু অন্যদিকে এই বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে চিনের সাথে এইসব পাশ্চাত্য দেশগুলোর বাণিজ্য ঘাটতি বাড়তেই থাকে। তারা খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে। তারা এই বাণিজ্যিক ঘাটতি মেটাবার কোনো রাস্তাই খুঁজে পায় না। চিনের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য তাদের পাশ্চাত্য দেশগুলোর কাছ থেকে কোনো কিছুরই আমদানি করার দরকার পড়ত না। ফলে চিন থেকে কোনো জিনিস আমদানি করতে হলে তাদের সেটা করতে হত নগদ সোনা বা রূপার বিনিময়ে। পাশ্চাত্য দেশের বণিকদের সেই সোনা বা রূপা সংগ্রহ করতে হত সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার পেরু বা চিলি থেকে রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে।

এরকম একটা অবস্থার মধ্যে আঠারো শতকের মাঝামাঝি ইংরাজরা আবিষ্কার করে যে,চিনে আফিম উৎপাদন হয় না। কিন্তু ঔষধ তৈরি করার জন্য চিনকে আফিম আমদানি করতে হয়। আফিম একদিকে ঔষধ অন্যদিকে আবার নেশার জিনিস, দু'ভাবেই কাজ করে। ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেখল, এই একটা জিনিস তারা চিনে রপ্তানি করতে পারে।

এদিকে ভারতে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিহারে বক্সারের যুদ্ধে বাংলা, অযোধ্যা ও মোগল সম্রাটের সম্মিলিত সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে বাংলার দেওয়ানি অধিকার পায়। তখন বাংলা বলতে সম্মিলিতভাবে অবিভক্ত বাংলা, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যাকে বোঝাত। ফলে এই বিরাট এলাকার রাজস্ব আদায় করা এবং উপরন্তু মুঘল সম্রাটের একচেটিয়া আফিম চাষের অধিকার পেয়ে যায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। কোম্পানি কলকাতায় আফিমের নিলাম শুরু করে, এবং তার লাভের অংক বাড়তেই থাকে। কিন্তু এদিকে চিনে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার ছাড়া আফিমের অন্য কোনোরকম বাণিজ্যিক ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরে নিষিদ্ধ। তাই ঔষধ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য আফিম আমদানি ছিল একদম নিষিদ্ধ। সবদিক দেখেশুনে কোম্পানি এক সুকৌশলী পদ্ধতি বানায় যার কিছুটা আইনানুগ হলেও বেশিরভাগটাই বেআইনি ছিল।

ক্যান্টন বন্দরে অবস্থিত 'ব্রিটিশ হং' নামে পরিচিত কোম্পানিগুলো যথা, ডেন্ট, জারডিন, মাথেসন এবং কতিপয় ভারতীয় পার্সী বণিকের ক্যান্টন (গুয়াংঝাউ) বন্দরে আফিম বিক্রি করার অনুমোদন ছিল। সবচেয়ে সফল ভারতীয় বণিকদের মধ্যে ছিলেন হীরজীভাই রুস্তমজী এবং অল্পমাত্রায় টাটা পরিবারের মতো কয়েকজন বণিক ক্যান্টনকে (গুয়াঙঝাউ) কেন্দ্র করে আফিমের ব্যবসা করত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তত্ত্বাবধানে তারা কলকাতায় নিলামে বাংলা ও মালওয়া এলাকায় উৎপন্ন আফিম সস্তাদরে কিনে চিনের ক্যান্টন (গুয়াংঝাউ) বন্দরে বিক্রি করার জন্য রওনা দিত। অনুমোদিত পরিমাণের থেকে অনেক বেশি পরিমাণ আফিম বহন করত এইসব জাহাজ, কেবলমাত্র চিনে আফিমের চোরাচালানের উদ্দেশ্যে। চিনের ক্যান্টন বন্দরে প্রবেশের আগে তারা ক্যান্টনের নিকটবর্তী লিনটিন দ্বীপে জাহাজগুলোকে নোঙর করে

চোরাই আফিম খালাস করত। লিনটিন দ্বীপটি ছিল আফিমের চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য। মূল ভূখণ্ড ও ক্যান্টন বন্দর থেকে একটু দূরে থাকার জন্য এখানে চিন সরকারের তেমন জোরদার নজরদারি ছিল না। এই দ্বীপে পড়ে থাকা অজস্র ভাঙা ও পরিত্যক্ত জাহাজ বা ভাঙা জাহাজের খোলের মধ্যে মজুদ রাখা হত এই চোরাই আফিম। এখান থেকেই সেই চোরাই আফিম ছোটো ছোটো নৌকায় চাপিয়ে ক্যান্টন ও অন্যান্য বন্দরে চালান করত চিনের চোরাচালানকারীরা। কোম্পানির ভারতীয় এজেন্টরা রূপার বিনিময়ে এই আফিম চিনের চোরাচালানকারীদের কাছে বিক্রয় করত। চোরাচালানকারীদের কাছে আফিম বিক্রি করে পাওয়া রূপা তারা ক্যান্টন বন্দরে অবস্থিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অফিসে জমা দিত। ইংরাজরা এই রূপার বিনিময়ে চিনা হং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চা কিনত। খালি জাহাজে তারা সেই চা ভরে নিয়ে পাশ্চাত্যের নানা দেশে রপ্তানি করত।

চিনে ইংরাজদের আফিমের ব্যবসা বাড়তেই থাকে। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজ সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতের সাথে একচেটিয়া ব্যবসা করার অধিকার বাতিল করে দিলেও আফিমের একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার কোম্পানির কিন্তু থেকেই যায়। ফলে সস্তা দামের আফিমে বাজার ছেয়ে যায়। কলকাতা থেকে আফিম আসত ১৫০ পাউণ্ড ওজনের পেটিতে। ফলে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে যেখানে ক্যান্টনে আমদানি করা আফিমের পেটির সংখ্যা ছিল ৯,৭০৮-টি, ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে সেটি বেড়ে গিয়ে পৌঁছায় ৩৫,৪৪৫ পেটিতে।

চিনে আফিমের লাগামছাড়া চোরাচালানের ফলে চিনের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের অলস ধনী ব্যক্তি থেকে শুরু করে চল্লিশ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে প্রায় নব্বই শতাংশ পুরুষ আফিমের ধূমপানের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। ব্যবসায়িক কাজকর্ম অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়, নাগরিক পরিষেবা প্রায় বন্ধের মুখে পড়ে এবং জীবনযাত্রার মানের অনেক অবনতি হয়। চিন সম্রাট ডাও গুয়াঙের বিশেষ আফিম-বিরোধী কমিশনার লিন জেসু-র (১৭৮৫ থেকে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) হিসাব অনুসারে চিনের কমপক্ষে চল্লিশ লক্ষ অধিবাসী এই মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ক্যান্টনে (গুয়াঙঝাউ) চিকিৎসারত জনৈক ইংরাজ চিকিৎসকের মতে মাদকে আসক্তের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ নয়, ছিল প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষের মতো। ১৮৩০-এর দশকে আমদানি করা আফিমের দাম মেটাতে চিন সরকারের কোষাগার থেকে ৩৪০ লক্ষ মেক্সিকান ডলার মূল্যের রূপা খরচ হয়। চিনের সাম্রাজ্যবাদী সরকার পাশ্চাত্য দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যে এই ভারসাম্যহীনতায় খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দের আগে পাশ্চাত্য দেশগুলো চিন থেকে তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মেক্সিকান ডলার (রৌপ্যমুদ্রা) মূল্যের বিভিন্ন মানের চা, রেশম ও জরির জিনিস আমদানি করত। অথচ, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে চিনে আমদানি করা দ্রব্যের শতকরা সাতান্ন ভাগই ছিল আফিম। লিন জে-সু হিসাব করে দেখেছিলেন যে, শুধু ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দেই চিনের আফিমসেবীরা প্রায় দশ কোটি 'টেয়ল' মূল্যের মাদকদ্রব্য সেবন করেছিলেন।

'টেয়ল' চিনদেশে রূপার ওজনের একটি মাপ। ক্যান্টন অঞ্চলে 'টেয়ল' অর্থে ৩৭.৫ গ্রাম পরিমাণ রূপা বোঝায়। অনেক শহরে 'টেয়ল'-এর ভিন্ন ভিন্ন মাপ আছে। যেমন, সাংহাইতে 'টেয়ল'-এর মাপ ৩৩.৯ গ্রাম পরিমাণ। বর্তমানে চিনে সরকারিভাবে 'টেয়ল' বলতে ৩১.২৫ গ্রাম পরিমাণ রূপা বোঝায়।

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিদেশী বাণিজ্যিক জাহাজগুলো, বিশেষ করে ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের

জাহাজগুলো প্রতি বৎসর তিরিশ হাজারেরও বেশি পরিমাণ আফিমের পেটি চিনের বন্দরে অবতরণ করাত। শুল্ক বিভাগের দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তারা এবং বন্দর ও শহরের লোভী ব্যবসায়ীরা ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে সমস্ত রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে অনৈতিকভাবে সম্পদ আহরণ করত। আমদানির সময় শুল্ক কর্মকর্তাদের সেদিকে ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ না রাখার জন্য পেটি প্রতি ৮০ টেয়ল ছিল তাদের স্বাভাবিক নজরানা। নিয়ম অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও ১৮২১ থেকে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আফিম আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় পাঁচগুণ। ক্যান্টন বন্দরের অনৈতিকতা, উৎকোচ আর চিন সম্রাটের কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্যহীনতা চিন ও ইংরাজ সরকারের মধ্যে অনিবার্য সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ লিন ক্যান্টনে পৌঁছে সব শুল্ক কর্মকর্তাদের কঠোর নির্দেশ দেন যে তারা যেন সমস্ত জাহাজে, বিশেষ করে ব্রিটিশ জাহাজগুলোতে মজুদ আফিম বাজেয়াপ্ত করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ইংরাজরা ১০৫৬ পেটি আফিম স্বেচ্ছায় সমর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু এই খবর পেয়ে লিন বিখ্যাত আফিম ব্যবসায়ী ডেন্টকে গ্রেফতারের আদেশ দেন।

প্রথম আফিম যুদ্ধ

চৈনিক বিশেষজ্ঞ টমাস অ্যালোম ও নিউয়েনহাম রাইট তাদের প্রণীত নানা গ্রন্থে সমগ্র চিনকে তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে বলে মন্তব্য করেন। শুধু এনারা নন, বেশিরভাগ ইউরোপীয় চৈনিক বিশেষজ্ঞরাই এই কল্পনার প্রচার করেছিলেন। দূর প্রাচ্যে ইংরাজদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারে এই ধরনের কল্পনার প্রচার করে দেশের মধ্যে জনমত তৈরি করে তারা পরোক্ষে ইংরাজ সরকারের নানা দুষ্কর্মে সহযোগিতা করত।

কিন্তু টমাস আর্ণল্ড নামে লিভারপুলের জনৈক ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ বিপরীত মন্তব্য করেছিলেন। আর্ণল্ড ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মার্চ উইলিয়ম হাল নামক জনৈক ঐতিহাসিককে লেখেন, 'চিনের সঙ্গে যুদ্ধ বলতে গেলে এতটাই দুর্নীতিপরায়ণ ছিল যে একে সম্ভাব্য সর্বাধিক মাত্রার জাতীয় পাপ হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায়। এই ব্যাপারটা আমার গভীর বেদনার কারণ। যে ভয়ংকর অপরাধ আমরা করেছি তার জন্য মানুষের মনকে আবেদন বা অন্য কোনোকমভাবে কি জাগিয়ে তুলতে পারি না? সত্য সত্যই আমি মনে করতে পারি না যে পৃথিবীর কোনো ইতিহাসে এর আগে এই ধরনের অবিচার ও অনৈতিকতাপূর্ণ যুদ্ধ ঘটেছে। আমার মতে সাধারণ বিজয় যুদ্ধ এর তুলনায় অনেক কম দুর্নীতিগ্রস্ত। চিন সরকার সামাজিক ও ব্যক্তিগত ন্যায়নীতি নষ্টকারী একটি মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করতে চেয়েছিলেন আর শুধুমাত্র লাভের মোহে পেশীবলে সেই মাদকদ্রব্যের চোরাচালান অব্যাহত রাখার জন্য এই যুদ্ধ। এই অনৈতিক যুদ্ধে আমাদের তথাকথিত শ্রেষ্ঠতার গর্ব তো পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া উচিত।'

রানি ভিক্টোরিয়ার আমলে ইংরাজদের এই ধরনের বেপরোয়া ব্যবহার শুধুমাত্র চিনে নয়, ভারত তথা এশিয়ার অন্যান্য দেশে এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে অন্যায়ভাবে নানা ছলে-বলে ও কৌশলে ইংরাজরা তাদের সাম্রাজ্যবিস্তার চিনা কর্মকর্তাদের সাথে অসহযোগিতা শুরু করে কারণ তাদের মতে বন্দিদের ওপর অত্যাচার করার জন্য নিয়মিতভাবে চিনাদের নিয়োগ করা হয়।

চিন সম্রাটের বিশেষ দূত লিন ঝে-সু ইংরাজ বণিক ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তিনি প্রায় ১৬০০ ব্যক্তিকে বন্দি ও এগারো হাজার পাউণ্ড পরিমাণের আফিম বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। ইংরাজ বাণিজ্য অধীক্ষক, চার্লস ইলিয়ট এ ব্যাপারে একটা সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন। যাই হোক, ওই বৎসরেই জুন মাসে লিন বিদেশীদের নিয়ন্ত্রিত কারখানায় মজুদ করে রাখা আরও কুড়ি হাজার পেটি আফিম বাজেয়াপ্ত করেন। শুধু তাই নয়, সমস্ত বিদেশী বণিকদের গ্রেপ্তার করে তাদের নব্বই লক্ষ ডলার মূল্যের আফিম সমর্পণ করতে বাধ্য করেন এবং সেই আফিম তিনি জনসমক্ষে অগ্নিতে ভস্মীভূত করে দেন। অবশেষে তিনি ক্যান্টন (গুয়াঙঝাউ) বন্দরটি বিদেশী বণিকদের কাছে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। পরিবর্তে চার্লস ইলিয়ট পার্ল নদী অবরোধ করেন। চিনের প্রচারকরা আসন্ন নৌযুদ্ধকে চিনের জয় হিসাবে ঘোষণা করলেও ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরের এই যুদ্ধে ক্যান্টন বন্দরের কাছে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভি চিনের অনেক জাহাজ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছিল। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইংরাজরা পার্ল নদীর মোহনায় অবস্থিত 'বোগ' (Bogue) দুর্গ অধিকার করে এবং ক্যান্টন বন্দরের স্থলভাগ অঞ্চল সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

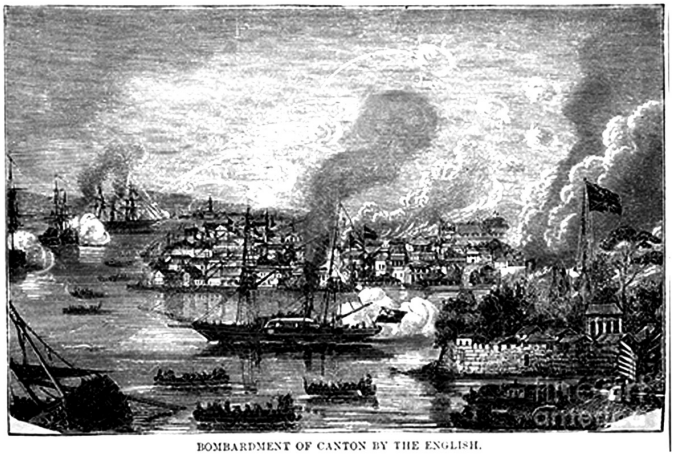
BOMBARDMENT OF CANTON BY THE ENGLISH.

এই যুদ্ধে ইংরাজ রাজশক্তির নির্দেশে ব্রিটিশ নৌবাহিনী কয়েকজন বিত্তশালী লোকের ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকা একটি কোম্পানির হয়ে চিনের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, তাও আবার তাদের আফিমের চোরাচালানের সমর্থনে। এরাই নাকি সারা পৃথিবীতে নিজেদের সবচেয়ে সভ্য জাতি বলে প্রচার করে। চোরের মায়ের বড়ো গলা।

বস্তুত, 'চা আমদানির জন্য আফিম রপ্তানি'-কে বৈধ করার জন্য ইংরাজদের এই যুদ্ধে প্রধান ভূমিকা ছিল রানি ভিক্টোরিয়ার নৌবাহিনীর। এই নৌবাহিনী চিনাদের কাঠের তৈরি জাহাজ, দুর্গ, নদীমুখ ও শহরের প্রাচীর সবকিছুর ওপরই রণপোতের একদিকে থাকা সমস্ত কামান একসাথে ব্যবহার করে। এই যুদ্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অল্প গভীর জলে ছোটো ছোটো দাঁড় টেনে চলার মতো 'নেমেসিস' নামে কিছু নৌকা দিয়ে ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে সাহায্য করেছিল। এই নৌকাগুলো লোহার কাঠামো দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। চিনের মান্ধাতা আমলের বড়ো বড়ো জাহাজগুলো সহজে বাতাস বা জোয়ারের মোকাবিলা করতে পারত না। কিন্তু 'নেমেসিস' নৌকাগুলো বাতাস বা জোয়ারের প্রতিকূলতা নির্বিশেষে সক্ষমভাবে কাজ করত। ফলে ইংরাজরা খুব শীঘ্রই পার্ল নদীর হংকং থেকে ক্যান্টন (গুয়াঙঝাউ) পর্যন্ত ও তার সঙ্গে নদীর অববাহিকা অঞ্চলও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। স্থলভাগে চিনাদের আদিম ধনুক ও

আগুনের গোলা ইংরাজেদের গাদা বন্দুক ও কামানের তুলনায় অতি তুচ্ছ প্রমাণিত হয়। লিন ঝে-সুকে অসম্মানের সাথে পিকিং-এ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিদেশী শয়তানদের মোকাবিলা করতে আসেন কুই-শান।

শান্তির মূল্য

১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে কুই-শান কার্যভার গ্রহণ করে ক্যান্টন (গুয়াঙঝাউ) বন্দরটিকে চিনের অধিকারে রাখার পরিবর্তে ইংরাজদের কাছ থেকে ষাট লক্ষ ডলার মূল্যের রূপা আদায় করেন মুক্তিপণ হিসাবে। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি ইয়াংসী নদীমুখ ও সাংহাই অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে ইংরাজদের নিয়ন্ত্রণে আসে এবং এই সময়েই ইংরাজরা চিনের সঙ্গে একের পর এক অসম চুক্তি করে চিনের বেশিরভাগ উপকূল এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে। চিন সরকার এই সমস্যার সমাধানের জন্য ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যার হেনরী পটিংজারকে ভারতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আফিম চাষ বন্ধ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে স্যার হেনরী উত্তরে জানান, যতদিন পর্যন্ত চিনে প্রচুর পরিমাণে আফিম-সেবী ও দুর্নীতিগ্রস্থ শুল্ক আধিকারিকরা থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ভারতে আফিম চাষ বন্ধ করে কোনো লাভ হবে না, কারণ চিনে আফিমের চাহিদা থাকলে এই ব্যবসা অন্য কারও হাতে চলে যেতে পারে। বোঝো ব্যাপার। ব্যবসা পাছে অন্য কারও হাতে চলে যায়, এই অজুহাতে আফিম চালানের মতো লাভজনক অনৈতিক ব্যবসা ইংরাজরা বন্ধ করতে রাজি নয়।

ইংরাজদের কাছে চিনের সামরিক পরাজয়ের পর ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজগুলো নানকিং আক্রমণের উদ্যোগ করে। ইংরাজ ও চিঙ্ সম্রাটের প্রতিনিধিরা শহরে নোঙর করা একটি যুদ্ধজাহাজে আলোচনায় বসেন। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অগাস্ট সেই যুদ্ধজাহাজেই নানকিং চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে হংকং দ্বীপটি চিনের হাতছাড়া হয় এবং ক্যান্টন (গুয়ানঝাউ), অ্যাময়, ফুচাউ, সাংহাই ও নিংবো এই পাঁচটি চুক্তিবদ্ধ বন্দরে চিনাদের একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার লুপ্ত করে পাশ্চাত্য দেশগুলোকে ব্যবসা করার এবং বসবাস করার অধিকার দেওয়া হয়। এছাড়াও ব্রিটেনকে ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের স্বীকৃতিপ্রদান ও লিন ঝে-সু কর্তৃক কুড়ি হাজার পেটি আফিম ভস্মীভূত করার জন্য পরাজিত রাষ্ট্র হিসাবে নব্বই লক্ষ ডলার পরিমাণ ক্ষতিপূরণও দিতে হয়। চিনের অভ্যন্তরে সরাসরি কেনাবেচার ব্যবসা করার অধিকার কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের ছিল না -- ওটা চিনেরই একচেটিয়া ছিল। এই চুক্তির ফলে তা লোপ পায় এবং ব্যবসায়ের জন্য মাত্র পাঁচ শতাংশ হারে শুল্ক নির্দিষ্ট হয়। এই চুক্তির ফলে চিনের মধ্যে পশ্চিমি বিদেশীদের ওপর চিনদেশের কোনো আইন প্রযোজ্য হবে না, পরিবর্তে তারা নিজ নিজ দেশের আইন দ্বারা পরিচালিত হবেন। এক কথায় বলতে গেলে চিনদেশের মধ্যে কোনো বিদেশী কোনো অপরাধ করলে তার বিচার চিনদেশের আইন অনুযায়ী হবে না, হবে অপরাধীর নিজের দেশের আইন অনুযায়ী। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সও চিন সরকারের কাছ থেকে অনুরূপ সুবিধা আদায় করে। আলোচনার মাধ্যমে শান্তি স্থাপিত হওয়ার সাথে সাথেই ব্যবসায়ীরা অল্পমূল্যে আফিম ফেরি করতে শুরু করে। এই আফিম যুদ্ধের পরে চিন নিজেই আফিম চাষ শুরু করলে এই মাদকদ্রব্যের পাচারের ওপর কোনোরকম বাধানিষেধ থাকল না। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে চিন যেখানে সাড়ে ছয় হাজার টন আফিম আমদানি করত, সে তুলনায় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে চিন নিজেই

বাইশ হাজার টন আফিম উৎপাদন করে।

স্বার্থান্বেষী ইংরাজ তথা পাশ্চাত্যের বেশিরভাগ দেশ সমৃদ্ধশালী চিনদেশের চা, রেশম বস্ত্র ও চিনামাটির জিনিসে নীতিহীন ব্যবসার নামে যথেচ্ছাচার লুণ্ঠনের মাধ্যমে যেনতেন প্রকারে লাভ করার প্রলোভনে নিজেদের স্বার্থে চিনকে শোষণ করতে শুরু করে। এমনকী, চাপে পড়ে আমেরিকায় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক রপ্তানির অনুমতিও দিতে হয়। মূলত এই বিরাট পরিমাণে সস্তা শ্রম আমদানি করার ফলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় আন্তর্মহাদেশীয় রেলপথ স্থাপন এত দ্রুত এবং কম খরচে করা সম্ভবপর হয়েছিল।

দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র ব্যবসায়িক লাভের জন্য চিনের মতো একটা সমৃদ্ধশালী দেশে চোরাপথে আফিমের মতো মাদকদ্রব্য পাচার করার জন্য ইংলণ্ডের রাজশক্তি চিনের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ করেছিল। এই যুদ্ধ সম্ভবত মানব ইতিহাসে সবথেকে কলঙ্কময় অনৈতিক যুদ্ধ।

এল্টজ্ ম্যানর এর রহস্য

দিব্যেন্দু মল্লিক, ২০০৬, *ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকম*

অমিত আর মীনা কানাডাতে এসেছে বেশ কিছু বছর, কিন্তু এখানকার সুবিশাল কেন্দ্রীয় আর প্রাদেশিক পার্কগুলোতে ট্রেকিং এর আকর্ষণটা ওদের ঠিক দুবছর আগে থেকে ধরেছে। মীনার অফিসে এক সহকর্মী ওদের শীতকালীন ট্রেকিং এর জন্য একটা পাহাড়ের সন্ধান দিয়েছিল। বলেছিল একবার হেঁটেই দেখ, ভাল লাগবে প্রকৃতির অন্য রূপ, বরফে ঢাকা পাহাড়ে ওঠার পথ, আর পথের শেষে পাহাড়ের ওপর থেকে অসাধারণ দৃশ্য। প্রথমবার বেশ অসুবিধা হয়েছিল যদিও মাত্র দু কিলোমিটার পথ। কিন্তু ওষুধটা ধরে গেছিল। তারপর থেকে ফাঁক পেলেই দুজনে কোন একটা পার্ক বা সংরক্ষিত বনভূমিতে (Conservation area) হাঁটতে বেরিয়ে পড়ে। এর জন্য ট্রেকিং এর কিছু জিনিস পত্র কিনতে হয়েছে অবশ্য। দুটো ব্যাকপ্যাক (দরকারী জিনিস পত্র, ফার্স্ট এড, জল, আর খাবার রাখার জন্য), ট্রেকিং পোল, আর ভাল জুতো। তবে দুজনের কর্মব্যস্ত জীবনে এই ছোট সফরগুলো গরমের দিনের কালবৈশাখীর কাজ করে। কানাডাতে জনবসতি কম আর চেনা পরিচিত বাঙালি সমাজের প্রভাবও অনেক কম, অনেক বাঙালি বন্ধু আর পরিচিত লোকজন থাকা সত্বেও। তা ছাড়া বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণও এখানে অনুপস্থিত। তাই কানাডাতে মনোরঞ্জনের সবচেয়ে ভাল উপায় বোধহয় এখানের অসামান্য প্রকৃতির সাথে নিজেকে পরিচিত করানো। মীনা আর অমিতও নিজেদের নতুন বন্ধু খুঁজে পেয়েছে প্রকৃতির কোলে থাকা পশুপাখি আর জল-জঙ্গলের মধ্যে।

এবারের যাত্রাটা একটু হঠাৎ করেই প্ল্যান করা হয়েছে। অ্যালগনকুইন (Algonquin) পার্ক কানাডার অন্টারিও (Ontario) রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্ক। পার্কটি ৭৭০০ বর্গ কিলোমিটারের এর থেকেও বড়ো, আর অনেক অংশেই এখনও মানুষের পা পড়ে নি। পার্কের কিছু অংশ সাধারণ মানুষের জন্য খোলা, ট্রেকিং এর জন্য অনেক বনপথ বা ট্রেল (trail) হেঁটে বা সাইকেলে উপভোগ করার জন্য রয়েছে। পার্কের বুক চিরে 'হাইওয়ে-৬০' চলে গেছে। যাদের বনপথে নেমে হেঁটে দেখার সুবিধে বা ইচ্ছে নেই, তাদের এই সড়ক দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেলেও প্রকৃতির অনেক রূপ চোখে পড়বে। এই সড়কের দুই দিকে অনেক ট্রেল পার্কের জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে। ট্রেলের শুরুতে বোর্ডের ওপরে লেখা থাকে কতটা পথ হাঁটতে হবে, ট্রেকিং কতটা কঠিন (পাহাড়ী পথ, ঘন জঙ্গলের শিকড় বাকলে পূর্ণ পথ, আর দীর্ঘ পথ অনেক সময় "difficult" বলে চিহ্নিত থাকে), আর কি ধরনের প্রাকৃতিক বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। এই রকমেরই একটি দশ কিলোমিটারের difficult ট্রেল এবারে মীনা পছন্দ করে নিয়েছে তাদের ট্রেকিং-এর জন্য। দু বছরের অভিজ্ঞতায় ওরা easy থেকে medium হয়ে অবশেষে difficult ট্রেলে উন্নীত হয়েছে বলে ওদের মনে

হয়েছে। ট্রেলের নাম Centennial Ridge, পাহাড়ের ওপরে ওঠা, পাহাড়ের ধার (ridge) ধরে ধরে হাঁটা, আবার নামাওঠা — মোটামুটি চার থেকে ছ ঘণ্টা লাগবে, মাঝখানে খাওয়ার আর বিশ্রামের কিছু সময় নিয়ে। তবে মীনার সেই সহকর্মী পইপই করে বলে দিয়েছে আবহাওয়া খারাপ দেখলে প্ল্যান বাতিল করতে কারণ অমিত আর মীনা এখনও অনেক ব্যাপারে বেশ অজ্ঞ।

হঠাৎ করে প্ল্যান করলে যা হয়, অফিসের ছুটি পাওয়া যায় নি, আর জিনিসপত্রও ভাল করে গোছানোর সময় নেই। সর্বোপরি পার্কটা ওদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূর বলে তার কাছাকাছি একটা হোটেল বুক করে এক রাত্রি থাকারও বন্দোবস্ত করে ওঠা হয় নি। উপরন্তু এটা "fall time", যখন শরতের শেষে পর্ণমোচী গাছের পাতা হলুদ আর লাল রঙের এক অসাধারণ রামধনু তৈরি করে, আর সেই সৌন্দর্য্য দেখতে সারা রাজ্য আর দেশবিদেশের লোকজন এই পার্কে ভিড় করে। তাই শেষ মুহূর্তে হোটেল পাওয়া প্রায় অসম্ভব বলাই চলে। আর দু একটা যা ঘর পাওয়া যায়, এত দাম যে হাত দেওয়া যায় না। ইন্টারনেট-এ অনেক খুঁজে অমিত একটা পুরানো ছোট হোটেল খুঁজে পেল, যাকে প্রকৃত অর্থে সরাইখানা বলা যায়। নাম এল্টজ্ ম্যানর (Eltz Manor)। ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্যের একটা পুরানো দোতলা বাড়ি, যার কয়েকটা ঘর ভাড়া দেওয়া হয়। তবে পার্ক থেকে মাত্র সত্তর কিলোমিটার দূরে (কানাডার হিসেবে এটা খুবই কম দূরত্ব), আর এক রাত্রির ভাড়াটাও বেশ কম। যদিও ঘরগুলোর ছবি দেখে খুব একটা ভক্তি জাগে না, তবু দুজনের মোটামুটি ভাল লাগলো। সকালে উঠেই ট্রেলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে, তাই মাত্র এক রাত্রের ব্যাপার। মুশকিলটা হল হোটেলটা কোন প্রতিষ্ঠিত ট্রাভেল ওয়েবসাইট থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। খানিকটা কাকতালীয় ভাবে একটা অনলাইন ফোরাম-এর পাতা থেকে হোটেলের নাম, কয়েকটা ছবি, আর ফোন নম্বর পাওয়া গেল। ফোরাম-এর পাতাটা প্রায় ছ-বছরের পুরানো, তাই বেশ সন্দিহান হয়েই ফোন করল অমিত। কিন্তু একজন বয়স্ক মহিলা ফোন ধরলেন এবং একটা ঘর বুকও করে দিলেন।

"ব্যাপারটা বুঝলাম না। ভাড়া তো যা ফোরাম-এর পেজে দেখলাম, তারও অর্ধেক। গুগল ম্যাপেও ঐ লোকেশন এ কোন হোটেল দেখাচ্ছে না। ব্যাপার টা বুজরুকি নয় তো ?" অমিত একটু চিন্তায় পড়ে।

"হতে পারে কোভিড-এর জন্য ওদের পসার কমে গেছে। আর অনেক পুরানো হোটেল রেষ্টুরেন্টই তো গুগল ম্যাপে পাওয়া যায় না। গলা শুনে কি রকম লাগলো?" – মীনা বলে।

"ভালই মনে হল। মহিলার নাম অ্যানাবেল। বললেন ক্রেডিট কার্ড লাগবে না, এসে ক্যাশ পে করতে পারি, তাই অনলাইনে চুনা লাগছে না কিছু।"

"ওহ তার মানে ঐ ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে আর কি। যাকগে, আমাদেরও কম পড়বে। অনেক ট্যাক্স দি অলরেড়ি" – মীনা খুশি হয়ে যায়।

সেপ্টেম্বরের শেষ শুক্রবার। অফিস শেষ করে বেরতে বিকেল ছটা বেজে গেল। এখনও সাড়ে সাতটা অব্দি রোদ্দুর থাকে এখানে, তবে যত ডিসেম্বরের দিকে এগোবে, ততই দিনের দৈর্ঘ্য কমবে, আর রাত্রি বাড়বে। ডিসেম্বর জানুয়ারিতে বিকেল চারটেতে দিনের আলো চলে যায় আর সকাল আটটার আগে সূর্যের দেখা মেলে না। কিন্তু আজ যেন আবহাওয়াটা কিরকম। এত মেঘ, মাঝে মধ্যে বৃষ্টি, আর কুয়াশা। মীনা গাড়ি চালাতে গিয়ে বুঝতে পারছিল এই দিনের আলোটুকু চলে গেলে বেশ বিপাকে পড়বে। সামনের গাড়ি

বেশ কষ্ট করে চোখে পড়ে, রাস্তার লেন মার্কিং বোঝা যায় না, আর বেশি জোরে গাড়ি চালানো মুশকিল। এখানে হাইওয়েতে স্পীড লিমিট একশ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা, আর গুগল ম্যাপ বলছে চার ঘণ্টা লাগবে এই গতিতে চললে, কিন্তু মীনা আশি কিলোমিটারের বেশি গতি তুলতে পারছিল না। বোঝা গেল হোটেলে পৌঁছতে রাত এগারোটা বেজে যেতে পারে।

মুশকিল হচ্ছে গ্রাম বা শহরতলির দিকে লোকজন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে, রাত নটা-দশটার মধ্যে। তাই অমিত হোটেলে একটা ফোন করল তাদের বিলম্বের কথা জানিয়ে। এক মহিলা কণ্ঠ ভেসে এল – "আপনাদের এই নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, আমার ঘুম আসতে দেরি হয়। আমি আপনাদের অপেক্ষা করব।" (পাঠক দের স্বার্থে বাংলায় অনুবাদ করে) অমিত ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন কেটে দিল।

"তোমাকে বলেছিলাম এবারের ট্রেকিংটা বাদ দিতে। এভাবে চট্ করে বেরিয়ে গেলে অনেক অসুবিধা হয়ে যায় । আমাদের জন্য এই বয়স্ক মহিলাকেও এখন জেগে থাকতে হবে" – অমিত একটু রেগেই বলে ওঠে মীনাকে।

"তুমিই তো হোটেলটা খুঁজে পেয়ে বুক করলে। এখন আমাকে দোষ দিচ্ছো কেন? এটা কাটিয়ে দিলেই আর বেরতম না আজ!" মীনা ফুঁসে ওঠে। ওকেই গাড়িটা চালাতে হচ্ছে সারাদিন অফিসের পরে। অবশ্য এটা অমিতকে বললে ও স্টিয়ারিং নেওয়ার চেষ্টা করবে। মুশকিল হচ্ছে অমিত খুব rough গাড়ি চালায়, ভারতে অনেক দিন গাড়ি চালানোর অভ্যাস। আর এই বাদলা-কুয়াশার দিনে মীনা একদম ঝুঁকি নিতে চায় না।

কিছু কথা কাটাকাটি হওয়ার পর দম্পতি চুপ করে যায় । দুজনেই মনে মনে জানে দুজনের পাগলামি একই রকম। এক হাতে তো তালি বাজে না। তাই দোষ দিয়ে লাভ নেই।

গুগল ম্যাপে পথের হদিসটা অমিতই রাখছিল। মীনা সামনে রাস্তায় পুরোমাত্রায় মনোনিবেশ করছিল, একটু এদিক ওদিক হলেই অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। এখানে অনেক ড্রাইভারই খুব জোরে গাড়ি চালায় আর এই রকম দিনে অ্যাক্সিডেন্ট ভালই হয়। অমিত লক্ষ্য করল রাস্তাটা এবার হাইওয়ে থেকে কান্ট্রি রোডে (Country road) ঢুকে যাবে। কান্ট্রি রোডগুলো শহরের বাইরে ক্ষেত খামার আর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে, আর অনেক সময়তেই স্পীড লিমিট থাকে না, বা থাকলেও লোকজন মানে না। কাজেই গাড়ি চালানোটা আরও মন দিয়ে করতে হবে। এখানে শহরের বাইরে অ্যাক্সিডেন্ট হলে পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্স আসতে অনেক সময় নেয়। মীনা সাবধানী, তাই খারাপ আবহাওয়াতে কান্ট্রি রোড পারলে এড়িয়ে যেতেই ভালোবাসে । অমিত জানিয়ে দিল ঝামেলাটা – "পরের তিনঘণ্টা প্রায় পুরোটাই কান্ট্রি রোড দিয়ে যেতে হবে"।

"কোন মুলুকে হোটেল নিয়েছ? এই ভুতুড়ে জঙ্গলের রাস্তায়, কুয়াশা আর বৃষ্টি, দারুন কম্বিনেশন!" মীনা ঝাঁঝিয়ে ওঠে। কিন্তু কিছু করার নেই, গুগল ম্যাপ দেখেও আগে থেকে রাস্তা কি রকম সেটা বোঝা যায় না। চালিয়েই বুঝতে হয়। তাই মীনা আবার রাস্তায় মনোনিবেশ করল।

আর এক ঘণ্টা চলার পর মীনার একটা অস্বস্তি শুরু হল। জঙ্গলের রাস্তায় এমনিতেই গাড়ি কম থাকে, কিন্তু গত পনের মিনিটে সে আর একটাও গাড়ি দেখতে পায় নি। এত কম গাড়ি দেখলে তার একটু অস্বস্তি

হয়, কেমন যেন একা লাগে। কিছু হলেও কারুর থেকে সাহায্য পাওয়ার উপায় নেই, কোথায় দোকানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়ার জো নেই। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে কোথায় একটা নির্মম ভাব থাকে যেটা মীনা উপলব্ধি করে কিন্তু ঠিক প্রকাশ করতে পারে না। এই ভয়ংকর সুন্দরকে ঠিক আপন করে নেওয়া যায় না, আবার ছেড়েও থাকা যায় না। প্রকৃতির রোষে আজ কোন ঝামেলা হলেও তাদের পক্ষে কোন সাহায্য যোগাড় করা দুষ্কর।

সেটা অবশ্য মীনা জানে। কিন্তু আজ ব্যাপারটা একটু অন্য লাগছে। মীনা আর অমিত দুজনেই ছোট শহরে বড়ো হয়েছে। সন্ধ্যেবেলাতে ঝাঁপ ফেলে দেওয়া শহরের পাশেই ক্ষেত আর বনভূমি দেখে তারা অভ্যস্ত, আর অন্ধকারের কাহিনী সাথে ভালই পরিচিতে। ছোটবেলাতে অনেক রকম কল্পনা আর গল্প থেকে ভূতের ভয়, অন্ধকারের ভয়, আর অজানার ভয় ভালই পেয়েছে। কিন্তু সেগুলোর সাথেই বড়ো হয়েছে বলে কোথাও সেটা অনেক পরিচিত। অনেকদিন সেই পরিচিত অনুভূতি আর পেতে হয় না, কারণ কলকাতাতে বা কানাডার বড়ো শহরে আলো আর শব্দের ভিড়ে সেই অনুভূতি বহুদিন লোপ পেয়েছে। আজ অনেক অনেক দিন পরে যেন সেই অনুভূতিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। দুদিকে গহন জঙ্গলের মধ্যে, অন্ধকারের মধ্যে, ওদের গাড়িটা কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। গাড়ির হেডলাইটের আলো অন্ধকার আর কুয়াশা কে দূর করতে পারছে না।

"আর কতক্ষন?" মীনা অস্বস্তি কাটাতে প্রশ্ন করে।

"আরও দু ঘণ্টা এভাবেই যেতে হবে। আমি খানিকক্ষণ চালাব? তুমি একটু রেস্ট নাও।"

একবার মনে হল অমিতকে চালাতে দিলেই ভাল হয়। কিন্তু তারপর মনে হল এতে বাইরের প্রকৃতি নিয়ে বোধহয় ভাবার অবসরটা বেড়ে যাবে। তাতে অস্বস্তি বাড়বে বই কমবে না। তাই মীনা অস্বস্তিটাকে সইয়ে গাড়ি চালাতে লাগলো। আর তো মোটে দুটো ঘণ্টা।

পুরানো অনুভূতি থেকে মীনার পুরানো একটা স্মৃতি মনে পড়ে গেল। একটা ভূতের গল্প। একটা ছোট মেয়ের গল্প যেখানে মেয়েটা ছোটবেলাতে মাঠে খেলতে খেলতে একটা বীভৎস মুখ দেখেছিল একটা ঝোপের আড়ালে, তারপর সেই মুখটা অনেক দিন ধরে তার পিছু নিয়েছে, আর একদিন বুড়ো বয়েসে তাকে সাথে নিতে আসে সেই মুখ। গল্পটা বেশ ভয়ের, আর সেটা মনে থাকার কারণ মীনা ছোটবেলাতে অন্ধকারে এইরকম এক মুখ দেখেছিল একবার। মুশকিলটা হল মীনা আরও অনেক কিছু অন্ধকারে দেখেছে, তাই এটা নিয়ে আলাদা করে মাথা খারাপ করার প্রয়োজন বোধ করে নি। ছোটদের কল্পনা বেশ উর্বর, আর তারা অনেক কিছু দেখে যা বড়োরা পারে না।

মীনার একটু হাসি পেয়ে গেল এই স্মৃতিটা মনে পড়তে। অনেকদিন এই ধরনের গা ছমছমে অনুভূতি তার আসে নি। সে মনে মনে নিজেকে বলল – "মীনা, এখনও একটুও বড়ো হোসনি। অমিত জানতে পারলে রোজ প্যাঁক দেবে"। অমিত আর মীনা বাল্যকালের বন্ধু, তাই এখনও একে অপরের পিছনে লাগতে ছাড়ে না।

"ঐ দেখ! একটা কায়োটি (Coyote)!" অমিত ওর চিন্তা সুত্রকে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

মীনা দেখল একটু দূরে রাস্তার পাশে একটা কায়োটি (উত্তর আমেরিকাতে ক্যানাইন গোত্রের শেয়াল

জাতীয় প্রাণী, ধূসর নেকড়ের মত কিন্তু ছোট আকারের) দাঁড়িয়ে ওদের গাড়ির দিকেই আসছে। দৃশ্যটা অদ্ভুত কিছু না কারণ জঙ্গলে কায়োটি বেশ ভালই মেলে, কিন্তু তারা গাড়ি বা লোকজন দেখলে সচরাচর কাছে ঘেঁষে না। তাই এত কাছে এভাবে কায়োটি দেখতে পেয়ে বেশ ভালই লাগলো মীনার। গাড়ি বেশ আস্তে চলছিল বলে অমিত একটা ছবি তুলে নিল চট্ করে। ওর ফোনের ক্যামেরাটা ভাল, অন্ধকারে কুয়াশার মধ্যেও ভালই ছবি উঠল।

"ডান দিকে একটা ওপেনিং আসবে, কান্ট্রি রোড এইট, ওটা নিয়ে নাও" – অমিত নির্দেশ দিল গুগল ম্যাপ দেখে। মীনা ডানদিকের রাস্তায় গাড়ি ঘুরিয়ে নিল । এই রাস্তাটা একটু পরে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা ভুট্টার ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলতে লাগলো।

"এই এক-মানুষ উঁচু ভুট্টার গাছগুলো দেখতে বেশ ভয়ংকর লাগে না রাত্তিরে?" – অমিত প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, যত ভূতের গল্প তো এই সব ভুট্টার ক্ষেতেই ফেলে। তুমি আমাদের নিয়ে ফেল না আবার! আর কত টা?" মীনার অস্বস্তি বেড়েই গেল। কিন্তু অমিতকে বললে হাসবে নিশ্চয়ই।

"আর এক ঘণ্টার মত বাকি। এই রাস্তাটাই গ্রামে ঢুকিয়ে দেবে। ওখানেই হোটেল"

মীনা আর প্রশ্ন না করে গাড়ি ছোটাতে লাগলো।

"আর একটা কায়োটি!" মীনা অমিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করালো ক্ষেতের পাশে – "এখন বোধহয় সবাই খাবার সন্ধানে বেরিয়েছে"।

অমিত বিনা দ্বিধায় আর একটা ছবি তুলে নিল। ছবি তুলতে ভীষণ ভালোবাসে অমিত। ওর কথায় স্মৃতির ওপর নির্ভর করা যায় না, কিন্তু ছবি স্মৃতির একটা স্ন্যাপশট তুলে রাখে।

আরও মিনিট চল্লিশ গাড়ি চালিয়ে ওরা বাড়ি ঘর দেখতে পেল। মীনা একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল । মানুষজন আছে আশে পাশে এটা ভাবতেও ওর ভাল লাগে। যদিও এখানে বেশীর ভাগ গ্রামে ঢোকার সময় প্রথম যেটা পথে পড়ে সেটা হল কবরখানা, যেটা খুব একটা সুখকর অনুভূতি নয়। এবারেও তার অন্যথা হয় নি। একটা ভুতুড়ে কবরখানা, পাশেই একটা ততধিক ভুতুড়ে পুরানো চার্চ। কোন মানুষ নেই ধারে কাছে, দু-চারটে বাড়ি যা চোখে পড়ছে, সব অন্ধকারে ঢাকা। এখানে রাত্রিযাপন করতে বেশ আপত্তিই আছে মীনার। কিন্তু আজ আর কিছু করার নেই।

আরও বেশ কিছুক্ষণ লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর আবার বাড়ি ঘর হালকা হতে শুরু করল। বোঝা গেল গ্রাম ছাড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি।

"ব্যাপার কি? তোমার হোটেল কোথায়?" মীনা অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করল।

"এসে গেছি। পরের বাঁকে বাঁদিকে"

যথারীতি গ্রামের সীমানা পেরোতে না পেরোতে আর একটা ভুতুড়ে চার্চ আর একটা কবরখানা চোখে পড়ল মীনার। আর তার ঠিক পরে বাঁদিকে বেঁকে সেই হোটেল, এল্টজ্ ম্যানর। ছবি দেখে চেনা গেলেও ছবির সাথে বিস্তর ফারাক। বাড়ির গা বেয়ে আইভি লতা উঠেছে। বাড়ি ঘিরে এখন অনেক বুনো গাছ। পিছনের বাগানটাও পরিচর্যার অভাবে জঙ্গল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে বাড়ির বাইরে আর বেশ কয়েকটা জানালাতে আলো জ্বলছে, আর সামনে কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা আছে। বোঝা যাচ্ছে লোকজন আছে । একটু স্বস্তি পেয়ে

মীনা গাড়ি পার্ক করল। তারপর দরজার বেল বাজাল

এক বয়স্কা ইউরোপিয়ান ভদ্রমহিলা দরজা খুললেন। কথা বলে বোঝা গেল ইনিই অ্যানাবেল। ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ভদ্রমহিলার যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে সেটা হল চোখ দুটোর সাদা অংশটা অস্বাভাবিক রকমের হলুদ। মীনা একটু অদ্ভুত ভাবে চেয়ে ছিল দেখে ভদ্রমহিলা বোধহয় বুঝেই হেসে বলে উঠলেন – "গত ছ-বছর ধরে ইনসমনিয়া তে (Insomnia) ভুগছি, ঘুম আসে না। চোখগুলো খোলা থেকে থেকে সাদা রঙটাই চলে গেছে"। অমিত অপ্রস্তুত হয়ে বলে উঠল – "তাও আমরা ক্ষমা চাইছি আপনাকে এত রাতে কষ্ট দেওয়ার জন্য।"

ভদ্রমহিলা ওদের কাছ থেকে কোন পরিচয়পত্র চাইলেন না, আর একটা চাবি দিয়ে বললেন – "আপনাদের জন্য রুম ২০৪ এ সব ব্যবস্থা করে রাখা আছে। হোটেলে ফ্রী কফি পাবেন চব্বিশ ঘণ্টা। আপনাদের কফির জায়গা আর ঘরটা দেখিয়ে দিচ্ছি"। মীনা একবার কনুই এর গুঁতো মারল অমিত কে ইশারা তে বোঝানোর জন্য – "ট্যাক্স ফাঁকি"। অমিত আবার অপ্রস্তুত হয়ে ভদ্রমহিলার পিছন পিছন বাড়ির ভিতরের দিকে এগিয়ে গেল।

এখানে পুরানো বাড়িগুলো ওয়ালপেপারে ভরা থাকে, আর প্রচুর দরজা থাকে, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গাতে যাওয়ার জন্য। একতলাতে কিচেনের দুটো দরজা, করিডোরের দুদিকে দরজা। এইরকমই একটা দরজা খুলে করিডোরের ধারে আর একটা ছোট কিচেন, যেখানে একটা মাইক্রওয়েভ ওভেন আর কফি বানানোর সরঞ্জাম রাখা আছে। কিচেন এর সামনে একটা বড়ো পোর্ট্রেট। একজন কঠোর মুখের সাদা লোক, মাথায় একটা মিলিটারী টুপি। ভদ্রলোকের মুখের বাম দিকে একটা বড়ো কাটা দাগ যেটা চোখের নিচে থেকে ঠোঁট পর্যন্ত নেমে এসেছে। "আমার স্বামী, প্রাক্তন মিলিটারী ক্যাপ্টেন। বছর ছয়েক আগে কোথাও চলে গেছেন। আর ফিরে আসেন নি" – শেষের অংশটা বলার সময় অ্যানাবেল-এর স্বরটা একটু ধরে আসে। মীনা আর অমিত কোন প্রশ্ন করে না। এর পরে কিছু প্রশ্ন করা যায় না।

কিচেন পেরিয়ে আর একটা দরজা, তারপর আর একটা করিডোর পেরিয়ে আবার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দোতলা। সেখানে একটা করিডোর পেরিয়ে বাঁদিকে রুম ২০৪। মীনার ইতিমধ্যেই একটু গুলিয়ে গেছে কোথা দিয়ে বাড়িতে ঢুকেছে আর কোথায় কিচেন। অমিতকে দেখেও সন্তোষ জাগলো না। যা হোক, ওরা ঘরে ঢুকে অবশেষে একটু জিরোনোর সুযোগ পেল।

ঘর টা বেশ ছোট। একটা কুইন বেড আর একটা টেবিল যার খান চারেক ড্রয়ার আছে। টেবিলের ওপরে একটা টিভি। সাথে বাথরুমটা মোটামুটি পরিষ্কার। বাড়িটা যে বেশ পুরানো সেটা বোঝা যায় কারণ ঘরের দেওয়াল আর সিলিং-এ হালকা ফাটল ধরেছে, আর সেগুলো ওয়ালপেপার দিয়ে ঢাকারও চেষ্টা হয় নি। অমিত একটু হাসলো, যা টাকা নিচ্ছে ঠিকই আছে।

একটু সাফ সুতরো হয়ে ওরা একটু খেয়ে নিল । বাড়ি থেকে কিছু খাবার এনেছিল কারণ জানাই ছিল এত রাতে কোন রেষ্টুরেন্ট খোলা পাবে না। তারপর শুয়ে পড়ে মীনার চোখে পড়ল টিভির পাশে হোটেলের একটা ব্রোশার (brochure) রয়েছে। মীনা সেটা খুলে বসল। এতখানি পথ গাড়ি চালিয়ে চট করে ঘুম আসে না।

প্রথম পাতায় দরকারী ফোন নম্বর আর কিছু আপদকালীন নিয়মাবলী দেওয়া যেমন অন্যান্য হোটেল এ থাকে। কিন্তু পরের পাতা টা অন্যরকম। এই পাতায় ছোট করে এল্টজ্ ম্যানর এর ইতিহাসটা লেখা। মীনা পড়া শুরু করল। অমিত ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। অমিতের এটা একটা প্রতিভা, যেখানে ইচ্ছে যখন ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। মীনা পারে না।

হোটেলটা ১৮৯১ সালে সরকারী রেল অফিস হিসেবে তৈরি হয়েছিল (মীনা ভাবল "তাই না এমন গোলকধাঁধা! সরকারী অফিস বলে কথা")। তখন এই গ্রামের মধ্যে দিয়ে রেলপথ বিস্তার হচ্ছিল বলে অফিসেরও দরকার পড়েছিল। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সেই অফিস বন্ধ হয়ে যায় কারণ এই রেলপথ তৈরির কাজ মাঝ পথে বন্ধ হয় স্থানীয় কিছু লোকজনের ঝামেলাতে। তাদের মতে রেলপথের জন্য জঙ্গল আর প্রকৃতি ধ্বংস হচ্ছিল ("হ্যাঁ এইভাবেই দেশে অনেক কিছুই বেশি দূর এগোয় না" – মীনা)। এর পর অফিসটা একজন স্থানীয় ব্যবসাদার জলের দরে কিনে নিয়ে এটাকে হোটেল বানিয়ে দেন। কিন্তু হোটেলে কেমন করে যেন একদিন আগুন ধরে যায় আর অনেক মানুষ মারা যায়। হোটেলের খারাপ নকশা ("না বললেও চলত") আর তখনকার দিনের অগ্নিনির্বাপনের পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাকে এর জন্য দায়ী করা হয়েছে। বদনামের জন্য হোটেল সারানোর পরেও তার পসার আর ফেরেনি। প্রায় 50 বছর হোটেল এভাবেই পড়ে ছিল। তারপর ওয়াগনার পরিবার বাড়িটা কিনে নিয়ে আবার ঢেলে সাজিয়ে "bed and breakfast" হিসেবে শুরু করে এল্টজ্ ম্যানর নামে ("ঐ অ্যানাবেলও নিজের পদবী ওয়াগনার বলেছিল না?")। "bed and breakfast" হিসেবে ভালই চলছিল এল্টজ্ ম্যানর কিন্তু ১৯৯৯-এ স্টিফেন ওয়াগনার, তত্কালীন মালিক, হঠাৎ করে হারিয়ে যান। পুলিশ তার সন্ধান বা দেহ কোনোটাই পায়নি। তার স্ত্রী অ্যানাবেল ("আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপার") দায়িত্ব নেন আর এটাকে হোটেলে পুনরায় পরিবর্তন করেন কারণ "bed and breakfast" চালানোর মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কোভিডের জন্য কিছু অসুবিধা হয়। কিন্তু হোটেল এখনো তার ইতিহাস নিয়ে বর্তমান। শেষের লাইনে মজা করে বলা আছে – অতিথিরা চোখ কান খোলা রাখলে ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা দু-একটা ভূত হয়তো এখনো দেখা যেতে পারে।

ইতিহাসটা পড়ে মীনার মন একটু খারাপ হয়ে গেল। ভদ্রমহিলার স্বামী হারিয়ে গেছেন আর সেই কেসের এখনো কিনারা হয় নি ("দাঁড়াও দাঁড়াও, উনি বলেছেন ছবছর ওনার ঘুম আসে না। আর ওনার স্বামী হারিয়েছেন ঐ ছ বছরের ওপর। তাহলে ওনার হারিয়ে যাওয়ার পর থেকেই অ্যানাবেল ঘুমোতে পারেন না। না জানি আরও কত প্রতিকূলতার সাথে যুঝতে হয়েছে ওনাকে!") । মীনা বেশ কষ্ট পেল। ইসস, আর ও

ভাবছিল ট্যাক্স ফাঁকি আর না জানি কত কি। নিজেকে একটু ছোট লাগলো।

হোটেলের ইতিহাস আর অ্যানাবেল এর কথা ভাবতে ভাবতে কখন দু চোখ বুজে এসেছিল মীনা বুঝতে পারে নি। ঘুম ভাঙল একটা শব্দে। শব্দটা হয়েছে হাত থেকে ব্রোশারটা মাটিতে পড়ে যেতে। ওটাকে হাতে নিয়েই মীনা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ব্রোশারটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে ওর চোখে পড়ে ওর পিছনের মলাট থেকে একটা ছোট চিরকুট আংশিক বেরিয়ে আছে। চিরকুটটা বের করে মীনা পড়তে শুরু করল। টানা হাতের ইংরাজী লেখা – "আপনাদের রুট বুঝতে অসুবিধা হবে না। আমি আপনাদের সাথেই আসব। কিন্তু আপনাদেরকে অনুরোধ করব এত শক্ত ট্রেল এইরকম শীত আর তুষারঝড়ের দিনে না করতে। অসাবধানতায় পাহাড় থেকে পড়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আপনারা আবার বিবেচনা করে দেখুন। আর আপনাদের ধন্যবাদ হোটেলকে পৃষ্ঠপোষণ করার জন্য। ইতি – এস ডব্লু। দিন – ৫.২.১৯৯৯"। তার মানে ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ তে এই চিঠি লেখা। মীনার কিছু মনে হতে ও চিঠিটা রেখে দেয় সাথে। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে দুজনে সব গুছিয়ে হোটেল থেকে চেক আউট করতে নামে। বেশ কিছুবার রাস্তা গুলিয়ে অবশেষে সদর দরজা খুঁজে পেয়ে তার পাশে অফিস ঘরে অ্যানাবেলকে পাওয়া যায়। মীনা একবার ভাবে চিরকুটটা দেখাবে, কিন্তু কোথাও একটু বাধা পেয়ে সে কিছু বলে না। ওরা চেক আউট করার পর বেরতে যাবে, এমন সময়ে অ্যানাবেল বললেন – "আপনারা তো অ্যালগনকুইন-এ ট্রেলে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে। আপনাদের অনুরোধ করছি সাবধানে করবেন। সারারাত অনেক বৃষ্টি হয়েছে আর এখনো চলছে, মাটি খুব নরম। পাহাড়ী ট্রেলে পা হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আপনারা কঠিন ট্রেল না করলেই ভাল।" মীনার হঠাৎ আবার চিঠির কথাটা মনে পড়ে গেল। সময়টা অন্য, ঋতুও অন্য, কিন্তু ঘটনা দুটোতে বেশ মিল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে অমিত গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ একটা কথা বলল – "অ্যানাবেলের হাজব্যান্ডের ছবি দেখে তোমার কি একটু চেনা মনে হল? আমার মনে হচ্ছে আমি যেন কোথাও ঐ কাটা দাগ ওলা মুখটা দেখেছি, বিশেষ করে ঐ কাটা দাগ টা। খুব রিসেন্টলি দেখেছি"

"না সেরকম কিছু তো মনে পড়ছে না। তুমি হয়তো আগে দেখে থাকবে" – মীনা একটু চিন্তা করে বলল।

"ফটো এলবাম দেখতে হবে। এই জন্য ফটো তুলে রাখি" – অমিত সুযোগ পেলেই নিজের ফটো তোলার বাতিক নিয়ে গলা ফাটাতে ভালবাসে।

"আচ্ছা, আমরা কি সত্যি আজ ডিফিকাল্ট ট্রেলটা করব? চল একটা সহজ ট্রেল করে বাড়ি যাই। আজ সত্যি তো আবহাওয়া ভীষণ খারাপ" – মীনা চিরকুট এর কথাটা বলেও যেন বলতে পারে না কিন্তু অ্যানাবেল এর সতর্কবাণীটা স্মরণ করিয়ে দেয়।

"ধুর। এত চিন্তা করলে আর এই দেশে থাকতে হবে না। বছরের আদ্দেক দিন বরফ, বাকি ছমাস এর তিন মাস খুব গরম আর বাকিতে বৃষ্টি। এসব তো চলবেই। ছাড় তো। আমরা আস্তে আস্তে হাঁটব। "

ওরা যখন ট্রেল হেড এ (ট্রেল এর শুরু) পার্ক করল তখন সকাল সাড়ে নটা বাজে। আর মাত্র দুটো গাড়ি পার্ক করা আছে। অথচ এটা খুব জনপ্রিয় ট্রেল আর এখন খুব ভাল মরসুম। মীনা বুঝতে পারছিল আবহাওয়া

দেখে লোকজন ঘেঁষে নি। অমিতকে বলে লাভ নেই। অগত্যা ট্রেকিং পোল নিয়ে দুজনে জুতো পাল্টে নিল। তারপর চলা শুরু করল।

ট্রেলটা শুরুতেই বেশ উচ্চতা নেওয়া শুরু করল। মীনা উঠতে গিয়ে বেশ বুঝতে পারছিল ওর পা হড়কে যাচ্ছে। ওঠার সময় এত অসুবিধা হয় না, কিন্তু নামার সময়? এই ট্রেলের সবচেয়ে উঁচু অংশ প্রায় ৫৮০ মিটার উচ্চতায়। অতটা ওপরে উঠে যদি পা হড়কে যায়? চিরকুটে কি এই ট্রেল এরই উল্লেখ ছিল? মীনার মাথা এলোমেলো চিন্তায় ভরে যায়। ওর হাঁটাও খুব ধীরে হয়ে গেছে। অমিত অনেকটা এগিয়ে গেছে।

হঠাৎ মীনা অনুভব করে সামনে অমিতকে আর দেখাই যাচ্ছে না। উল্টোপাল্টা চিন্তা করতে গিয়ে অমিত আর ট্রেল মার্কার (নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর গাছের গায়ে সাইন লাগানো থাকে ট্রেলের পথ চিহ্নিত করে যাতে পথচারীরা দিকভ্রষ্ট না হয়) দুটোই সে হারিয়ে ফেলেছে। অমিতও বোধহয় সাবধানে এগোতে এগোতে আর পিছনে মীনা আসছে কিনা সেটা দেখে নি। মীনা অমিতের নাম ধরে দুবার ডাক দেয় কিন্তু শুকনো পাতার ওপর বৃষ্টির ভারী শব্দে তার স্বর বেশিদূর এগোয় না। মীনার এবার একটু ভয় লাগতে শুরু করে। কেন সে চিরকুটটা পড়ল? ওটা পড়েই আরও ভয় বেড়ে গেছে তার।

মীনা চারদিকে তাকিয়ে ট্রেলের মার্কারটা খোঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু সূর্যের অভাবে জঙ্গল বেশ অন্ধকার। খুব বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না। মীনা মোবাইলটা বার করে অমিতের নম্বরটা ডায়াল করে উপলব্ধি করে এখানে মোবাইলের সিগন্যাল আসে না!

এতক্ষণ পরে মীনা ভয় পায়। অন্ধকার জঙ্গলে সে একা। ট্রেলের পথ থেকে সে কোন একদিকে সরে এসেছে। এত বড়ো জঙ্গলে অমিতের পক্ষে তাকে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। মীনা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি করে এগোতে যায় আর এখানেই মস্ত ভুলটা করে ফেলে। জায়গাটা খুব নরম আর মাটি হড়হড়ে। মীনার পা পিছলে যায় আর ও বুঝতে পারে ওর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হাত এর ট্রেকিং পোল টা মাটির মধ্যে গুঁজতে গিয়েও পারে না। মীনা হড়কে পড়তে থাকে নিচের দিকে। এটা পাহাড়ের একটা ধার, আর নিচের দিকে প্রায় খাড়া ভাবে নেমে যাচ্ছে। মীনা গড়িয়ে পড়তে পড়তে একটা গাছের গুঁড়িতে জোরে ধাক্কা খেয়ে আটকে যায়। মাথায় চোট লেগে চোখে অন্ধকার নেমে আসে।

কতক্ষণ অজ্ঞান ছিল মীনা জানেনা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে প্রায় বারোটা বাজে। আকাশ দেখে দুপুর না রাত বোঝা যাচ্ছে না যদিও। উঠে বসতে গিয়ে খুব যন্ত্রণার মধ্যে বুঝতে পারে ডান পা টা বেকায়দায় পড়েছে, বোধহয় মচকে গেছে। ভাল কেলো, এবার কি করে কোথায় যাবে?

মীনা এদিক ওদিক তাকিয়ে বুঝতে পারে ও পাহাড়ের ওপর থেকে খুব বেশি নিচে পড়ে নি। গাছটা ওকে রক্ষা করেছে। কিন্তু এখান থেকে ও উঠবে কি করে? আর উঠলেই বা কোনদিকে যাবে? কোন সিগন্যাল নেই বলে ৯১১ কল করাও যাবে না।

মীনা দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়াতে গেল। ডান পা টা কোন রকমে ঘুরিয়ে ট্রেকিং পোলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো গেল। একটাই পোল আছে, অন্য টা কোথাও হারিয়েছে পড়ে যাওয়ার সময়। মীনা হঠাৎ দেখল ওর পা এর নিচে কিছু একটা শক্ত জিনিস। পা সরিয়ে দেখল একটা ঘড়ি। তুলে নিয়ে দেখল পুরানো অ্যানালগ ঘড়ি। যদিও ঘড়ি নিয়ে ওর জ্ঞান সীমিত, তাও বেশ বুঝল ঘড়িটা দামী। ঘড়িটা উল্টে ও চমকে উঠল। ঘড়ির

পিছনে আদ্যক্ষর আছে এস ডব্লু। একি ঐ চিরকুটের এস ডব্লু? হঠাৎ মাথায় এল – স্টিফেন ওয়াগনার হারিয়ে গেছিলেন ১৯৯৯ এ। উনি কি ঐ হোটেল এর অতিথিকে পথ দেখিয়ে এই ট্রেলে এসেই, ঠিক এই জায়গাতেই হারিয়ে গেছিলেন? মীনা কি একই ভাবে হারিয়ে গেছে?

"আমি কি বেঁচে আছি না মরে গেছি?" মীনা এবার বলেই ফেলল। বলতেই ওর চোখে পড়ল প্রায় ১০০ মিটার দূরে পাহাড়ের ওপরে দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। হঠাৎ করে মীনার ছোটবেলার সেই ভয়ানক মুখের কথা মনে পড়ে গেল আর পাগুলো অসাড় হয়ে গেল। তাহলে কি সত্যি আজ তাকে নিতে এসেছে সেই মুখ? পুরো সফরটা যেন তাকে এই জায়গাতে এনে ফেলে দিয়েছে। আর তার মুক্তি নেই। কি কুক্ষণে এই সফর টা প্ল্যান করেছিল ও!

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আবার একবার তাকাল সেই জ্বলন্ত চোখের দিকে। অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে বলে এবার ঠাহর হল – ওমা , ওটা একটা কায়োটি!

কায়োটি টা দাঁড়িয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। মীনার এবার অন্যরকম ভয় লাগলো। সব জায়গাতে লেখা থাকে কায়োটি মানুষকে আক্রমণ করে না, কিন্তু কায়োটি কি সেটা জানে ? এই তো কিছুদিন আগে খবরে বেরল টরন্টোতে পার্কের মধ্যে কায়োটি মানুষকে কামড়ে দিয়েছে। মীনার পাও মচকে গেছে। ও ছুটতেও পারবে না!

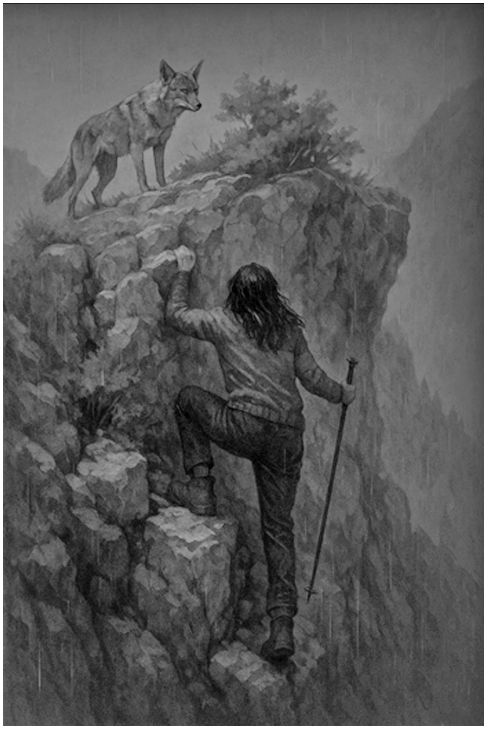

মীনা দুহাত তুলে শব্দ করে চেষ্টা করল কায়োটি টা কে ভয় দেখানোর। খুব একটা লাভ হল না। বরং ও যেন আর একটু এগিয়ে এল। কি মুশকিল। মীনা এবার পোলটার ওপর ভর দিয়ে কোনরকমে পাহাড় এর ওপর ওঠার চেষ্টা করতে লাগলো। কায়োটি টা ওপরেই দাঁড়িয়ে। হয়তো মীনাকে ওর দিকে আসতে দেখলে পালিয়ে যাবে। ওর আক্রমণের কোন চেষ্টা তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না আপাতত।

মীনা হাঁচড়ে পাঁচড়ে কোনভাবে পাহাড় এর ওপরটা উঠে এল। এসে অবাক ভাবে দেখল কায়োটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে, যেন ওর জন্যেই অপেক্ষা করছে। মীনা আবার হাত ছুঁড়ে শব্দ করে এগোতে গেল কায়োটি টা কে লক্ষ্য করে। কায়োটি মীনার দিকে পিছন ফিরে একটু এগিয়ে আবার পিছন ফিরে তাকাল। মীনার হঠাৎ মনে হল কায়োটি টা যেন ওকে অনুসরণ করতে বলছে। এসব গল্পের বইতে থাকে বটে! এটা কি স্বপ্ন? মীনার আর কিছু করার নেই বলে ও কায়োটি কে অনুসরণ করতে লাগলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। কায়োটি একটু করে এগিয়ে

মীনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

এমনিভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলতে চলতে মীনার হঠাৎ করে চোখে পড়ল গাছের গায় একটা ট্রেল মার্কার! দেখে ওর দারুন আনন্দ হল। কায়োটি টা কে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে দেখল সেটা উধাও হয়েছে। ভূত নাকি? তাহলে বেশ সাহায্যকারী ভূত বলতে হবে। মীনা না এগিয়ে ট্রেল মার্কারের পাশে বসে পড়ল। মার্কারের পাশে বসলে কেউ না কেউ দেখতে পাবে।

বেশিক্ষণ লাগে নয়, মীনার কানে এল ওর নাম ধরে অমিতের চিৎকার! শোনামাত্র মীনাও চেঁচিয়ে অমিতের নাম ধরে ডাকতে শুরু করল। একটু পরেই অমিতকে দেখা গেল, দুজন পুলিশ অফিসার এর সাথে ওর দিকে ছুটে আসছে। মীনা অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালো। ওর সারা বছরের অ্যাডভেঞ্চার একদিনে হয়ে গেছে!

অমিত যা বলল – সে বিভোর হয়ে ছবি তুলে যাচ্ছিল আর এগিয়ে যাচ্ছিল, কিছুক্ষণ পরে উপলব্ধি করে মীনা পিছনে আসছে না। ও বুঝতে পারে একটা ঝামেলা হয়েছে। ও পিছনে ফিরতে শুরু করে কিন্তু মীনাকে খুঁজে পায় না। অনেকবার ডেকেও যখন মীনাকে পাওয়া যায় না, তখন আর দেরি না করে ও ট্রেল হেডে ফিরে যায়। এভাবে মীনাকে পাওয়া যাবে না। পুলিশ ডাকতে হলে ট্রেল হেডে সিগন্যাল পাওয়া যাবে। ৯১১ কল করতে পুলিশ আসতে মাত্র দশ মিনিট সময় নিয়েছে, কারণ এই রকম বাদলার দিনে তারা নাকি অনেক "পাগল" কে এভাবে উদ্ধার করতে অভ্যস্ত। তারা চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে আধ ঘণ্টার মত, যখন অমিত একটা কায়োটিকে দেখতে পায়। কায়োটিটা ওদের কাছে এসে তারপর আবার একই দিকে ফিরে যায়। অমিত এর কিছু মনে হওয়াতে ও মীনার নাম ধরে ছুটতে শুরু করে কায়োটিকে অনুসরণ করে। মীনাকে ট্রেলের ওপরেই পাওয়া গেল, এটা বেশ আশ্চর্য্য।

প্যারামেডিক এর দল ট্রেলের নীচেই অপেক্ষা করছিল। মীনাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে একটা প্লাস্টার বেঁধে দেয় ওরা। সামান্য মচকে গেছে পা, হাসপাতাল এ যাওয়ার দরকার নেই ("হ্যাঁ, না নিয়ে যেতে পারলেই খুশি হয়, যা হাল হাসপাতালের, ইমার্জেন্সি তে পাঁচঘণ্টা বসিয়ে রাখবে" – মীনার স্বগতোক্তি)।

প্যারামেডিক রেহাই দেওয়ার পর মীনা পুলিশকে গিয়ে ঘড়ির আর চিরকুট এর কথাটা বুঝিয়ে বলে। অমিত এর কিছুই বুঝতে পারে না বলে অবাক ভাবে তাকিয়ে থাকে। পুলিশ ব্যাপারটা বেশ গুরুত্ব দিয়েই নেন কারণ এই পুলিশ অফিসার ছবছর আগের এই অন্তর্ধান এর খবরটা আগেও ভাল করে জানতেন। উনি একই এলাকার লোক। পুলিশ ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলে আবার ট্রেলে উঠে যায়। মীনাকে যে ট্রেল মার্কারের কাছে পাওয়া গেছিল, মীনা তার থেকে বেশি দূরে ছিল না পড়ে যাওয়ার সময়। তাই ঐ পড়ে যাওয়ার স্থানটা খুঁজে পেতে পুলিশের খুব একটা দেরি হয় না। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার পর পুলিশ অফিসার ফিরে এসে খবর দেন মীনার আন্দাজ একদম ঠিক, একটা কঙ্কাল পাওয়া গেছে অনেকটা নিচে। এখনো তোলা হয় নি কারণ কঙ্কালটা অনেকটা নিচে পড়ে। কিন্তু যে পুলিশ নিচে নেমে কঙ্কাল সনাক্ত করেছেন তিনি পোশাক থেকে একটা ওয়ালেট আর সেটা থেকে স্টিফেন ওয়াগনার এর ড্রাইভিং লাইসেন্স খুঁজে পেয়েছেন। যেটা বোঝা যাচ্ছে, যে বা যাদের সাথে উনি এসেছিলেন, তারা ওনার দুর্ঘটনাটা রিপোর্ট করে নি। হয় তারা ভয় পেয়েছিল নয় তারা দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। কিন্তু এদের পরিচয় জানা খুব শক্ত হবে না কারণ

চিরকুট বলছে এরা ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ এ হোটেলে মীনাদের রুমেই ছিল আর তারা হোটেলে কিছু অনুদান দেওয়ার কথা বলে থাকবে।

পরের কাহিনী বেশ সংক্ষিপ্ত। মীনা আর অমিত অনুরোধ করে পুলিশদের অনুসরণ করে এল্টজ্ ম্যানরে ফেরে। অ্যানাবেলকে খবরটা জানাতে তিনি প্রথমে বাকরুদ্ধ, তারপর ভেঙে পড়েন। ভদ্রমহিলা অনেকদিন তার স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করেছেন। আজ আশা আর নিরাশা একসাথে তাঁকে প্রভাবিত করেছে। তবে শক্ত ধাতের মহিলা, খানিকটা কেঁদে সামলে নিলেন। তারপর মীনা কে জড়িয়ে ধরেন। "তোমার জন্য আজ আমি একটা বড়ো ধাঁধার সমাধান পেলাম। আমি শান্তি পেলাম"। মীনার চোখেও জল এসে যায়।

হোটেল এর পুরানো খাতা ঘেঁটে জানা যায় একটা জার্মান ব্যবসায়ীদের দল Algonquin ঘুরতে এসেছিল শীতের মাঝে আর তারা রুম ২০২, ২০৩, আর ২০৪ বুক করেছিল। খুব তুষার ঝড়ের মাঝেও তারা ঘুরতে যাওয়ার জেদ ধরে আর স্টিফেনকে তাদের সাথে যেতে জোরাজুরি করে। স্টিফেন রাজি ছিলেন না আর অ্যানাবেলও চান নি এই দুর্যোগ এর দিনে উনি বের হন, বিশেষ করে সেই সময়ে স্টিফেন হালকা ডেমেনশিয়া (Dementia) তে ভুগছিলেন। ওনাকে ঘরে আগলে রাখলেই ভাল। কিন্তু এর মধ্যে ব্যবসায়ীরা হোটেলে একটা বড়ো অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ এর লোভ দেখায় দম্পতিকে। তখন টাকার টানাটানি চলছিল দম্পতির। তাই অ্যানাবেল রাজি না হলেও স্টিফেন গোপনে চিরকুট এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের জানিয়ে দেন যে উনি এই ঘুরতে যেতে রাজি। অ্যানাবেল সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগেই ওনারা বেরিয়ে যান। অ্যানাবেল এতটা বুঝতে পারেননি কারণ ঐ সকালে আরও অনেকগুলো দল চেক আউট করেছিল। তাই পুরো ব্যাপারটা অন্ধকারেই রয়ে গেছিল। দুটো ব্যাপার অবশ্য জানার উপায় নেই – ১) চিরকুটটা রুম ২০৪ এর ব্রোশার এর মধ্যে কি করে রয়ে গেছিল? হয়তো কেউ তাড়াহুড়োতে রেখে দিয়েছিল। ২) পাহাড় এর ওপর ঠিক কি ঘটেছিল? বৃদ্ধ স্টিফেন কি ঝড়ের কবলে পড়ে যান, নাকি ডেমেনশিয়ার জন্য অঘটন ঘটে, নাকি ব্যবসায়ী দলের সাথে কোন বাদ বিবাদ ঘটে। এটা ব্যবসায়ী দলকে ধরার পর পুলিশ হয়তো জানতে পারবে।

সব মিটে যাওয়ার পর অ্যানাবেলকে বিদায় জানিয়ে মীনা আর অমিত বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করে।

"দারুন কাকতালীয় ঘটনা ছিল। প্রায় ভুতুড়ে" – অমিত গাড়ি চালাতে চালাতে বলে।

"প্রায় কেন? ঐ কায়োটি টা ভূত না?" – মীনা বলে ওঠে।

"ধুর। ভূত বলে কিছু হয় না। কায়োটি টা তোমার থেকে কিছু খাবার এর আশা করেছিল। কিন্তু একটা খটকা ।। দাঁড়াও দাঁড়াও... " বলতে বলতে রাস্তার ধারে এসে ব্রেক কষে অমিত।

"কি হল হঠাৎ? দাঁড়িয়ে গেলে কেন? – মীনা অবাক হয়ে যায়।

অমিত হঠাৎ ওর ফোনটা খুলে একটা ছবি তুলে ধরে মীনার সামনে – "তোমাকে বারবার বলছিলাম না স্টিফেন ওয়াগনার এর ছবিটা কোথাও আমি দেখেছি, ঐ কাটা দাগটা ? এই দেখ" – আর সব ভূতের সিনেমার মত মীনার চোখের সামনে ভেসে ওঠে গত রাতের দ্বিতীয় কায়োটির তোলা ছবিটা, যেখানে কায়োটির মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কাটা দাগ টা বিশেষ করে। মীনা মনে করার চেষ্টা করে ওর পথপ্রদর্শক কায়োটির মুখেও কি কাটা দাগ ছিল? ঠিক মনে পড়ে না।

Escape

Kalpana Sarkar Majumdar, *1987, CST*

It was Thursday afternoon. Some past memories were clouding my mind. I was feeling very weak and low energy. "Will you go alone tomorrow, if I can't go?", I asked Tom. I heard "no" from the family room. Every year, I look forward to this extended family camping (this year "glamping") trip. We rented a six-bedroom house on the mountain resort, Massanutten. Before I fell asleep, I quickly glanced through the list of things to pack. Bonnie, our executive Project Manager of the trip, assigned me salad and Anne assigned me air fried eggplant. Those need to be prepared tomorrow morning.

It was Friday morning. We quickly prepared the salad and air fried eggplants. We loaded the car with everything we planned to take with us and headed out when it was past 2pmET.

Tom was driving, I was trying to get a nap. Fridays bring back many good memories. Some good memories are better not to remember when that brings only tears! The road was very scenic. I enjoy nature's beauty the most! I let my mind escape into nature. We were going through villages and farmlands. I counted, we passed seven farmlands and three ghost houses (abandoned). We reached there around 5:30pmET. The house was on the downside of the mountain road surrounded with looong trees! We parked the car on the sloped gravel driveway and then tried to unlock the front door. It didn't work! Looks like the dead bolt lock is locked also but the key does not work. So, we called the after-hours contact number and help was on the way! ETA 30 mins. Tom vanished walking. I started looking around. A big house is in the construction phase just on the opposite side of the road. There were quite a few cherry trees around the back yards. It must be looking gorgeous during springtime! Couple of beautiful, white dotted baby deer with their mom stopped, looked at me once, then went away slowly inside the woods. I could not take my eye off them! I just remembered the sign of "We love our smart wild bears" on the entrance of the resort. I quickly got into our car and locked the doors! Just then Tom was coming down from the other side of the road and a van parked in front of the house. It was Peter, Rupa, and Santa, their 16 years old

son. I ran out of the car and hugged Rupa and told them the situation. Peter tried to unlock it without any luck. OMG! I was about to lean on a tree in front of me 6 inches away covered with green mosses and tons of cracks filled with caterpillars! I jumped a few feet away! That is it! I am not going near that tree anymore! Peter booked the house in his name. So, he called again, and help was only a minute away.

Finally, we got into the house. It was spacious with a large, beautiful deck and gorgeous view of the trees in the backyard! The house was clean. The deck with chairs overlooking the mountain woods was a very relaxing place. Soon Anne, Alan, and Avi came in. Then Bonnie, Runa, and Chris joined. At last Rima, Reeve, Paul, and Rumi came in. We were 15 total. Now who is going to sleep in which bedrooms? Anne, and Rupa together made the decisions who gets which bedroom. Anne was in charge of Friday dinner. While she was getting food out from the cooler and started warming up, I started boiling some water for tea. We got the first bedroom with an attached bathroom on the right. I peeked through the window. If the smart wild bear comes from the mountain top towards this house, I will be the first one to spot the bear! Cool! Smart bears and caterpillars were in my head, not going away anywhere!

We had tea and then elaborated Anne led dinner. "OMG, be careful!" I shouted. Bonnie stood up on a high bar chair holding something in her hand! We were about to pass midnight – it will be her birthday! We giggled at Bonnie's acts of standing on the highchair and making a toast – looked like a politician addressing a crowd before the election! We giggled. We were kids again; we were a team of Peter Pans! I love my extended family and am very thankful to God! We accept each other as who we are, and we never try to find faults in others. On the top, Alan has an amazing ability to turn every mishap into a funny thing by his words! We went for a walk after dinner. It was dark and no one else was anywhere on the road except us! At night, I peeked through the window a few times to see if I could spot any smart bear. No luck!

Next day morning, I tried to see the sun through the green trees coming out to the sky. Looked like a snapshot of one big firecracker behind the greens! Today we will

go to Edith J Carrier Arboretum (in James Madison University) and then go to Escape Room (Woodstone Entertainment) in Massanutten. While we were frying luchi, Rupa hugged me – like my little sister! I thanked God and kissed on her head. We had an elaborated brunch arrangement celebrating Bonnie's birthday in style with luchi (deep fried flat bread) – Bonnie loves luchi! But last night's food was not down in my stomach yet! After brunch, we all headed to the botanical garden. It was a beautiful garden of varieties of plants with walking trails thru different man-made structures like bear, squirrel, mermaid, monkey, playhouse, ScareCrow! The Scarecrow looks to me like a big ghost sitting on the ground! Bonnie was making poses next to those like a kid. There was a wooden hanging bridge over a narrow stream, and we jumped on it to swing it like little kids! It was so much fun. We checked out our body balances hoping on round cut wood pieces using one leg like we used to do in our childhood days! As I was going through the beautifully manicured and decorated wooded trails in the garden, it reminded me of our engineering college campus. We need to head out to play an Escape game which will start at 3pmET. Run, run, run!

There were two escape rooms – Pharaoh's revenge and Mayday. There were a total of 15 and in each room 8 players could play together. I decided to go into "Mayday" because the word "revenge" sounds very negative to me. The organizer said "Mayday" was harder than the other one. So, all the five kids wanted to go to the Mayday room. Chris joined our team also. So, Chris and I were the parents and five kids, ages from 15-21 – that was our Mayday team. Cool! I never played this game, and I assumed that there would be a maze and we would play some hide & seek and finally we would find a way out from that maze. I was completely wrong! The organizer explained that we would be locked inside a room (escape room) and there would be lots of clues to solve all the puzzles inside the room. If we could solve all the puzzles within 3 hours, we would win! Ok, sounds like a brain game together, it would be fun! We entered the room, and the door was closed behind us!

Inside the room, on the left the ship's steering engine with all the panels and a video screen. Captain explained the "May Day" situation of the ship, the ship is sinking because of open eight valves. Our job is to close those eight valves as soon as possible to save the ship and its passengers. Captain mentioned a code – 1512, that's the first clue! Kids immediately got into action to start dialing the code using the engine wheel. When the clue was used correctly (successfully), a big splash with a big sound came up on the video screen. Ok, got it! I looked into the room – there

were lots of dials for the water valves, lights for each water hole, once a puzzle is solved using clues, one hole is closed, and the corresponding light is turned ON! There were dials for water levels. On the right, there were multiple selves, and a key was hidden under a captain hat! There was a big, longboard on the wall with 26 lights that were going off and on! Hmm…what's that for? Game organizer said, we will need that white board twice. Does it mean two clues? There were three doors in the room. Through one door we came in, and the other two yet to find where those go! Let the kids figure it out! My mind escaped from the room.

We have one life to live with this body. Like any other creatures in the world, we humans are very different. We perceive very differently than what another person actually says or intends to say or act even sometimes! We judge too often than understand others and act based on our own judgement! It creates more differences! Understanding brings us together and judging pushes us far from each other. Our scriptures say that our souls are born again and again. The energy is constant. What makes our souls reborn? To complete our karmic cycle? To save mankind like our Lord Rama, Jesus Christ, Mohammed? "We are done with that clue" – Rima told me. My mind was back in the escape room where my hands were on the engine steering wheel of 1512 code.

Alright, how much time do we have to solve all the puzzles? Looks like they have used all the clues except the key under the captain's hat and the big board of 26 lights. Let me check that big board. I matched the combination with the dial combination on the steering, on the water valves dials and on the water level switches. That did not solve any puzzle – so no connections! Lights were going off and on inconsistently with the buttons on the board. Let me try one by one all possible permutations and combinations of the buttons and the lights. Well, now the lights stay ON. Let me finish it then. Someone was trying to press a button and Reeve stopped him/her and said firmly – "She got it. Let her finish". Reeve is a leader! Yes, now all lights are ON. Big sound and a big splash came up on the video screen and the voice of the game organizer said that we finished all clues in this room – congratulations! The other two doors were opened. Inside the right door, there was one more clue inside a tiny cave-like room! On the left side, it was another big room. First clue on the left side is just a few codes to enter. Let the kids enjoy doing it. I passed them to see all the things in the room. There was a big map hiding inside a weird looking bed. One more clue on the shelf right. Came back, hmm…lights did not turn ON. Why? First

code had a “minus” sign, but the code entered considering the sign as a “plus”. I told Rima and she immediately fixed it. Lights were ON and a big splash! There was “All together” written on the left wall inside a small enclave. The symbols look the same on the ship’s water level dials. I went back to the first room. Reeve came with me. “It’s altogether means – it has to match with this” – we both said to each other. He got it and found the first magnet clue immediately.

When our wishes are not fulfilled in one birth, do our souls reborn to fulfill those wishes? If we do only “good karmas” in this birth, then will our souls have an all-happy smooth life in the next birth? I guess so. “We did it – all clues are used, and all puzzles are solved!” My mind came back to the Escape room. Yeahhhhh! These kids are geniuses! We still have more than an hour left to solve! They are great team players too! Time for celebration! Let’s have ice cream! The nice organizer let us watch the other team playing inside the other escape room thru TV cameras – only a few minutes left! Pharaoh’s revenge was terrible, I guess. But they did it finally! It was lots of fun!

We were back to our AirNB house. Chicken biryani and vegetable “Bisabela bhath” were cooked in the morning, prawn, vegetables, and some left over desserts - all were served. Voluptuous dinner! I was able to eat some after running around for the day. Alan left after dinner to drop Anne for her next day morning flight. We celebrated Santa’s birthday ahead – the loving youngest member of our extended family. After dinner we hover around sofas in front of the TV. The Bengali movie, “Bhuter Bhabishyat” (The future of the ghosts) was selected to watch! I am very allergic to ghost or horror movies! I was sleepy too!

Next day morning, we all were getting ready for hiking to the mountain trail. Nothing moved down from my stomach when few complained about upset stomach. What did they eat, I need to eat that! Well, I decided to stay back with a few other members as I did not have enough sleep. We went to see a lake (looks like a pond) after lunch. After we came back, I locked myself inside our bedroom and started

writing my daily journal but fell asleep!

After the hiking team came back, Peter, Bonnie, Paul, and Chris made BBQ chicken and vegetables. I heard their hiking story and realized I missed lots of fun! After our dinner, we sat and watched the ghost movie to finish. All the ghosts seemed to be normal human beings and they all wanted to stay in a big house, but the owner wanted to sell that house. So, the ghost-human were solving their problems interacting with actual humans. They finally stopped the sale, and that house became a movie studio. This is the story, it was funny, we laughed a lot, but it was very scary at the end! Will I watch it again? Never! Well, I prayed to God a few times before falling asleep to avoid those ghosts creeping up in my dream! "One infinite pure and holy – beyond thought, beyond qualities I bow down to thee!"

Next day morning we all wrapped up and it's time to say "goodbye". My mind escaped quite a few times, now time to stay back to the moment! What our hearts remember the most are the moments shared...

Moments beyond mind

Kalpana Sarkar Majumdar, *1987, CST*

"Voooooo", I woke up, it sounds like coming from ships or boats! Wrapped in the housecoat quickly, I stepped out of our cottage. Wow! So beautiful! There was a river just in front of the cottage and two huge houseboats were passing by each other, surely one of them made the sound! I stand still on the front patio of the cottage! Between the cottages and the river, there were lots of mango trees, unknown trees, and a small coconut tree with coconuts hanging at my height! So many mango trees and mangos are hanging with a long string like God made them that way so that we can hold them easily! When we arrived last night, it was all dark. I only noticed the brick path under some trees when we landed to our cottage. I started walking towards the water.

"Good morning!" George and Tom were having morning walk along side of the river. The air was so fresh! I had not smelled so fresh air for long time! Good morning! Good morning! Everyone woke up and came outside of the cottages. "We will eat breakfast at this resort and then spend the day in houseboat, then we will watch sunset at Alleppey beach", my elder sister, Amy loudly told everyone the plan for the day. Well, I had to do my yoga, take shower, and meditate – that's a lot to do before breakfast. So immediately I headed back to our cottage. We were total nine in the gang. Seven of us flew from Kolkata to Kochi and two joined here at Alleppey. We rented a luxury van for travelling on the road from Kochi to Alleppey to Kanyakumari, to Rameswaram, to Madurai and then fly back to Kolkata.

The purpose of this trip to me was to watch the water lines where the three oceans hugged each other, and I wanted to experience the feelings standing on the Swami Vivekananda rock. I was little when I learned about Swami Vivekananda and his life. "Look at this side!" – my niece Rin was pointing to a large houseboat on the right side of ours. So beautiful paintings on it! It was the same size of our houseboat. We are far from our resort now. I went to the upstairs deck. In front of me, it looked like a picture – there were so many boats of so many different sizes, shapes, and colors on

the vast waters, yet so far! Our houseboat was near to a peninsula where they docked it slowly. Time for lunch! We all gathered around the dining table. Wow! A big feast! Paper white rice, Sambar – lentils soup, Fish fry, Chicken curry, Cabbage curry, and Okra fry. Wonderful arrangement on a floating boat! I took a fish fry, on top of my rice, sambar, and okra on a shiny and smiling Bone China white dish and sat on a sofa while watching the small hut on the peninsula surrounded with banana trees on sides. There was a long electric line from the mainland coming so far for lighting up this small hut on the tip of the peninsula!

Swami Vivekananda wrote in one of his letters to sister Noble, "*My idea indeed can be put into a few words and that is: to preach unto mankind their divinity, and how to make it manifest in every movement of life*[1]." God created us differently like all flowers are not same, all fruits are not same, all birds are not the same, similarly we all human born different. Even then, we human only cause sufferings and pains to others the most than any other creatures on earth, I think. Reshmi woke me up – "we reached at the famous Alleppey beach, Mistimoni". I opened my eye; I felt fortunate, and I am thankful to God. Waves were powerful and coming one after another non-stop, kissing my feet. Sun was playing hide and seek with white and gray cloud friends. Finally, time to say goodbye, so Sun painted the whole sky pouring all its colors reflecting triple times on the water while slowly going down the waterline on the horizon! Bye Bye! One more day we enjoyed in our lives!

It was a long six hours of drive, but did we feel that way? Not at all! We sang, we stopped by to eat our lunch, snacks, tea, we shopped spices, fruit cakes and finally reached our hotel at Kanyakumari at 8pm. The temple will be closed shortly, some of us ran to the temple.

I woke up at 5am, a chanting/song in local language coming from outside. I picked thru the window! It was reddish sky though sun is not out yet! Our room was on 6th floor and just few yards from the ocean water line. There was a peninsula for boats to park around it, I guess. People were standing there with cameras looking their lefts, all

1. Page 294, Letters of Swami Vivekananda from Advaita Ashrama.

were waiting to watch sun rise! I quickly took my shower as I wanted to offer and pray to Ma KanyaKumari after watching sun rise (my most favorite thing to do in the morning). "Well, it's coming out! Get up! You won't get this opportunity to watch so beautiful Sun rise sitting in your room!", I woke up my son and husband. We watched the yellowish red ball came out of the water! The huge line of people watching sun rise on the far peninsula looks like a long line of black ants! Myself, my sister-in-law, and brother-in-law took an auto to go the temple even though it was only couple of blocks away. Penetrating and rowing thru river of people almost half an hour, we reached in front of Ma using VIP tickets! My brother-in-law left in middle feeling suffocated! I thanked Ma for everything and prayed to Her. Then we started walking back to hotel. There were vendors on the street both sides with varieties of things!

As far as I could see, water and water! Color of the water on my left is greenish and on my right bluish, on my front farther away it looks all grey! This is the huge rock ("last bit of Indian rock") where Swami Vivekananda reached by swimming and meditated for a three-day stretch, from 25 December to 27 December 1892 on aspects of India's past, present, and future! Now it has a huge building and a temple. It was crowded. I closed my eyes. "*I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true*".

Our van was going over a long bridge on the water! "This is where the famous movie Chennai Express shooting took place!", Reshmi loudly told everyone. "Ok, you meant that dance". Soon we took our lunch in a top rated restaurant where foods were served on banana leaves! This was a first time experience for many of us! It was very crowded and there was no order to seat!

We bought VIP tickets to get into faster lane in Rameswaram temple. But lane did not seem faster than normal lane. Finally, we reached our seaside hotel - we all were very tired. I took shower and then I was coming down the stairs when all lights were out! About to scream! Somehow, I zipped my mouth, my brain signaled - Load shading! First time in this India trip! I do not like darkness! The generator was turned

on. It kept happening and I started counting till I fall sleep. Seven times! I realized that I would never be able to mediate in dark room!

Next day we headed to Madurai. We went to Minakshi temple first. The priest took us to smiling Ma. Then we headed to our hotel. The hotel had everything we needed. I felt like I was back in USA. Next day morning we would fly back to Kolkata.

Goodbye Madurai, goodbye South! My childhood wish has been fulfilled! Our plane took off even outside was stormy and rainy! I closed my eyes. Someone said it would take 100 years for us to understand Swami Vivekananda's works, his eternal brotherly love, and his messages. He wrote in one of his letters to sister Miss S. Farmer - *Our scripture teaches that he who serves the servants of the Lord is His highest worshipper. You are a servant of the Lord, and as a disciple of Krishna I will always consider it a privilege and worship to render you any service in the carrying out of your inspired mission wherever I be*[2]. Who wouldn't agree more!

2. Page 276, Letters of Swami Vivekananda from Advaita Ashrama.

Two Poems

Kalpana Sarkar Majumdar, *1987, CST*

Wars

Time and tide wait for none
Moments, days, months, years are gone.

Astrology said years will be great
At the end everything seems fake.

Eyes said 'we are tired of shading tears"
Mind says "I live in fears"
Heart cries out "where are you God?"

Little boy giggling and playing around
Suddenly he cried out loud of big sound
Ma, Ma where do I hide?" someone to hound!

Someone so happy, tomorrow is her wedding
Demolished dream, tears no more falling
Hopeless lifeless body, she is not feeling!

Brain calm, quiet listening and watching
Innocent mind shouts "they are after me! But why!!!"
With me God you cry, cry only cry.

A Little girl and her God

A little girl walking n walking, long way miles n miles.
In boundless joy, silent pain, endless love n devotion in tears.

There was more of her, hidden deeply somewhere there.
Unknown calling her to a world far away from here.

She surrendered to her God, her guide.
In every moment n in every tide.

She shares her joy, pain, sorrow n concerns.
And He showers with His love n blessings.

She asked her God to show her true friends in her dreams.
God smiles, "I am your true friend", holding her hands!

A holistic approach on Skill Development for the Industries in Today's scenarios

K.G.Pilsima,*1987, Mechanical*

It is said that the Change is the only process of continual improvement. As the time moves in terms of knowledge, skill, technology, process, management etc., we also need a change in our approach towards our problem, solution and improvements or developments. With the Globalization of business and stiff competition in the market, we need some innovative measures to improve productivity, quality etc. at minimum cost in manufacturing in an Industry. The basic essential 3M factors – Man, Machine, Material – are the prime requirement in any manufacturing organization. Being Technology, materials etc. highly inconstant, the importance of human resource development is decided as the next development to contribute to the overall effectiveness. Apart from Supervisors, Managers etc. the general workforce is the key element to move us forward. Any job, in service or in manufacturing, demands a combination of Knowledge, Attitude and Skill (KAS Triangle, where the attributes attached to KAS are also mentioned in the figure, Fig.-1). Here, the need of Skill development of workforce along with knowledge gain and motivational drive in approach are stressed upon by Indian Government. Vocational education is one of such drive where one gains skill and experience directly linked to a career in future. It would not only help employment opportunities, but also meet the huge skill demand for "Make in India" mission.

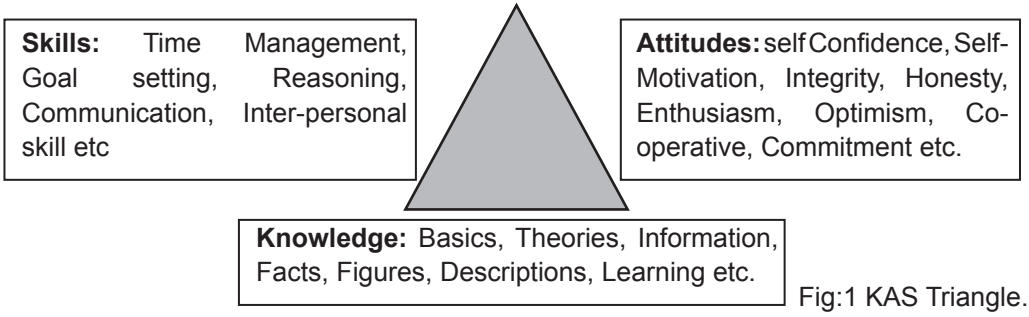

Fig:1 KAS Triangle.

In India, vocational training is provided on a full-time as well as part-time basis. The 1st kind of programs are offered by I.T.I.s (Industrial Training Institutes) and 2nd one type is mostly offered through state technical education boards or universities. National Council of Vocational Training (NCVT), an advisory body under Ministry of Labour as set up by Govt. of India plays an important role in implementation of vocational education in India. In order to harmonize the variation and multiplicity of various authorities in terms of standards and costs, the National Skills Qualification Framework (NSQF) is launched in December 2013 which is a competency based framework that organizes all qualifications according to a series of levels of knowledge, skills and aptitude.

Training, as in vogue, can be broadly categorized as Reactive Training (i.e. face and learn), Traditional Training (class room), Skill based Training, and Training through results/achievement. Though all modes of training are opportunities for learning, but skill based, as being prime focus, is an employment potential training. Also, Training through results/achievement provides a new direction to be more innovative or creative through goal or target setting. It is not a regular kind of assignment, rather it promotes small group activities. Goals in life may be classified as follows.

1. Family and Home.
2. Financial and Career.
3. Mental and Education.
4. Physical and Health.
5. Social and Cultural.
6. Spiritual and Ethical.

A student or Professional must cover all areas of life through goal setting in a SMART manner and achieve small successes initially depending on his priority and then look for bigger Goal which can be split into smaller goal and then to help to track and achieve results partially or fully towards success. The concept of split goal makes one easy and achievable towards bigger/long-term goals.

SMART is defined below and goal selection in life must satisfy these criteria to ensure challenges.

1. Specific – focused.
2. Measurable – have scale/unit of evaluation.
3. Attainable – possible to achieve.

4. Realistic – achievable for him
5. Tangible – result is noticeable.

Here, during vocational training, one has to work on Career goals in addition to others goals if any.

In order to make Training a competitive in all respect, few additional areas during training period might make it more effective and holistic to be more successful on the job in a real life situation.

Though the qualification pack includes possible safety areas and technical subjects corresponding to each trade area, few more methodologies/techniques are suggested to include in training agenda.

1. Safety analysis and its measures.
2. Environmental awareness (with Energy conservation).
3. Failure analysis or trouble shooting.
4. Corrective and preventive measures.
5. Improvements or Kaizen concept.

The first point as mentioned above is to make any trainee aware of the safety aspect of his job that is to know and explore the possible risks and hazards in it and actions required to avoid or prevent any accident or damage. KYT (Kiken Yochi Training, a Japanese technique) drill before starting any job is recommended to ensure safe working. It explores all possible dangers in a Group Action.

Second important aspect of industrial training is to create awareness on Environment which includes pollution (air, water, noise etc.) affects and control, energy optimization, use of renewable sources etc. This helps to identify the effect of his job on the environment and how to avoid that or to comply with the regulatory norms as laid by the concerned local authority or Government.

The third technique as suggested is to acquire skill in any failure analysis or trouble shooting. Here, technique for any failure or breakdown analysis in any machine or system is learnt to find the root cause and then look for solution to eradicate. Why-Why analysis is a good approach in this regard.

Also, the drive for Fuguai i.e. an eye for defects helps to identify abnormalities timely & eliminate.

The next area, as in serial 4, where the stress is given to have knowledge & skill on taking corrective actions or measures on the equipment or system based on failure

analysis as explained above. The corrective measure signifies a temporary or short term action to keep the system running. It may not prevent the trouble permanently or on long term basis. So, the concept of Preventive measure speaks to exactly identify the cause area or point and take measure to eliminate its recurrence. Here, interestingly, we must go for identifying the cause up to Human level as any kind of weakness or failure is ultimately caused due to human lacks which might include lack of discipline, usage condition, then mis-operation, lack of skill, knowledge and design weakness etc. Therefore, it is suggested to deeply go down to human cause and take necessary measure through human development i.e training, education etc. & also sometimes referring administrative control.

The final concept as being recommended is to motivate any trainee or performer for improvement. While maintaining routine health of any equipment or system or methodology, one must also look for scope for improvement to get the maximum benefit out of it. Here, a Japanese definition KAIZEN (change for the better) teaches to do small improvement at almost zero-cost investment.

Further to above concepts, the Training may include preliminary knowledge of financial management, market potential, technology availability (depending on area of interest) etc. and few soft skills (Communication, problem-solving, and time management etc.) including IoT (Internet of Things) etc. & might help further to groom a holistic technician or professional or entrepreneur.

Finally, a performer/professional/an entrepreneur is looked for the following competencies to be a successful performer in achieving his/her goals & to contribute in Organizational Vision/Mission.

Competency areas
Directiveness
Customer orientation
Concern for Quality and order
Job knowledge/Technical expertise.
Innovativeness
Developing others
Teamwork and co-operation
Relationship building
Achievement orientation
Organizational commitment

The above recommendation is for reference. One must decide the extent depending upon his stream or trade, job requirement, duration available, infrastructure or resource convenience at the Institute.

Lastly, I will end with an inspiring Quotation – "Whatever you Vividly imagine, Ardently desire, Sincerely believe & Enthusiastically Act upon ..... Must inevitably Come to pass – Paul J.Meyer".

A Revitalising Thought for Salt Lake City – Shared Facility, Safety, Environment

Barun Kr Basak,*1971, Mechanical*

A. INTRODUCTION

Recognising that we have already extracted, damaged, abused and over-exploited the resources of the Earth and thus complicated our own living, this article is an attempt towards understanding the issues, to make required corrections of our own, towards braking the wheel from further destructions and in restoring the lives of human generations more sustainable from now onwards. Better late than never. We all would like to see our lives safer and healthier while leaving a much better Earth for the future mankind.

We first look at things around us in our own neighbourhood and then broaden our range to the greater society with almost same principles of tasks extended.

As we start a movement of reforms of understanding, practice, habit and attitude, we go ahead to execute tasks far more committedly within our own household, with Block Association Policies adopted and executed within the whole Block, push the Municipality, Police and State Administration for actions that would be needed – through Councillors, Legislators and Parliamentarian representatives and make the quality of our lives upgraded for good health, safety and more peace.

B. SALT LAKE INFRASTRUCTURE

One may recall that the planning for Salt Lake was started by Late Dr. B. C. Roy in early '60s and the first settlement started in early '70s. The Master Plan for the reclamation of land for expanding the Kolkata City area and of the Salt Lake City plots, facilities, and infrastructure were indeed made with some foreseen able future extrapolations, but city living has got changed beyond any resemblance or comprehension to the past at all. Government pensioners and middle class Bengalis, who apparently were the target settlers, did not have much household appliances, room air conditioners, any owned cars or any dream of constructing own houses beyond two levels. Thus,

energy requirement was low, traffic volume was low, parking need too few, water (sourcing, storage and pumping) and drainage system for upto 2-level houses also very low compared to the demands of today.

Upon exceptional growth of population and corresponding pressure on Salt Lake Township with all classes of people flocking in to benefit from a better planned neighbourhood than the original capital city, and with development of technology and use of appliances, richer classes constructing more levels on same plot, enhancing population density on same area, adding to energy load and water supply demand, putting on additional strain on drainage and sewerage, and also the new residents affording multiple cars for same household, the Salt Lake of today has to crave for more power, water, drainage, parking, road, health, market, playground, schools, college and all such urban features – rather beyond dreams in planning of early '60s.

C. UNFINISHED INFRASTRUCTURE

Waterways Enterprise Ivan Milutinovic of Belgrade, a Yugoslav (now Serbia) company, headed by its Architect and Town Planner Dobrivoje Toskovic, is said to have had prepared the Master Plan of this Salt Lake City, which received government approval on 9th April 1964. Total estimated inhabitation was estimated at about 3.28 lakhs developed in 2 phases. Phase I had provision for 1.3 lakh inhabitants in individual plots and about 0.9 lakhs in collective ownership, totalling 2.2 lakhs covered in total 50% residential area, 23% transportation area and 12% greenery, with the rest 15% distributed between commercial, educative, hospital, administrative and other amenities.

Current figures put up by Bidhannagar Municipal Corporation (BMC) in its website indicates resident population of its original wards 29 - 40 (excluding 35 & 36 – being Nalban Bheri areas), the core Salt Lake Township as being 3,05,779 in 26,000 dwellings. This is roughly 10 square km area.

While many amenities got indeed set up over years much beyond plot distributions, many amenities got left un-built even after 50 years of its existence – markets, schools, pavements, community centres, playgrounds, or even transportation on the Kestopur canal – as envisaged in the Master Plan.

It is essential that all basic features of the infrastructure are put in place without further delay.

D. CHANGE IN CITY CHARACTER

From the days of Master Plan approval in 1964, 60 years have already passed as we witness drastic changes of most factors considered on a long term perspective. Economic character of residents having changed with earning and technology, intensive attraction for living in just an extension city, transferring of many government departments and administrative offices into this township, added commercialisation, and now the additional level permitted on the same plot – have all contributed in putting enough strain on the earlier "well planned out" new Salt Lake Township on its energy demand, water sourcing, treating, storage and supply, drainage and sewerage load and their treatment, solid waste management, clean air space, car parking lot, adequacy of road surface area, supporting education, health and recreational facilities and also on administrative controls.

It is not really exactly matching the old Master Plan today.

E. INADEQUACIES BEING FELT NOW

Most of us old residents of Salt Lake, do notice the left-out un-constructed features which were present in Master Plan, as also the huge gap between the demand and supply situation of features, facilities and infrastructure of Salt Lake City resulting from huge addition to its population, their much enhanced average level of earning and spending power than before, advent of newer technology with both common and complicated household appliances (including multiple air-conditioners) in large numbers in every household, and most importantly, multiple number of personal vehicles unsupported by owners' owned premises.

F. UN-CONSTRUCTED LEFT-OUTS

One of the foremost tasks for administration team may be proposed as completing all the left-out un-constructed work – constructing all the bare pavements, markets, children parks, community complex.

BD Market complex, since its beginning, is far below standard in comparison to CA Market which has a better 2-storied facilities; recent renovation taking place in BD Market has not been able to make it a double-decked decent market place.

"Jhupri Market" in CE block remains a "Jhupri" market still, with no proper or structured market worth any mention, constructed still. No good grocery shop, no good fish market, no good flower stall, no stationery shop, no good saloon, no good

tailoring, no ready-mades,...

The large plot (school ?) adjacent to Jhupri Market on its eastern side remains unutilised for what it was meant for its residents – instead, now being privately occupied and public property abused.

The large vacant plot in DA block near the CCC-I office of WBSEDCL is neglected for a long time and has become grazing ground for illegal cattle farm.

Most importantly, footpath in front of plots within the CE block, as like some other blocks too, have never been paved, and authorities seem to be not ashamed about their failure in providing basic road infrastructure to residents. Some of the richer residents have created personal decorative permanent facilities (driveway or ramp) for own use on such unpaved "public" strip of land meant for common utilities, as in South–West corners of BE block. In older times, many plot holders tried to convert the shabby unpaved footpath strip into flower beds, but then had to resort to fencing it also to protect the plantations from stray cattle. Pedestrians, on their turn, are forced to walk on the roads – thus making them more congested, with slower traffic flow and severely prone to road accident hazards.

G. DANGERS OF URBAN PROGRESS

As residents installed and started using Air-conditioners, Microwave ovens, OTG, Mixer-Grinders, Dish-washers, Induction heaters, Vacuum cleaners and such other appliances, energy requirement multiplied. Such loads were not fully considered in the '60s or '70s. Failures and power trips being experienced gradually as also supply cable faults. Power Distribution Company noticed the upward change in demand and progressively upgraded their distribution, underground cable, and meter ratings too.

Water Supply was initially dependent on ground water extraction, filtered and stored in overhead tanks before supply to plots. Eventually Surface (River) Water pumping and treatment started and boosted to centralised reservoirs for supplies through the laid network.

Not much up gradation might have been possible in handling drainage and sewerage water, which are underground. Before many houses came up, there were open fields in the township to catch rainwater and to percolate that to ground below. With the same area of the township, there is no back-charging the ground and thus the entire precipitation has to be carried through the drainage. Sewerage must have been overloaded also, with much bigger houses being constructed by richer residents

coming in; paying guests, rentals and homestays being more common and with an additional level also being allowed over older restrictions.

The single-most significant effect of technological and economic progress in the land has been reflected in use and ownership of personal vehicles jumping leaps and bounds. In '60s and in early '70s, very limited percentage of middle income Bengalis could afford a car in the family. Hardly 25% of those initial settlers in Salt Lake had any car, though a garage used indeed to be constructed as a provision. The Salt Lake roads those days were thought to be very wide and spacious, while designated parking lots, very few in number were sparse and hard to find by.

At this time, there are surely much more than one car per family and many single houses with additional levels and families have 4-5 cars per plot very easily. In some plots it is possible to accommodate one vehicle in the garage and a couple more in the wider passage, but many car owners are finding it too easy to "garage" their cars occupying public space on roads, thereby extending "owned" property illegally. This is too selfish and uncaring action of a car owner to its neighbours and for common road users, including their safety issues. NO ONE, AS EVERYONE WOULD AGREE, HAS ANY LEGAL RIGHT TO ANNEXE SOME PUBLIC SPACE TO STORE AND "GARAGE" OWN PROPERTY, BY ILLEGALLY OCCUPYING AND EXTENDING OWN "OWNED" PROPERTY BOUNDARY.

In addition to "free" unlawful annexation of road space, many owners are found keeping their cars on the footpath also – occupying space meant exclusively for pedestrians.

The apparently looking very wide roads of yester years have become too narrow lanes today for much higher traffic on one hand, and also for a line of vehicles "garaged" all the length on the other hand. This has resulted in traffic getting severely congested, slow and irritating.

Another notable adverse effect of progress of the township has been dumping and obstructing road (public) space and footpath (also public) with construction and demolition materials and even converting the space as a workshop of bar cutting, bending, joining. Does anyone have any legal right to annexe public space this way or pollute the area with harmful flying dusts and also clogging hydrants with sand and concrete mix ? A more caring mind for wellbeing of neighbours and environment would think of (i) any dumping on own unconstructed 55% of the plot (ii) phasing out the construction to enlarge storing place, (iii) covering the site with dust screen

to prevent particles flying, (iv) periodic watering for dust suppression, (v) frequent disposal of demolished materials (vi) phasing out incoming supplies on JIT basis, and (vii) never occupy public space or cause obstructions or difficulties or hazards arising out of own activities.

H. TRAFFIC AND ROAD SAFETY IN SALT LAKE

Safe roads and its smooth traffic flow are two very important characteristics of a planned city. In the original plan, intersections were designed as circles or roundabouts when the volume of traffic was too low and traffic signalling was not considered necessary.

Footpaths near the intersections were not visually or physically obstructed with un-authorised stalls nor were there 3-wheelers picking up, dropping in or waiting for passengers at all intersections.

Roundabouts were constructed quite large in perimeter for decorative gardens, bird nests, statues or fountains and only two tracks were mostly possible surrounding them, with a strip of circular footpath also, as a buffer/safety zone.

Lane marking on the roads were not essential for those days of lean volume of traffic. Even at approach of intersections lane or stop marking were not absolutely necessary in low traffic.

Cut-outs on roads were quite useful for easy U-turn mid-way towards crossing over to a road on the other side away from intersections.

Things have drastically changed from those early days.

Roads have become too narrow due to vehicles "garaged" on the side (somewhere both the sides encroached).

Public transport buses are plying more and more and their unruly and uncontrolled behaviour make them stop only at intersections blocking traffic, for picking up and dropping down passengers under competition between their routes.

Advent of union-managed 3-wheelers without government regulated fare charts, are much more unfriendly to road safety as they only wait at, pick up from and drop in their passengers at street corners thereby completely clogging the traffic.

Forcible occupancy of footpath with stalls or "garaged" cars or dumps, or of parked and picking up vehicles at intersections are dangerous obstructions to view of any motorist causing accident hazards.

While lane marking and disciplined driving (and enforcement) on road are very simple solution to safety, most of Salt Lake roads have no lane marking even on

its arterial avenues and cross roads. Training to drive on marked lanes – straight, turning left or right itself render enough safety and smooth flow. Roundabouts have all become bottlenecks to good flow and serious thoughts must be given by authorities to shorten the perimeter and improve passage area.

The easiest thing but most undesirable from safety point of view is putting up humps, bumps and road barriers by administration without adequate (2 – 3) warning ahead. All blockages are unhealthy for life of engines, their fuel efficiency, the brake linings and for endangering environment, in addition to causing irritation or loss of concentration to motor drivers.

Improper issue of driving licences without imparting adequate knowledge of driving rules, road signs, board instructions, right of way, understanding purpose of amber light or of compulsory stopping before a stop line, is a very harmful factor against road safety (and society) when many illiterate paid drivers are ruling the road. Administration may consider periodic refresher courses for licensed drivers. A street study at any approach to a roundabout would establish that 80% of drivers do not know that a U-turn is not possible at its approach. Similarly, authorities may consider strict adherence to all vehicles stopping before marked Stop Line.

Public Vehicle Drivers must be sensitised never to slow down or stop within 50 metres of any intersection.

I. HEAT ISLAND EFFECT

As in any urban settlement, uprooting of shrubs, grass or natural vegetation for building of houses on permitted construction area of plots, and also cemented yard area for rest of the plot essentially prevents any evaporative cooling effect - to give rise to "Heat Islands" with absence of such natural cooling phenomenon. Average temperature of the constructed city rises from effects of such "Heat Islands" on all plots.

J. POLLUTION IN THE AIR

For the initial settlers in Salt Lake Township, air for breathing was clean enough without much gaseous contamination, except for fine floating sand particles and for "parthenium" shrub pollens considered harmful for lungs due to allergic respiratory issues.

After intense settlement started, the environment started getting polluted with construction dusts, vehicle emissions, street dusts, greenhouse gases from household

cooking and combustions, waste dumping and burning, VOC from painting and joinery, and such other pollutants generated from modern technology practice.

Very much harmful household indoor air pollutants are aerosols, mosquito repellents, room fresheners, body sprays, perfumes, daily burning of incense sticks, frankincense (puja – dhuno), apart from huge quantity of harmful combustion gases produced for cooking from coal, oil or gas fired ovens.

It is to be borne in mind that any combustion requires, and thus depletes, oxygen from air, and generates CO, CO_2, NO_X, SO_X and particulate matters (PM) in the first stage followed by GHG – Green House Gases in secondary reactions.

Any science minded person would also agree that the (holy) burning of incense sticks or frankincense sprayed upon burning coconut coir are quite unholy because they cause immense harm and toxicity to our own breathing tracts and lungs, as also to all pet animals and flying insects, many of them are helping pollination in plants for flowers and fruits. Honey Bees weighing only a few gms, get deranged by such harmful fumes, so as not to be able to reach the honeycomb destination, after their picking up mission.

ALL BURNINGS, INCLUDING INCENSE, ARE TOO HARMFUL TO US ALL, AND NATURE

It would good for all residents to consider electric way of cooking - instead of burning wood, coal, kerosene, or LPG gas in the ovens, kilns, burners of kitchen. Prevention of combustion gaseous products and PM would not only be more healthy to one who cooks but for the entire family in the house and for the environment and nature too. Stop incense burning too.

K. GREENING THE PLACE

As explained before about "Heat Island" effects raising average temperature it is imperative to make a township green to be sustainable. Greeneries contribute in trapping PM and in regenerating oxygen by photosynthesis in day time. It is part of bio-diversity too by sheltering and feeding various kinds of birds and helpful insects. Additionally, a philosophy of social forestry with fruit plants help contributing to social basket.

L. SOLID WASTE MANAGEMENT

This is one of those most neglected issues in Salt Lake City. In early days, vertical drum-

like vats were placed at some street corners – never to be evacuated or segregated or sent for, processing. Subsequently some brickwork permanent type of vats were constructed for collection, to be transported for dumping at some site acquired for the purpose by the Municipality.

Recently, a set of blue and green coloured buckets have been distributed to each family for source segregating dry and wet wastes so that the wet waste could straightaway go for composting, while dry (blue) bucket contents could be processed. However, neither any serious awareness program have been conducted for residents, nor municipal SWM collectors are found trained in the next stage of SWM. Informally, these SWM boys are segregating only such materials which give them instant revenue and thus are earning quick cash, while Municipal formal processing units are not becoming effective or remunerative. Finally, dumping and soil (also ground water) contamination remain the only option – thus failing to manage solid waste miserably. Press compacting or Incinerating combustibles, without primary segregation, would aggravate the problems of downstream processing and contaminations.

IT IS ESSENTIAL THAT A SERIOUS SWM ACTION PLAN IS PUT IN PLACE IMMEDIATELY.

M. CAR PARKING LOTS

As already explained earlier, Salt Lake was never planned for so many vehicles as of now, and had not planned for designated car parking lots. With more commercial plots and businesses operating, a city must have adequate car parking facility, or else all roads are getting choked with free "illegal" garaging by private annexation of public road (and footpath) space, and are causing immense problems for road use by drivers, pedestrians and also plot owners in terms of obstructed view, slow traffic movement and accident hazards.

Many would wish to suggest that Municipality may consider using vacant plots everywhere for constructing multi-level self-sustaining car parking lots, in addition to identifying places for public car parking.

It would be essential to ensure that no illegal annexation of public road space is permitted for any kind of storage : car garage or building materials.

N. FOOTPATH AND STREET INTERSECTIONS

It needs to be an urgent mission of a combined initiative : Block Committees,

Bidhannagar Police, Municipal Corporation and U. D. Dept. of Government to construct footpath in all places of the township, without exception, in such a way that there is absolutely no obstruction, no waterlogging, no tripping, with smooth surface suitable for aged, challenged and children, wheelchair, strollers, walkers, walking stick, and with gentle sloped gradients and ramps.

For street turns, corners and intersections anywhere, the same combined mission must also ensure no obstruction within 50 metres, no stops, no alighting or picking, no waiting of 3-wheelers or rickshaws

O. LOOKING FORWARD FROM HERE

Various aspects of city living facilities and conveniences, their inadequacies and limitations, considerations for road safety, abuses and indiscipline, contaminations and pollution, air quality and domestic abuse of environment, have been presented in this composition – with some suggestions to prevent deteriorations and also identifying some possible improvement areas for sustainable living in Salt Lake City of the future.

Conscious and kind citizens may come together to initiate a process of rejuvenation of the township by taking along block associations, municipal corporation, police and urban department for a joint mission together.

About the Author :

The author, Barun Kr Basak a 1971 batch Mechanical Engineer from B. E. College , living in Salt Lake since 1977, has seen the township transform from a remote and deserted barren field without access to public transport and market, and with hoards of mosquito hovering over head – to a vibrant and most sought after residential place in Kolkata. His keen interests in Renewable Energy, Environment and Economic Sustainability makes him take initiatives in various platforms for reforms towards better future of humanity.

Mob : 9432492989; E-mail : barunb71@gmail.com

Beyond the Gulf: A Journey to Kerema, Papua New Guinea

Amitabha Datta, 1974, Civil

A personal account of navigating remote Papua New Guinea for a water and sanitation project—and discovering the deep humanity at the heart of isolation.

Manila: The Briefing Begins

In May 1999, my firm, STUP Consultants, entered a competitive bidding process for an Asian Development Bank–assisted Water Supply, Sanitation, and Capacity Building Project in Kerema, the capital of Papua New Guinea's Gulf Province. The assignment required not just technical expertise, but also a deep sensitivity to the complexities on the ground.

I first flew to Manila to meet with the ADB project officer and gather background information. The project officer briefed me with a mix of data, local contacts, and an unspoken warning: Kerema was not a place for the unprepared.

Port Moresby: Gateway to the Unknown

From Manila, I travelled to Port Moresby, Papua New Guinea's capital, to liaise with government departments and NGOs. At Jacksons International Airport, the first impressions were of raw energy—a vibrant city teeming with contradictions. Modern vehicles shared the road with barefoot street vendors. The Department of National Planning and Monitoring provided me with letters of introduction to Kerema's Governor and other local officials, along with contact information for several Indian-origin doctors working in PNG.

One evening, I dined with Indian medical professionals who shared candid insights into life in Port Moresby. While the warmth of the Indian diaspora was reassuring, they emphasized the city's high crime rate. Armed guards, security systems, and electric gates were standard features of daily life. "We adapt," said one doctor, "but you never really let your guard down."

First Glimpse of Kerema

Kerema lies on PNG's southern coast, nestled between dense rainforests, mangrove swamps, and the sprawling Papuan Gulf. Though underdeveloped compared to the capital, the town is blessed with raw natural beauty. Elevated homes on stilts with retractable steel stairs serve as ingenious defences against flooding, snakes, and other wildlife.

The indigenous Toaripi, Kea, and Opao communities practice subsistence living—fishing, hunting, and cultivating crops like sago, taro, and yams. Infrastructure is minimal: a rudimentary airstrip, sparse healthcare and educational facilities, and a tenuous connection to the outside world via the reliable but tiny DHC-6 Twin Otter aircraft.

The Flight: In Transit to Another World

One morning, I boarded a Twin Otter from Port Moresby's domestic terminal. Eighteen passengers were squeezed into the small aircraft. My crisp shirt and polished shoes made me an obvious outsider among the barefoot locals dressed in colourful prints. The flight, lasting roughly ninety minutes to Kerema. With a brief stop at Kerema, it was to fly to other part of PNG. While stopping at Kerema, came with a stern warning from the captain: "Return within 40 minutes or we leave without you!"

We landed on a grassy airstrip that doubled as the town's airport. There, I was met by the tall and gracious Governor, along with Dr. Ashok Dam, a UN Volunteer and the region's beloved Medical Officer. Dr. Dam kindly invited me to stay with his family, sparing me the alternative: a humble guesthouse run by the Missionaries of Charity.

A Home in the Wilderness

At the Dam residence, overlooking the quiet Gulf waters, I was welcomed like family. Over tea, we discovered a mutual connection: Dr Dam's wife, Rita, knew Parna, the wife of Subir Mitra, a friend and college batch-mate of mine. In fact, they are cousin sisters. The world felt wonderfully small, even in this remote corner of the planet.

That evening, the family insisted on an early dinner and rest. Nightfall in Kerema brings spectacular lightning storms—an orchestration of thunderclaps and torrential rain that felt both terrifying and majestic. As the sky roared above us, I watched in awe, a silent witness to nature's nightly performance. We spoke of India, Papua New

Guinea, and the quiet courage it took to live in such isolation.

Days of Work and Witness

Over the next day, I visited water supply systems, rainwater harvesting projects, and met with local administrators. While technical challenges abounded—difficult terrain, resource limitations, and a fragile maintenance system—there was a tangible sense of ownership and pride among the community.

Dr. Dam was revered throughout the region. He had arranged antivenom supplies from India at his own expense and coordinated emergency air evacuations for snakebite victims. His tireless dedication had earned him two extensions on his posting—an unusual distinction in such a remote station. “People here don’t forget kindness,” he once said to me as we watched village children splash in a rain-fed pond.

Farewell, With a Delay

On the day of my return, I reached the small airport early, only to learn my flight had departed ahead of schedule. Momentary panic gave way to calm as Dr Dam reassured me: “There’ll be another plane. Things work out here—on their own time.”

Indeed, a few hours later, another aircraft touched down. I boarded with a heart both heavy and full, taking one last look at the land that had so generously hosted me.

Reflections on Kerema

Kerema’s challenges—remoteness, erratic infrastructure, wildlife dangers, and tropical storms—are real and persistent. But what left a lasting impression was the resilience of its people and the strength of its community. Here, simplicity was not lack; it was elegance. Hospitality was not formal—it was instinctive.

From the never ending conversations with the Dam family to community water tanks, from thunder-filled nights to barefoot schoolchildren, every experience taught me something. Development, I realized, is not just about systems and structures. It is about trust, humility, and the quiet work of building relationships.

Kerema—tiny on the map, enormous in heart—will forever remain etched in my memory.

Brahmanic Cosmology: A Personal Reflection through the Entropy of Modern Living

Deepayan Kumar Das,1997, Mechanical

The period, between late September and the end of October, is usually one of the taxing times as I find myself living through one of the most professionally and socially stressful phases. Professionally, a lot of things seemed to converge at once. Apart from the usual operational pressures, the company budget had to be closed— a particularly challenging exercise where you one needs to juggle profitability, growth and market realities. It becomes particularly challenging in a growing economy like India where shareholder expectations are on a continuous rise and yet forecasts and plans are often threatened by global instability: wars, tariff, regulations, currency fluctuations each of them a wave which tends to hit the best laid plan with ferocity of a Tsunami threatening to wash away everything.

Apart from this, this year I had some more in my plate a string of industry events to attend, Board meetings, and the Annual shareholders' meeting had to be wrapped up in this period . Managing all these while coaching a Head of Finance who was not up to the mark was almost driving me to the brink of burnout. It felt like running on a treadmill where the speed kept changing without warning.

And then came the festive season. As a Probasi Bengali, Durga Puja is a social anchor especially if you are a member of the organizing committee. The celebrations which are usually followed by Dipawali within three weeks, can itself be pleasantly daunting. Moreover, at home we perform Jagadharti Puja as well— a personal ritual which is very close to our heart. Durga, Kali and Jagadharti, Pujas—t hree consecutive forms of Shakti, representing a different dimension of cosmic feminine energy, is but bound to incite Spiritual thoughts in oneself.

Moving between tense boardrooms, Durga Puja awards, Grandeur of Noth Indian Dipawali and the gentle glow of the Puja room at home, created a strange emotional dissonance. Between the dhaak cultural nights, khichuri bhog, lights, and chants, a question began rising quietly within me: What are these rituals for ? Are they a form

of Bhakti alone? Is it a cultural continuity which has flown through times? Is it a Social Festival? Or are they more symbolic— ancient metaphors which shaped our culture and lives over times immemorial?

It was in this overlapping space between professional pressure and ritual immersion that my thoughts began to flow, almost travelling non-linearly. I found myself entering a kind of reverie, it was only thanks to modern technology that I was able to keep pace with the flow and ensure not much is lost over time. This internal churning lead to a kind of vision on the state of our modern living.

As the vision cleared and I got my thoughts organized, the realization dawned that today, most of of the time we tend to live almost like being in a pressure cooker. Material success has become the most important benchmark of success. The corporate race pushes people to deliver more and more each year, in a VUCA world while social media, meanwhile, has subjected us to constant virtual scrutiny. We tend to now curate our lives more methodically than we live them. We care more about our virtual image and identity instead of experiencing and displaying authenticity.

Despite our growing social networks, human friendships have become rare. Modern marriages struggle not from lack of love, but from ability to converse meaningfully. Families share homes but not emotional space. And finally beneath the surface of a digitally satisfying life lies a silent epidemic of loneliness.

A natural fallout is the growing burden of mental health issues, especially in India given our upbringing, it remains heavily stigmatized. Lack of awareness, limited facilities, and societal stigma do not allow people to easily admit their vulnerability or seek help. Most suffer in silence, turning to addiction or Religion for solace (the latter being more common and socially acceptable). The depth of the rot can be gauged from the fact that a certain “Baba Bageshwar Dham” is believed to have solution from a malignant tumor to a missed promotion. Unfortunately, organized religion, heavy on ritual and dogma, offers little relief from these modern pressures. It provides, maybe a flexible moral boundary but seldom does anything to address the psychological challenges or existential fatigue.

Against this background, my thoughts and reflections during the festive period started crystallizing into a novel conceptual model: The dynamic interplay between order and chaos. It dawned on me that every form of Shakti represents this dynamic in a different way. Durga embodies protective order, Kali embodies transformative destruction, and Jagadharti represents vigilant stability. I found myself questioning Are

these merely mythic stories or do they represent deeper psychological archetypes and metaphysical principles.

This realization eventually metamorphosed into what I would now dare propose to introduce as "The Brahmanic Cosmology": a modern metaphysical framework based fundamentally on ancient intuition yet relevant to contemporary psychological realities. The idea is actually simple to comprehend : Brahman is the infinite ground of existence (imagine this as the all prevalent field of fundamental energy), the field from which everything else emerges. From this field emerge two fundamental yet probably opposing forces— Devaic (order) and Asuric (chaos). Devaic forces represent harmony, structure, stability, and meaning. Asuric forces represent disruption, entropy, and transformation. And unlike the mythological binary result of Devaic wining over Asuric. Life, both cosmic and personal, sustains not by one wining over the other but by the constant tension between them.

I invite you to visualize this through an electric-current analogy. If Brahman is the inert conductor, then Deva and Asura are the poles (+/-) of the battery which initiates and sustains the flow of current, and the universe is the luminous current generated between them. Our minds operate the same way. Every internal struggle—anxiety, ambition, fear, creativity—is an echo of the cosmic interplay within us.

Modern life, however, thrives to suppress one side while revealing the other. It demands endless order— productivity, schedules, responsibilities, popularity, wins while and punishing healthy chaos— rest, introspection, emotional release, uncertainty. Naturally we all are chasing a Mirage where one always wins and never loose. It is this chase which is the root cause of all stress in the modern life.

History is witness that approximately every 1,200 to 1,500 years, humanity has reinvented its spiritual grammar. Buddhism emerged from the society's fatigue of rituals, Advaita was born of philosophical fragmentation, and Sikhism emerged during sociopolitical turbulence of1400s. Today, we are faced with a new kind of crisis— psychological, digital, existential— and our existing religious frameworks are too outdated to address it. Don't misunderstand me we do not need a new god; we need a new language to understand ourselves.

In that sense, Brahmanic Cosmology is not an alternative to existing religion, but perhaps the starting point for a new orientation. It attempts to blend religious philosophy with the realities of modern psychology. It explains why we feel the pressures the way we do, and how these pressures may not be personal failures or

shortcomings but natural imbalances within a larger cosmic dynamic.

As my own experience over those intense weeks showed me, understanding and empathizing with this interplay can be deeply grounding. It helped me visualize my overwhelmed state not as weakness but as a sign that my internal forces were in a state of imbalance. It also reminded me that rituals, stories, and ancient symbols still hold wisdom, if we know how to interpret them and this interpretation can vary from person to person with none of the interpretations being wrong.

Perhaps a new spiritual framework will emerge in the coming day. Perhaps it will not. But this journey the merging of personal experience, ancient philosophy, and reflective dialogue has for me at least opened a path of inquiry that feels both meaningful and necessary.

And maybe that is how new ideas always begin: not with grand declarations, but with quiet realisations during the most difficult months of our lives.

Ground Improvement techniques to increase bearing capacity of Soil

Snehashish Basu, *1986, Civil*

Abstract.
Kolkata and its neighbourhoods formed on the Gangetic alluvium plains, below the mean sea level in typical Kolkata soil. Upper layer upto 1.5 m. is often found with decomposed vegetation with silt/clay. For 2 to 3 storied structures deep foundation with Pile foundation becomes techno commercially unviable option. On the other hand, Shallow foundation in many cases found risky with chances of irregular settlements. Considering the above criticality ground improvement of sub soil is always a better techno commercial alternative. Proper Engineering should be done to select the scheme of ground improvement. Presently many alternatives of ground improvement technology are available in the Engineering Arena, which will be discussed with pros and cons in the article. So far Geology is concerned, it is of Recent Pleistocene age. As per number of geotechnical investigations in and around Kolkata- Howrah, it is observed upto 2.5 m. depth there is silt or clay or mix of silt and clay layers with tree stumps/roots etc. In many cases very soft to soft layer found. In recent days number of complaints are found in media regarding leaning of buildings in and around Kolkata. Proper Engineering and Geotechnical Investigation are highly required to save the future buildings.

Keywords: ground improvement, clay, silt, Kolkata

1.0 Introduction

The Bengal Basin in the eastern part of the Indian subcontinent constitutes the largest fluvio-deltaic to shallow marine sedimentary basin comprising of riverine channel, floodplain and delta plain environments.

So far Geology is concerned, it is of Recent Pleistocene age. As per number of

geotechnical investigations in and around Kolkata- Howrah, it is observed upto 2.5 m. depth there is silt or clay or mix of silt and clay layers with tree stumps/roots etc. In many cases very soft to soft layer found. In recent days number of complaints are found in media regarding leaning of buildings in and around Kolkata (A sample Image of Tangra follows). Proper Engineering and Geotechnical Investigation are highly required to save the future buildings.

Figure 1: Recent leaning of building at Kolkata
*Source: The Indian Express, Kolkata | January 24, 2025 17:12 IS*T

1.1 Methodology

Different Ground Improvement Options: -

(I). Timber Piling, (ii). Replacement of Soft soil by a mix of Sand & Jhama Metal combination, (iii). Stone Column, (iv). Soil reinforcement like Geocell/ Geomembrane, (v) Micro piling, (vii) Vibro/ Dynamic compaction, (vi) Cement sand grouting etc.

1.1.1 Timber Piling:
1.1.2 Replacement of Soft soil by a mix of Sand & Jhama Metal combination
1.1.3 Stone Column
1.1.4 Soil reinforcement like Geocell/ Geomembrane
1.1.5 Micro piling
1.1.6 Vibro/ Dynamic compaction
1.1.7 Cement sand grouting

Table 1: Grain Size Ranges for Different Treatment Methods.

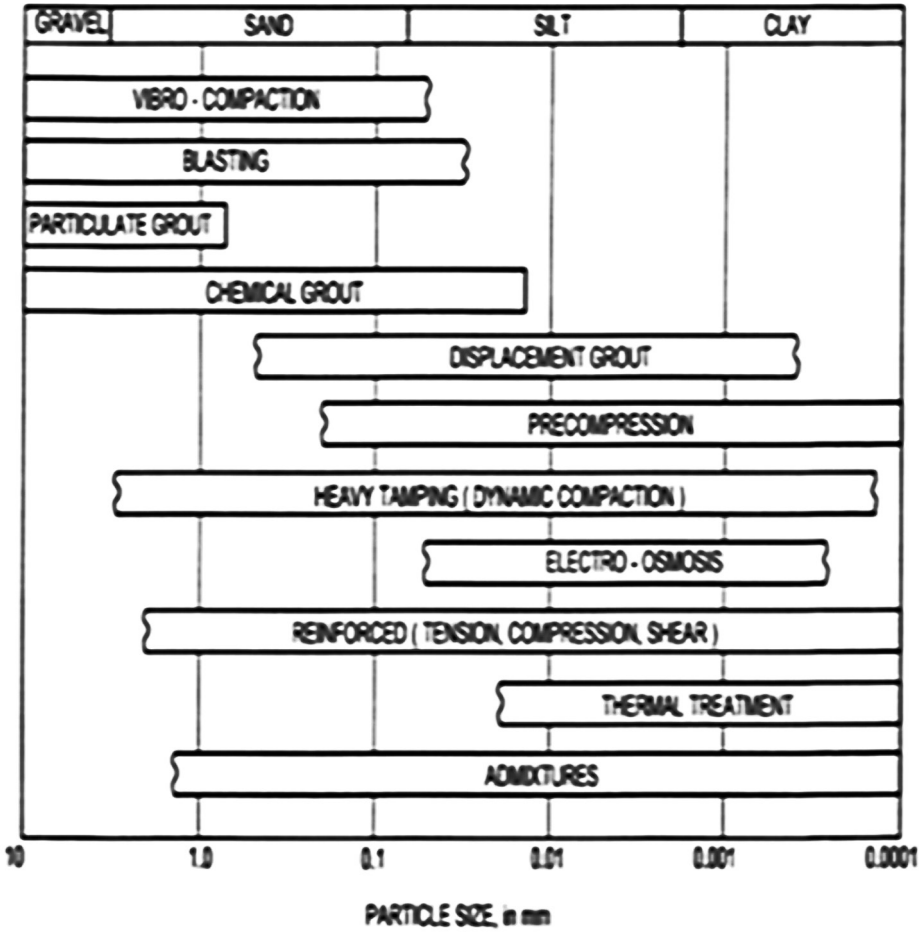

Source: IS 13094: 2021

2. Illustration of Ground Improvement Techniques: -

Timber Piling:

IS 2911 Part 2 providing guidelines for Design & Construction of Timber Piles in foundation. An image of timber piling at a site is given in the Figure 1A and an image Figure 1B shows a century old culvert is still standing on timber piling: -

Fig. 1A: Timber Piling in progress at a Site

Source: Site of the Author at Ariadaha, Kolkata

Replacement of Soft soil by a mix of Sand & Jhama Metal combination:

IS 13094: 2021 gives a guideline on different techniques of ground improvement for weak soil. Clause 6.1.5.1 narrates other methods used successfully include replacement of poor subsoil by competent fill. These methods, however have limitations of depths of application.

Part of the Haldia Medical College Building Foundation was constructed on above technique. A typical sketch is given which was used at site near Tollygunge, Kolkata in Figure 2.

Fig. 1B: century old culvert is still standing on timber piling

Source: Image collected from Google

Stone Column:

IS 15284 (Part 1) :2003 narrates guidelines for design & construction of Stone column. Different type of loading shown in the Figure 3.

As per the IS Code "The ultimate load carrying capacity of stone column may be estimated approximately on the basis of soil investigation data or by test loading. However, it should be preferably determined by an initial load test on a test column specifically installed for the purpose and tested to its ultimate load particularly in a locality where no such previous experience."

Fig. 2: Replacement of Soft soil by a mix of Sand & Jhama Metal combination

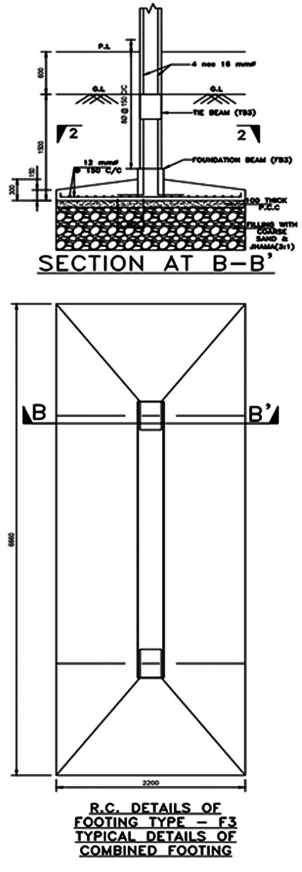

Source: Used at Site of the Author at Tollygunge, Kolkata

Stone Column is now correctly termed as Geo Pile as it is a sub structure.

Fig. 3: Different types of Loading on Stone Column/ Geo Pile

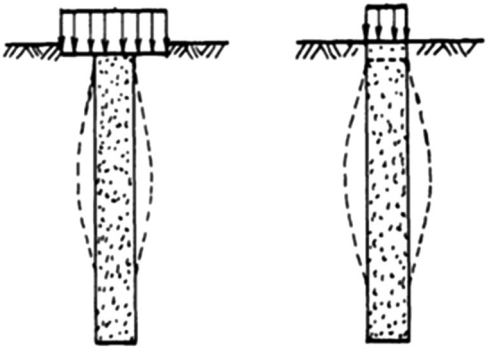

Source: IS 15284 (Part 1) :2003

Soil reinforcement like Geocell/ Geomembrane:

IS 17483 (Part 1): 2020, provides specification for Geosynthetics / Geocell. The following Figure-4 shows Geocell in expanded form.

Geocells material shall be rendered resistant to UV and the HDPE from which it is fabricated shall have minimum 2 percent by weight of carbon black content when tested as per the method given in IS 2530 to inhibit attack by ultraviolet rays.

Geocells material shall be inert to all chemicals naturally found in commonly encountered soils not containing adverse solvents and at ambient temperatures. The material of construction shall not be susceptible to hydrolysis. It shall be resistant to aqueous solutions of salts, acids and alkalis and shall be non-biodegradable.

Fig. 4: Typical image of Geocell

Source: Image collected from Google

Micro piling:

IRC: SP:109-2015 provides guidelines for design and construction of small diameter piles. British Standard BS EN 14199: 2005 'Execution of Special Geotechnical Works–Micropiles' and FHWA-SA-97-070 'Micropiles-Design and Construction Guidelines' may also be referred for more information.

Small Diameter (SD) Piles are defined as load carrying cast-in situ concrete or grout piles reinforced with reinforcing steel or structural steel section having outer diameter between 200 mm to 300 mm inclusive of metallic/non-metallic or without casing.

They are described also as Micro Piles or Mini Piles in International literature. Diameter of piles 250-300mm are generally used. Grade of concrete not less than M30 is used. As per Concrete codes minimum cover of reinforcement is 50mm. Hence minimum diameter for reinforced pile should not be less than 250mm.

Fig. 5: An image of Micropile construction sequence

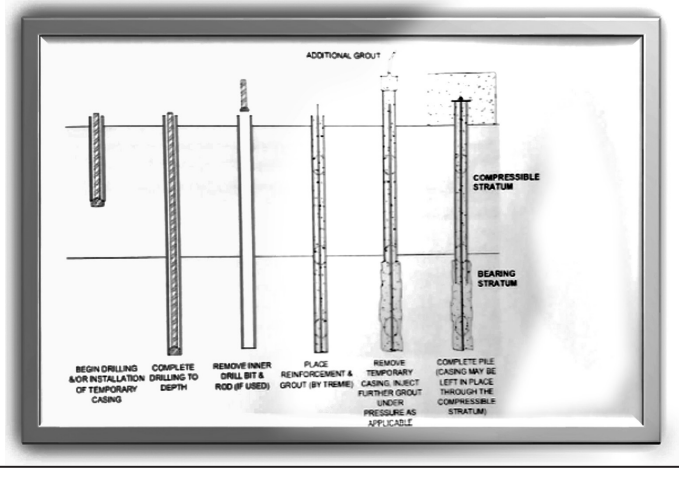

Source: U.S. Department of Transportation Publication No. FHWA NHI-05-039 Federal Highway Administration December 2005ed NHI Course No. 132078 Micropile Design and Construction

Vibro/ Dynamic compaction:

There is no specific IS code for this technique, however in IS 13094: 2021 some discussions on Vibro compaction/ dynamic compaction are found. The following image Figure 6 is of Dynamic Compaction. Effective for cohesionless soil.

Fig. 6: An image of Dynamic Compaction

Source: Image collected from Google

Cement sand grouting:

IS 4999: 1991 is providing the guidelines for grouting of Pervious soils and IS 14343: 1996 provides guidelines for choice of grouting materials for alluvial soil. Two consecutive images are given in the following Figure 7:

Fig. 7: image of Grouting by Ascending & Descending methods

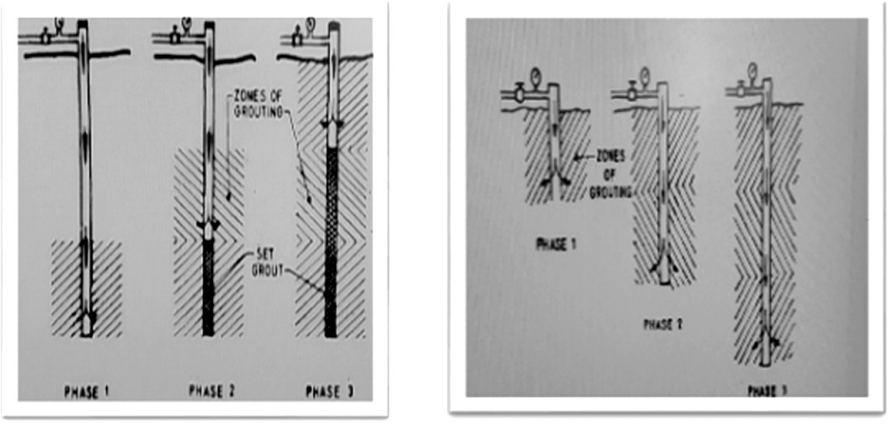

Source: IS 4999-1991

Practical display of grouting progress at a site of Barrackpore is given below in Figure-6C: -

Fig. 8: image of Grouting at a Site of the Author at Barrackpore

Source: Image taken at Site of the Author at Barrackpore, Kolkata

Normal Kolkata deposit are remnants of vegetation of the area, lower Gangetic floodplain has been formed over the years by continuous churning and deposition of sand and silt carried from the uplands. In many areas decayed woods/ vegetation are often found in subsoil and upto 3-4.5 mtr weak soil is often found. (1)

In this concrete situation before recommending any ground improvement technique, geotechnical investigation is must.

If Stone column is recommended then after installation a load test is always required.

For Geocell the material to be tested before installation and to be tallied with the quality mentioned in IS Code.

From the decade of 70s of last century foundation of many 4-5 storied buildings constructed on timber piling support.

Soil Grouting is used in many cases for soil stabilization and settlement arrest of already erected structures and also in increasing strengthening sub soil for cohesionless soil.

For marshy land soil replacement is very effective. In south Kolkata a few real estate housings developed using the technique between 2010 and 2024.

Considering the recent leaning of number of flats/ buildings in and around Kolkata, this article is prepared.

3. Conclusion

In this study, it was found that proper techniques to be chosen considering grain size, bearing capacity and purpose. Nowadays viability on the basis of Techno commercial aspect is a major criterion for selection of best alternative. No generalise technique can be chosen. After analysis of ground reality particular technique to be chosen by the Authorised Geotechnical Engineer.

Acknowledgment

This paper is an output of the experiences and knowledge acquired from various codes and textbooks.

References

1. Dastidar & Ghosh,1964
2. Basu, 2001 -2025

3. IS 13094: 2021
4. IS 2911 Part 2
5. IS 15284 (Part 1) :2003
6. IS 17483 (Part 1): 2020
7. IRC: SP:109-2015.
8. IS 4999: 1991
9. IS 14343: 1996

References

1. Dastidar & Ghosh,1964. "A Study of Subsoil Conditions of Calcutta" taken from Proceedings of the Symposium on 'The Study of Soil Properties in Calcutta Region', held on 18th & 19th September, 1964.

Basu_ Snehashish_ Ground Improvement techniques to increase bearing capacity of Soil

আমি

অনিন্দ্য ঘোষ, ২০০০, *ইলেক্ট্রনিকস (এম ই)*

#
কতটা অপেক্ষা করলে রৌদ্র স্পর্শ করবে?
কার্তিকের মধ্যরাতে শিশির স্নানে আপ্লুত আমি
কৃষকের হাসির মধ্যে সোনালি ধান দুলতে থাকে
অনুভূতির মধ্যে তুমি দাঁড়িয়ে থাকো
হৃদয়ের মৃত্তিকা মেখে, আমার ক্যানভাসে
রং ছড়িয়ে দাও অলীক কল্পনায়।
#
লবঙ্গ মাখা তোমার দেহ শূন্য লতার মতো
ছেয়ে যায় পশমের গোড়ায়, নাভির ব্যালকনিতে,
স্নিগ্ধ নিঃশ্বাস তোমার আমাকে দোলাতে থাকে,
অস্থিরতার সমুদ্রের ঢেউ, বিরহী বসুন্ধরায়।
হেমন্ত উতলায় আমাকে ঢেকে রাখে তোমার কবিতায়, তুমি নদী সাগর সমুদ্র গ্রাস করে
এখন দাঁড়িয়ে আছো রাজকিনির পুণ্য ভূমিতে।
#
রাত চলে যাক শিশির মুছে যাক দুঃখ নেই
এই হেমন্তে তোমার মিউজিয়ামে প্রটেক্ট পিকচার
আমার দেহের হার্ট ফাউন্ডেশন।
শুধু তুমি শুধু আমি রুপালি পূর্ণিমা আলোয়।

পার্থর প্রেম

মলয় নিয়োগী, *১৯৮০, ইলেকট্রিকাল*

হেমন্তের এই সাত সকালে আজ বহুকাল পরে নিজের গ্রামের পথে একা হাঁটতে হাঁটতে পুবাকাশে নজর পড়তেই উদীয়মান সূর্য দেখে নিজের অজান্তেই কখন যেন দু'হাত এক সাথে করজোড়ে সূর্যদেবতাকে প্রণাম করলেন প্রবীণ চিত্তবাবু। যদিও তেমন কোনো ঈশ্বর ভক্তি সচরাচর দেখা যায় না তাঁর চালচলনে আবার তিনি নাস্তিকও নন। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে সেই ব্যাল্যকালের বহু স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলো একটু একটু করে চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। বিস্তীর্ণ সবুজ ধানখেত চিরে আঁকাবাঁকা সর্পিল পথ দুটো গ্রামকে যেন এক সূত্রে জুড়ে দিয়েছে! বর্ষা পেরিয়ে শরতের শেষে কচি শীষ বেরিয়েছে ধানগাছে। হেমন্তের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় ধীরে ধীরে তাতে সবুজ থেকে একটু একটু সোনালী আভা আসছে, যার ওপর দিয়ে স্নিগ্ধ হালকা হাওয়া ঢেউয়ের মতো বয়ে যায়...দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যেত! অপূর্ব সুন্দর নির্মল ছিল গ্রামের পরিবেশ। মানুষজনও অনেক সাধাসিধে ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল একদমই সাদামাটা।

এখন আর কোথায় সেই বিস্তীর্ণ মাঠ, ধানখেত মাথার ওপরে নীল আকাশে ধবল বকের দল ...!!

সবকিছুর আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে বিগত চার-পাঁচ দশকে। মফঃস্বলের শহর সংলগ্ন এই গ্রামের হাল তেমন কিছু বদলায়নি। শুধু ধুলো-কাদা মাটির পথ এখন ছালচামড়া বেরিয়ে যাওয়া খানাখন্দে ভরা ধূসর পিচের রাস্তা। যেখানে আনমনে হাঁটাও ঝুঁকিপূর্ণ!

তবুও সাবধানে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, এবার ফেরা উচিৎ, না হলে দেরি হয়ে যাবে, অহেতুক অন্যের দুঃচিন্তার কারণ হবার কোনো অর্থ হয় না।

তাই চিত্তবাবু ফেরার পথে পা বাড়ালেন। একটু এগিয়ে উত্তর দিকে একটা পায়ে চলা পথ দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। দু'দিকে কয়েকটা নারকেল, সুপারি গাছ বংশানুক্রম রক্ষার্থে এখনও কোনোরকমে টিকে আছে। চিত্তবাবুর মনে পড়ে গেল এইখানেই সুতীব্র মিষ্টি গন্ধভরা কাঁঠালি চাঁপা ফুলের কয়েকটা গাছ ছিল। ছোটোবেলায় সাপের ভয়কে উপেক্ষা করে কাঁঠালি চাঁপা ফুল তুলে সুলেখা কালির খালি দোয়াতে জল ভরে তার মধ্যে ওই ফুল রেখে দিতেন আর মিষ্টি গন্ধ ঘরময় এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করত। এইসব ভাবতে ভাবতে আর একটু এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল ছোটোবেলার বহু পরিচিত 'সান পুকুর'। চারদিকে গাছপালায় ঘেরা, মসৃণ বাঁধানো পুকুর ঘাট, স্বচ্ছ টলটলে জল। যেখানে আজ থেকে কিছু না হলেও প্রায় ছ'দশক আগে পাড়ার সমবয়সিদের সঙ্গে কত ঝাঁপাঝাঁপি করে অপটু হাত-পায়ে সাঁতার কেটে স্নান করেছেন। সেসময়ে পাড়ার 'সান' ছিল এই সান-পুকুর। হায়, একী দশা হয়েছে তার! ইঁটে নোনাধরা ভগ্নদশা ঘাট। অযত্নে অবহেলায় সেই পুকুর আজ এক মজে যাওয়া ডোবায় পরিণত হয়েছে। মনটা সত্যিই খারাপ

হয়ে গেল। চিত্তবাবু ধীরে ধীরে পৈতৃক বাড়ির পথে পা বাড়ালেন।

বাড়ি ফিরে প্রাতঃরাশ সেরে দ্বিতীয়বারের চায়ের কাপটা নিয়ে বারান্দার আরাম কেদারায় বসে চিত্তবাবু কয়েক চুমুক দিতে দিতে, বাড়ির লাগোয়া বাগানে বিভিন্ন রকমের ফুল ও সবজির গাছগুলোকে নিবিষ্ট মনে প্রত্যক্ষ করছিলেন, এমন সময় পাশের ঘরে চলা টিভিতে গানের কয়েকটি কলি কানে এল 'কে প্রথম চেয়ে দেখেছি, কে প্রথম ভালোবেসেছি, তুমি না আমি!!...' এই গান শুনতে শুনতে আবার কখন যেন পুরোনো দিনে ফিরে গেছেন চিত্তবাবু...চোখের সামনে সব ছবির মতো ভাসছে যেন এই সেদিনের কথা...

কলেজে পড়ার সময়, তা প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, পুজোর ছুটিতে পাড়ার তিন বন্ধু মিলে বেড়াতে গেছেন; 'বিকাশ, পার্থ আর আমি। আমরা গ্রামের স্কুল থেকে পাশ করার পর আমি একটা আবাসিক কলেজে পড়ি, বিকাশ ছোটোখাটো একটা চাকরি করে আর পার্থ কলকাতার একটা নামী কলেজে পড়ে। আমাদের প্রত্যেকের বাবাই বিভিন্ন পদে রেলওয়ে কর্মচারী। আমরা তখন ছাত্র, অতএব বাবার কাছে আবদার করে সবাই একটা করে রেলওয়ে পাশ নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করলাম পুজোর ঠিক দিন দুয়েক পরেই। প্রথমেই আমাদের গন্তব্য ছিল আগ্রা। সবার সঙ্গে একটা করে ব্যাগে কয়েকটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, রেলের পাশ ইত্যাদি । পকেটে মেরেকেটে শ'তিনেক করে টাকা আর দু'-তিন পাউচ ক্যাপস্টেনের টোব্যাকো।

দেরিতে প্ল্যান করার ফলে যথারীতি রিজার্ভেশন না পেয়ে আমরা তুফান মেলে অসংরক্ষিত কামরায় বসে বসে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় আগ্রায় পৌঁছে একটা সস্তার হোটেলে উঠলাম। তখন প্রায় বিকেল। যথারীতি প্রচণ্ড খিদেয় পেটে ছুঁচোর কীর্তন চলছে। পাশের একটা ভাতের হোটেলে গিয়ে পাঁচ টাকায় ভরপেট চুক্তিতে আমরা তিন মূর্তি প্রায় গলা পর্যন্ত খেয়ে ক্ষান্ত হলাম। তারপ্র শেষ বিকেল ও সন্ধেটা আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সম্রাট শাজাহানের এক অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি প্রেমের সৌদ্ধ 'তাজমহল'-এর কোণায় কোণায় ঘুরে ঘুরে সব সৌন্দর্য প্রাণ-মন ভরে উপভোগ করলাম ও অন্তর থেকে কুর্নিশ জানালাম সেই সময়কার অত্যন্ত দক্ষ কারিগরদের, যাদের কলাকুশলী বিশ্বমানের এই স্মৃতি সৌধকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের এক অন্যতম হিসেবে পরিগণিত করেছে।

অনেকেই হয়ত ভাবছেন আমি ছোটোবেলার ভ্রমণ কাহিনীর স্মৃতি রোমন্থনে ডুব দিয়েছি! মোটেও না।

মুখ্য ঘটনার শুভারম্ভ হল পরদিন সকালে। আগ্রায় আরও কয়েকটি দর্শনীয় স্থান যেমন ফতেপুর সিক্রি, আগ্রা ফোর্ট, জুমা মসজিদ, আকবর, হুমায়ুন টুম্ব ইত্যাদি ঘুরে দেখার জন্যে হোল-ডে ট্রিপ-এর একটা (মিনি) বাসের টিকিট কেটে আমরা তিনজন পাশাপাশি বসলাম। প্রথমে কে জানলার দিকে বসবে এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে রফা হল যে প্রত্যেক জায়গায় বাস থেকে নেমে দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করে আবার যখন বাসে করে পরের জায়গায় যাব তখন নিজেদের সিট পরিবর্তন করে বসব যাতে প্রত্যেকই জানলার দিকে বসতে পারে।

বাস চলছে নিজেদের মধ্যে টুকটাক কথা বার্তা চলছে, পার্থ বেশিরভাগ সময়ই জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে, এর মধ্যে বিকাশ ফিসফিস করে বলল, তোরা কি বাসের অন্যান্য সিটে কারা কারা বসে আছেন একটু লক্ষ করেছিস? আমরা দু'জনে মাথা যতটা সম্ভব স্থির রেখে চোখের মণি এদিক ওদিক ঘুরিয়ে বুঝলাম বাসের বাঁদিকের সিটগুলোতে আমাদের পাশের ও আগের সারিতে গোটা পাঁচেক সিটে জুড়ে একটা বাঙালি পরিবার বসেছেন এবং আরও লক্ষণীয় বিষয় হল যে, তাদের মধ্যে ফ্রক পড়া দুটো

বেশ ভালো দেখতে মেয়েও রয়েছে। আমাদের মতো কলেজ পড়ুয়া ল্যাজবিশিষ্টদের আন্দাজে তারা স্কুল পড়ুয়া দুই বোন। আরও কয়েক মিনিট পরে তাঁদের নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে বোঝা গেল, বাকিরা বাবা-মা ও এক ছেলে, যে বালিকা দু'জনের থেকে বড়ো কিন্তু আমাদের থেকে হয়ত বয়সে একটু ছোটোই হবে! অতএব আমাদের কাছে চলমান বাসের জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতির দৃশ্যের চেয়ে বাসের ভেতর মানুষজন, তাদের কথাবার্তা স্বাভাবিকভাবেই বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। প্রথমেই বাস থামল ফতেপুর সিক্রিতে। আমরা সবাই নেমে চারদিক ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম, সাথে সাথেই সেই বাঙালি পরিবারের দিকেও নজর রাখছিলাম। আমাদের মধ্যে পার্থ পড়াশোনায় বেশ ভালো ছিল। ওর আবার ডাইরি লেখারও অভ্যাস ছিল। যেখানে আমরা যা কিছু দেখছিলাম, পার্থ তার নিজের ডাইরিতে নোট করছিল।

আমাদের মধ্যে পার্থর কাছে তখনকার একটা আগফা ক্যামেরাও ছিল তাতে আমরা একটা রিল ভরিয়ে খুব বেছে বেছে ফটো তুলছি যাতে বেশি দিন চলে, যদিও তাজমহলে বেশ কয়েকটা ছবি গতকালই তোলা হয়ে গেছে।

কিন্তু, বিখ্যাত 'বুলন্দ দরওয়াজা'র ফটো তো তুলতেই হয়। এখানেই দেখা গেল আমাদের সাথে সাথে ওই বাঙালি পরিবারের সদস্যদের ফটো তুলছেন ওই পরিবারের একমাত্র ছেলেটা। কিন্তু ওদের সমস্যা হল, তাদের সকলের একটা গ্রুপ ফটো কে তুলবে? আমরা যেন এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। পার্থ সবার আগে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল আমি কি আপনাদের সবার একটা গ্রুপ ফটো তুলে দিতে পারি? ছেলেটি সাগ্রহে রাজি হয়ে বলল, হ্যাঁ ভালোই হবে তুলে দিন, বলে তার ক্যামেরাটা পার্থর হাতে ধরিয়ে দিল, পার্থ তৎক্ষণাৎ নিজের নাম, কলেজের নাম ঠিকানা লেখা ডাইরিটা দু'জনের মধ্যে বড়ো মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে একটু মিষ্টি করে বলল, এটা একটু ধরবেন? এই শুরু...তারপর আমরা আরও কয়েকটি দর্শনীয় স্থানে নামলাম, ঘোরাঘুরির মধ্যে টুকরো টাকরা বাক্যালাপের মধ্যে আমরা লক্ষ করছিলাম যে পার্থ বড়ো মেয়েটার সঙ্গে স্বাভাবিক দূরত্ব বজায় রেখে ভাব-বাচ্চে একটু একটু কথাবার্তা বলছে! যাইহোক, পরবর্তী পর্যায়ে বাসের জানলার দিকে আমি, মাঝে বিকাশ তারপর পার্থ বসেছিল। আমরা বেশ বুঝতে পারছিলাম পার্থ ওই পরিবারের সবার সঙ্গেই বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। তাই আমাদের মধ্যে বাসের সিটে বসার অবস্থানের আর পরিবর্তন করা হয়নি। এটা ছিল আমাদের এক অলিখিত সমঝোতা। অবশেষে আমাদের বাসযাত্রা প্রায় গোধুলিতে সম্পন্ন হল। আমরা ওদের সবাইকে সৌজন্যমূলক বিদায় জানিয়ে আমাদের হোটেলে ফিরেই প্রথমে আমরা বাকি দু'জন পিঠ চাপড়ে ও তালি দিয়ে পার্থকে অভিনন্দন জানালাম এবং সেই রাতের খাবারটা পার্থর ঘাড় ভেঙে খেয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে দিল্লির ট্রেনে বসলাম। পার্থর চোখে মুখে এক দিকে যেমন এক ভালোলাগা ও অজানা উন্মাদনার ছাপ আবার ওপর দিকে বিচ্ছেদের হতাশা, আমাদের মতো কৈশোর থেকে সদ্য যৌবনে পা দেওয়া ছেলেদের চোখেও ধরা পড়ল। তারপরের পাঁচ ছয় দিনে আমরা দিল্লি থেকে হরিদ্বার, দেরাদুন, মুসৌরি, হৃষিকেশ ও লখনউ মনের আনন্দে ঘুরে বেড়িয়ে সবার পকেট একদম গড়ের মাঠ করে যে-যার বাড়ি ফিরলাম।

'ও ছোটো দাদাই, ছোটো দাদাই...খাবার হয়ে গেছে... মা তোমাকে স্নান করতে বলছে...', 'আমি তোমাকে কখন থেকে ডাকছি ...তুমি কী ভাবছ আর বিড় বিড় করে বলছ!! আমার কথা শুনতেই পাচ্ছ

না, চা'টাও পুরো শেষ করোনি!!' ফুটফুটে নাতিটার ডাকে এতক্ষণে চিত্তবাবুর সম্বিত ফিরল। সত্যিই তো ছোটোবেলার জগতে এতক্ষণ বিচরণ করছিলেন।

যাইহোক, স্নান খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার বিকেলের ট্রেনে নিজের বর্তমান বাসস্থানে ফিরতে হবে সন্ধে এবং অফিস কাছারির ছুটির ভীড়ের আগেই।

অতএব, ঘণ্টাখানেক পর সবার থেকে সেদিনের মতো বিদায় নিয়ে কাছাকাছি স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে পড়লেন। পরের স্টেশনে বেশ কয়েকজন নেমে যাওয়ায় বসতে সিটও পেয়ে গেলেন চিত্তবাবু। লোকাল ট্রেনে বসলে অনেকেই বেশ ঢুলতে থাকে, কিন্তু চিত্তবাবু ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার কখন হারিয়ে গেলেন সেই ফেলে আসা যৌবনে। পড়াশোনা আর পরীক্ষার চাপ বাদে তখন ছিল বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা, নির্মল আনন্দের সময়। এইসব ভাবতে ভাবতে আবার ফিরে গেলেন তিন-বন্ধুর নিঃস্ব হয়ে বাড়ি ফেরার পরবর্তী পর্যায়ে...

'বাড়ি ফিরে তিনজনই যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে যাই। মাঝে মাঝে বিকাশের সঙ্গে দেখা হলেও ইদানিং পার্থকে দেখাই যায় না। অবশেষে, পুজোর ছুটিতে একদিন পার্থকে পাওয়া গেল। আমরা দু'জনে ঠিক করলাম, পার্থর এই টানা নিরুদ্দেশের বিষয়ে ভালো করে না জেনে আজ পার্থকে কোনোভাবেই ছাড়ব না।

অতএব, আমরা তিনজন গ্রামের খেলার মাঠের এক কোণে গিয়ে বসলাম। বিকাশ বলল এই সিগারেটটা আগে তুই জ্বালা এবং ভালো করে দম নিয়ে তারপর বল কী কারণে তুই পাড়া থেকে বেশ কয়েক মাস একদম বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিলিস? পার্থ না না পাড়াতেই ছিলাম কিন্তু একটু ব্যস্ত ছিলাম বলে তোদের সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। তারপর, বলতে শুরু করল...তোরা হয়ত লক্ষ করেছিলিস যে, সেদিন আগ্রার বাসে বড়ো মেয়েটার সঙ্গে আমার বার বার চোখাচোখি হচ্ছিল আর 'ও' মুচকি হেসে লজ্জায় মুখটা ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। হালকা দু'-একটা কথাও হয়েছিল। কেন জানি না, আমারও মনে হচ্ছিল যে 'ও' আমার সঙ্গে আরও অনেক কথা বলতে চায় অনেক কিছু জানতে চায়!

যাইহোক, বাস থেকে নেমে বিদায় নেবার সময় 'শোভা' সবার অলক্ষে আমার হাতে একটা ছোট্ট চিরকুট গুঁজে দিয়েছিল যাতে ওদের বাড়ির ঠিকানা লেখা ছিল। সেই কথাটা আমি তোদের থেকে লুকিয়েছিলাম বলে ক্ষমা করে দিস কিন্তু। ওর নাম শোভা। বিকাশ বলে উঠল ঠিক ঠিক আছে...তারপর কী হল বল। পার্থ বিকাশের হাত থেকে প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা নিয়ে একটা লম্বা সুখটান দিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল। বাড়ি ফেরার পর থেকেই কীরকম যেন লাগছিল!! ক্লাসে স্যারেদের লেকচারে মন দিতে পারছি না, বাড়িতে বই নিয়ে বসলেও জানলা দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকি। এইভাবে ঠিক লাগছিল না। একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আগরপাড়া স্টেশনে নেমেই পড়লাম, তখন প্রায় সন্ধে হয়ে গেছে অজানা অচেনা জায়গায় একদমই স্বল্প পরিচিত কারোর বাড়ি যেতে একটু ভয় এবং সংকোচ তো হচ্ছিলই, তাও মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে মিনিট দশেক হেঁটে একটা চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করে ওদের বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছে গেলাম। প্রথমে তো শোভার মা ভূত দেখার মতো কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন, ততক্ষণে শোভার ছোটোবোন বিভা দরজায় এসে বলল, মা তুমি চিনতে পারছ না, পার্থদা, আমাদের সঙ্গে আগ্রায় বাসে আলাপ হয়েছিল! ভদ্রমহিলা ততক্ষণে একটু ধাতস্থ

হয়ে কিছুটা নিমরাজি হয়েও আমাকে বাড়িতে বসতে বললেন। শোভা তো আমাকে দেখে হাঁ করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল! ভদ্রতার খাতিরে ওর মা আমি চা খাব কিনা জানতে চাইলে আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতে উনি রান্নাঘরে গেলেন। শোভা একটু সুযোগ পেয়ে আমার হাতে হালকা চিমটি কেটে, মনে হল, আমার সাহসিকতার প্রশংসা করল। চা-বিস্কুট খেতে খেতে কিছুক্ষণ বেশ গল্প হল, তোদের কথা জিজ্ঞেস করল শোভার ছোটো বোন। এইভাবেই আরও কয়েকবার ওর স্কুল ও আমার কলেজ যাওয়া আসার পথে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। এর মধ্যে শোভা মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করে কলকাতার একটা নামী স্কুলে ইলেভেন-এ ভর্তি হয়েছে। জানিনা আগে কতদূর কী হবে! তবে, এইটুকু বুঝতে পারছি যে, আমরা দু'জন দু'জনকে কয়েকদিন না দেখলে দু'জনেই অস্থিরতা অনুভব করি।

ও মশাই! ও মশাই! শুনছেন!!

উঠুন, কোথায় যাবেন? ট্রেন তো শেষ স্টেশনে পৌঁছে গেছে, সবাই নেমে যাচ্ছে! এবার তো ট্রেন উল্টোদিকে যাবে... অফিস ফেরতা নিত্যযাত্রীদের চিৎকারে চিত্তবাবুর এতক্ষণে চমক ভাঙল!

একটু ধাতস্থ হয়ে কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা এক হাতে চেপে ধরে সাবধানে ট্রেন থেকে নেমে পার্থ ও শোভার কথা ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলেন ...

তারপর...

পুরোনো সেই গাছের কথা

সুবীর চৌধুরী, ১৯৭১, *সিভিল*

২৯ জুলাই ২০২৫ সানদিয়েগো থেকে লাসভেগাস যাওয়া আর ১ সেপ্টেম্বর ফেরার সময় রাস্তার ধারে কিছু অদ্ভুত আকারের গাছপালা দেখলাম। জায়গাটা মরুভূমির মতন, ধুধু প্রান্তর শুধুই বালি আর বালি তবে কিছু জায়গায় কালচে বালিও দেখা গেল। বেশ দূরে পাহাড়, তার রঙও কালো, সবুজের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। গাছ বলতে মাঝেমাঝে ক্যাকটাস জাতীয় কিছু গাছ (California Barrel Cactus — Calscape, Mojave Fishhook Cactus, Mojave Hedgehog Cactus) আর অদ্ভুত আকারের কিছু গাছ, যার নাম জশুয়া। দক্ষিণ আমেরিকার Mojave Desert অঞ্চলে এই গাছগুলো দেখতে পাওয়া যায়। এটি এক ধরনের Yucca Plant, এই জাতের গাছের বিশেষত্ব হল এরা মরুভূমিতে প্রচণ্ড গরম সহ্য করতে পারে আর জল ছাড়াই বেঁচে থাকে বহুদিন গরম আবহাওয়ার মধ্যে। জশুয়া গাছগুলো মোজাভে মরুভূমির ইকোসিস্টেম রক্ষা করে আসছে সেই প্রাচীন যুগ থেকে। এই গাছ মরুভূমির বন্যপ্রাণীদের বাঁচতেও সাহায্য করে।

জশুয়া এক ধরনের Yucca, Succulent, একে ঠিক গাছ বলা যায় না। গাছটি মাটি থেকে একটি গুঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে, ডালগুলো দেখতে কাঠের মতন তবে অসমান, ছুঁচালো, কাঁটাযুক্ত আর পাতাগুলো ঠিক তলোয়ারের মতন। গাছগুলো খুবই ধীরে বাড়ে আর মরুভূমির তাপমাত্রা কিছুটা কম হলে গাছে ডালপালা বার হয় আর ফুলও ফুটতে থাকে। বেশিরভাগ গাছ চল্লিশ ফুট উঁচু হয়, তবে কিছু গাছের উচ্চতা কুড়ি থেকে সত্তর ফুটও হয়। জশুয়া গাছ মোটামুটি দেড়শো বছর বাঁচে তবে কিছু গাছকে হাজার বছর পর্যন্ত বাঁচতে দেখা গিয়েছে। সাধারণত ক্যালিফোর্নিয়া, এ্যারিজনা, নেভাদা আর উঠা অঞ্চলের মোজাভে মরুভূমিতে এই জশোয়া গাছ আর ক্যাকটাসগুলোকে দেখতে পাওয়া যায়।

আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে Joshua Tree National Park (Located in Southern California, primarily in Riverside and SanBernardino counties, spanning the boundary of the Mojave and Colorado deserts) থেকে এই গাছের সারি ও সংখ্যা বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে। ইকোলজিক্যাল বিশেষজ্ঞদের মতে 21st century-র শেষের দিকে হয়তো এই গাছের সংখ্যা প্রায় ৯০% কমে যাবে আর মরুভূমির ইকোসিস্টেমের আমূল পরিবর্তন হবে। মরুভূমি অঞ্চলের ভয়াবহ দাবানল, বেশিরভাগ জায়গায় বুনোঘাসের প্রকোপ, জাশুয়া গাছের বীজের বনের মধ্যে বিস্তার এবং নতুন গাছ জন্মানোর পথে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে।

উদাহরণস্বরূপ সারা পৃথিবীর প্রায় ১৩% বা ১.৩ মিলিয়ান জশুয়া গাছ এই Mojave মরুভূমিতে দেখা যায়। আর সেই কারণে মরুভূমিতে জশুয়া গাছ কমে যাওয়া চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

শোনা যায় বিংশ শতাব্দীর আগে আমেরিকার আদিবাসী, Cahuilla-রা জশুয়া গাছের ফল খেত। জশুয়া গাছের ফল গুচ্ছ আকারে জন্মায়, দেখতে অনেকটা কলার কাঁদির মতন। ফলগুলো দেখতে ওভাল সেপড বা ডিম্বাকৃতি। গাছে ফুলের কুঁড়ি আসে স্প্রিং সিজনে আর এর পরেই গাছে ফল দেখতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের আদিবাসীরা জশুয়া গাছের ফল পুড়িয়ে আর সিদ্ধ করে খেত। ফলটি আগুনে পোড়ানোর পরে মিষ্টি খেতে লাগে আর ক্যান্ডির মতন গন্ধ পাওয়া যায়। আমেরিকার আদিম মানুষরা জশুয়া গাছের ফলগুলো দিয়ে কেক তৈরি করে রেখে দিত, যা অনেকদিন ধরে সংরক্ষণ করা যেত। জশুয়া ফলের ভিতরে থাকা বীজও খাওয়ার প্রচলন ছিল আমেরিকান স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে। বন আর মরুভূমিতে জন্মানো কিছু গাছের কচিপাতা, গাছের বীজ, বন্যজন্তু আর Kangaroo-Rat (ছোটো এক জাতের ইঁদুর যারা মরুভূমিতে বাস করে)-দের প্রধান আর মূল্যবান খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

জশুয়া গাছের পাতা বেশ শক্তপোক্ত, এই গাছের পাতার বোনা আঁশ থেকে ঝুরি, পায়ে পড়ার চটি, জুতো আর কিছু কাপড় বানানো হত। এছাড়া পাতার আঁশকে পেচিয়ে মোটা দড়ি তৈরি হত। গাছের গোটা পাতা একসঙ্গে বেঁধে অনেক সময়ে ব্রাশ, ঝাঁটা বানানো হত, যা আদিবাসীরা তাঁদের ঘরদোর পরিষ্কার করতে ব্যবহার করত। ইতিহাসের পাতা থেকে আরও জানা যায় জশুয়া গাছের পাতার আঁশ থেকে কাপড় আর মাদুরও তৈরি হত।

এছাড়া জশুয়া গাছের ফুলের কুঁড়ি আর ফুলের নরম পাঁপড়ি হালকা জলে ফুটিয়ে তার জল ফেলে দেওয়া হত, তিক্ততা কাটানোর জন্য। অনেক সময়ে ফুলকে রোস্ট করে সুগারী ট্রিট দেওয়া হত। প্রাথমিক ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারীরা (Early European Settlers) জশুয়া গাছের গুঁড়ি দিয়ে তাঁদের বাড়ির পাঁচিল তৈরি করত আর গাছের টুকরো, ছাটগুলোকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করত। কারণ মরুভূমিতে বড়ো গাছ আর গাছের গুঁড়ি শুধু জশুয়া গাছ থেকেই পাওয়া যেত।

সাতরঙালু

সত্য মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৪, *মেটালার্জি*

‘কই হে দামোদর, তোমার এই ঝুপড়ির হোটেলের গোয়ালে হাঁড়িকুড়ির আওয়াজ আর কত শোনাবে, স্পেশাল ডবলটা ছাড়ো তো দেখি তাড়াতাড়ি, সেই সকালে বেরোনো থেকে এই বেলা ন’টা পর্যন্ত পেটে একফোঁটা চা-ও পড়েনি।’

জম্পেশ করে তার জন্য নির্দিষ্ট ভাঙা চেয়ারটাতে বসে মাথা থেকে বারান্দাওয়ালা টুপিটা খুলে সামনের নড়বড়ে টেবিলটা থেকে একটা মাছিকে আঙুলের টোকায় উড়িয়ে দিয়ে শিবুকা চারদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, ‘কী ব্যাপার বলো তো, আজ দেখি রবিবারের সকালের আড্ডায় রামধনু দলের সাতরঙালুদের কোনো বাবুরই পাত্তা নেই, আমি কি আগে চলে এসেছি?’

বাঁ হাতের কব্জিতে ঢলঢলে একটা তেলচিটে ময়লা চামড়ার ব্যাণ্ডে মাঝারি সাইজের চৌকো লেডিজ্ ঘড়ি চোখের কাছে নিয়ে দেখে বলে উঠলেন, ‘নাঃ, আমি তো ঠিক টাইমেই এসেছি, ছেলেগুলোই দেখছি ইনডিসিপ্লিন্ড হয়ে যাচ্ছে।’ ঘড়ির সাদা ডায়ালটা ময়লা বিবর্ণ হয়ে গেছে বলে ঘড়ির কাঁটা দুটোও আর ঠিকমতো ঠাহর করা যায় না, ঘড়িটা চোখের বেশ কাছে এনে দেখতে হয়। শিবুদার খুব মায়া ঘড়িটার ওপর, বলেন অনেক ইতিহাস জড়িয়ে আছে ওটার সঙ্গে। রানি ভিক্টোরিয়ার যেবার কোলের কুকুর ‘ইন্টিমেসি’ হারিয়ে গিয়ে পাগল-পাগল দশা প্রায়, মনের দুঃখে সাতদিন না খেয়ে গায়ের জামাকাপড় প্রায় ‘খুলু খুলু যায়’ অবস্থা, সেই সময়ে শিবুদার ডাক পড়ে, আর বলতে গেলে ভোজবাজির মতোই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মুখে ঝামা ঘষে কুকুরটা খুঁজে দিয়েছিলেন তিনি। সেই আনন্দে রানি নিজের হাতের দামী ঘড়িটা খুলে শিবুকার হাতে পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ‘ধন্যবাদ শিবুকা, আমি যতদিন বেঁচে থাকব তোমাকে মনে রাখব, তুমি আজ ইংল্যান্ডকে রানি হত্যার দায় থেকে বাঁচালে, এ ঋণ ইংল্যান্ড কোনোদিনও ভুলবে না’। সে আর এক গল্প।

শিবুকার আসল নাম শিবেন কাইতি, ছোটো করে শিবুকা। মেদিনীপুরে বাড়ি ছিল একসময়ে। এ শহরের ছেলে বুড়ো অনাদিকাল ধরে হাতের শিরা বের হয়ে আসা, মাথায় ধবধবে সাদা চুল, সাদা ভুরু আর নস্যির রঙে রাঙানো সাদা চুমরানো গোঁফের আধ ময়লা ধুতি পাঞ্জাবি পরা মাথায় বারান্দাওয়ালা টুপি, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, রোগা পাতলা চেহারার শিবুকাকে এইভাবেই দেখে আসছে। আসল নাম কেউ জানে না, বললে একটু হেসে গোঁফে তা দিতে দিতে বলেন ‘আমি হলুম বিশ্ব নাগরিক, আমার থাকার ঠিকানা কি আর একটা রে? হট্টমন্দিরের তো আর অভাব নেই’।

প্রথম দফার চা-টা শেষ করে সবে এক টিপ নস্যি ডান নাকে গুঁজে দিয়েছেন, হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল এক দঙ্গল ছেলে। নিয়ম মেনে ঠিক পর পর আলু, কালু, ধলু, পলু, ইলু, বিলু ও নীলু। এরাই হল

রামধনু ক্লাবের সাতরঙালু। স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে কোর্টের পেশকার, ফুড ডিপার্টমেন্টের কেরানি, কলেজের লেকচারার মায় ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি আর এম. বি. এ. পড়ুয়াও আছে। তাদের ক্লাবের নাম তাই সার্থক। বয়স সবার একুশ থেকে ছাব্বিশের মধ্যে।

উল্টো দিকের বেঞ্চে ছেলেগুলো থিতিয়ে বসতেই শিবুকা বাঁ দিকের নাকেও এক টিপ নস্যি গুঁজে দিয়ে পাঞ্জাবির ডান পকেট থেকে এক থোকা সাদা রুমাল বেছে নিয়ে আর নস্যির রঙে বিবর্ণ হয়ে আসা সাদা গোঁফটা একটু মুছে নিয়ে বাকি রুমালগুলো বাঁ পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। সবাই জানে বাঁ পকেটে ছ'টা সাদা রুমাল রাখলেন সপ্তাহের বাকি ছ'দিনের জন্য। এইটাই যা শিবুকার এক বিলাসিতা। সকালের শুরুতে রোজ একটা করে সাদা রুমাল চাই সারা দিনের ব্যবহারের জন্য।

উল্টোদিকের বেঞ্চে বসা আলু আর কালুর মধ্যে হাতে ধরা একটা খবরের কাগজের আড়ালে কী একটা ফিস্ফিস্ করে কথা হচ্ছে দেখে ধমকে উঠলেন শিবুকা— 'এই আড্ডায় এসে আবার মেয়েদের মতো লুকিয়ে চুরিয়ে কী কথা রে! ব্যাটাছেলে যা বলবি সোজাসুজি বল্।' কাগজটা টেবিলের ওপর রাখতেই বড়ো বড়ো হরফে লেখা 'আবার আর ডি এক্স ধরা পড়ল আম্বালার কাছের একটা ইণ্ডিকা গাড়িতে। পুলিশের সন্দেহ দেওয়ালির সময়ে নাশকতার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল দিল্লি।' কাগজের লেখাটা এক নজর দেখেই শিবুকা মুখটা একটু বেঁকিয়ে অন্যদিকে তাকালেন। দামোদর তখন সবাইকে এক রাউণ্ড চা দেবার জন্য তোড়জোড় করছে।

খবরটা চায়ের টেবিলে এনে ফেলার জন্যে ধলু আপ্রাণ চেষ্টা করতে গিয়ে তোতলাতে আরম্ভ করল— 'এই পা পা পা উডারটা খু খু ব মা মা মারাত্মক তা তা তাই না শি শিবুকা?'— 'চুপ কর তো তুই, আমাকে আর পাউডার দেখাসনি' বলে এক দাবড়ানি দিলেন শিবুকা। সবাই মিলে ধলুকে এই মারে তো সেই মারে, উত্তেজিত হয়ে গেলে ধলুর আবার গিয়ার মারা অভ্যাস বলে সবাই একটু অন্য চোখে দেখে ওকে। আসল কাজটা কিন্তু হয়ে গেল। আর ডি এক্স এসে পড়ল টেবিলের ওপরে। ভবি কিন্তু ভোলবার নয়। কোনো কথা বলার আগেই শিবুকা হাঁক পাড়লেন দামোদরের দিকে— 'দামোদর, আজ দুপুর বারোটা পর্যন্ত সব চা আর পাকোড়ার হিসেব ধলু বাবুর অ্যাকাউন্টে।'

পুরু কাঁচের চশমাটা খুলে দু'হাতে আলোর দিকে ধরে কী যেন দেখলেন শিবুকা। তারপর একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কী যেন পাউডারের কথা বলছিলি।' খেই ধরিয়ে দেয় পলু,— 'আর ডি এক্স নিয়ে কথা হচ্ছিল শিবুকা।' উদাস সুরে শিবুকার জবাব— 'মারাত্মক কি না জানি না, তবে আমার এই সাদা চুল, ভুরু আর গোঁফের জন্য দায়ী আর ডি এক্স।' যাদবপুরের ফাইনাল ইয়ার কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র ইলু টিপ্পনী কেটে উঠল— 'শিবুকা কি পাউডার মনে করে, নাকি নস্যির সঙ্গে মিশিয়ে...'

'দূর গাধা, এই ঠান্ডায় কি আর কেউ পাউডার মাখে? আর নস্যি নিতে শুরু করেছি তো সবে পঁচাত্তর বছর আগে, তার আগে আমার এই চুল, গোঁফ, দাড়ি সব ছিল অমাবস্যার আকাশের মতো কালো। আসলে, আমার রাঁধুনি রণদেব ষড়ন্তীর ভুলে নুন মনে করে আর ডি এক্স খেয়ে ফেলেছিলুম। আর্সেন্যালে আয়না রাখার হুকুম ছিল না, তারপরের পনেরো দিন আমার আর কোনো জ্ঞান ছিল না। ইতিমধ্যে কখন যে সব চুল সাদা হয়ে গেছে জানতেও পারিনি, ভয়ে কেউ আর তাই নিজের চেহারাটাও নিজের কাছে অচেনা হয়ে

ছিল বহুদিন পর্যন্ত।'

কেউ কিছু বুঝতে না পেরে এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে দেখে শিবুকা বললেন, 'তাহলে শোন, প্রথম থেকে বলি। আমি তখন লন্ডনের উলউইচ বলে একটা জায়গায়। দক্ষিণ পশ্চিম লন্ডনের টেমস নদীর দক্ষিণ পাড়ে এক সাদামাটা বিল্ডিং, রয়্যাল আর্সেন্যালের ল্যাবরেটরিতে— ইংরেজ শাসিত ভারত থেকে গেছি বিশেষ গোপনীয় মিশনে এক শক্তিশালী বোমার উপকরণ রিসার্চ করে বার করার জন্য। প্রথম মহা বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। জার্মান ইউ-বোটের ধাক্কায় ইংলন্ডের বড়ো বড়ো ফ্রিগেট, যুদ্ধজাহাজ, বন্দরের অবস্থা আর কহতব্য নয়। ওপর থেকে গোপন হুকুম এল, ইউ-বোটকে নাকানি-চোবানি খাওয়ানোর জন্য তোদের শিবুকাকে দিয়ে শক্তিশালী এক বোমার উপকরণ আবিষ্কার করার জন্যে। গোপনীয়তা রক্ষা করে কোথায় রিসার্চ করা হবে, সেটা ঠিক করার ভারও আমার ওপর পড়ল। এর আগের বারে যখন এসেছিলাম, তখন আমার পরামর্শ মতন যুদ্ধবন্দিদের দিয়ে টেমস নদী থেকে একটা খাল কাটিয়েছিলাম রয়াল আর্সেন্যালের ল্যাবোরেটরির পূব পাড় ধরে, যার নাম দিয়েছিলাম অর্ডন্যান্স ক্যানাল। তার পূর্বদিকে একটা দ্বীপ ছিল ফ্রগ আইল্যাণ্ড নামে। ঠিক করলাম ওখানেই হবে আমাদের গোপন রিসার্চ।

ইলু আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, 'আজকের আর ডি এক্স কি তাহলে আপনারই আবিষ্কার? তার গলায় বিদ্রূপের সুর স্পষ্ট। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠলেন শিবুকা, 'সত্যি, তোদের ধৈর্য্য এত অভাব, কি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করবি জানি না, আচ্ছা বল তো তুই তো কেমিক্যালের ছাত্র, আর ডি এক্স-এর ট্রেড নেম, কেমিক্যাল নেম আর ফর্মূলাটা কী'? বোমাটা ছুঁড়ে দিয়ে আর এক টিপ নস্যি নিয়ে 'বেশ হয়েছে, আর এরকম বেয়াদপি করবি' গোছের মুখ করে তাকিয়ে থাকা বাকি শ্রোতাদের দিকে এক পলক দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন শিবুকা।

যেন খুব সহজ প্রশ্নের উত্তর সব জানা আছে এরকম মুখ করে ইলু বলে উঠল, 'ট্রেড নেম রিসার্চ ডেভেলাপমেন্ট এক্সপ্লোসিভ, কেমিক্যাল নেম হল সাইক্লোট্রাই ট্রাই— কী যে ছাই— ধুর— খুব বড়ো একটা নাম।

'জানতাম, তোর দৌড় ওই ট্রাইয়ের মসজিদেই শেষ হবে। শুনে রাখ্, বাইরে সবাই এটাকে রিসার্চ ডেভেলাপমেন্ট এক্সপ্লোসিভ বলে জানলেও ওর আসল নাম হোল রণ দেব ষড়ন্তী। রণর আর, ইংরাজিতে দেবের ডি এবং ষড়ন্তীর এক্স, কারণ ষড়ন্তী বানান লিখত এক্স এ আর এ এন টি আই। ইংরেজরা বড়ো ধূর্ত জাত তো, ভাঙবে তবু মচকাবে না, তাই সাপও মরবে আবার লাঠিও ভাঙবে না গোছের করে নামটা রেখে দিল আর ডি এক্স। কেমিক্যাল নামের গোটা কথাটা হল, সাইক্লো ট্রাইমিথাইল ট্রাইনাইট্রামাইন, বিশ্বের বাজারে আর ডি এক্স বললেও আমেরিকাতে বলত সাইক্লোনাইট, জার্মানিতে হেক্সোজেন আর ইতালিতে টি ফোর। অবশ্য সে তো অনেক পরের কথা। আসলে কি জানিস এর মধ্যে আছে তো সেই হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন আর কার্বন। কার্বনের তিনটে আর বাকিগুলোর ছটা করে অ্যাটম মিশিয়ে বিশেষ একটা শৃঙ্খলে বেঁধে ফেললেই হয়ে গেল তোদের আজকের আর ডি এক্স। তো সেটা বার করতেই আমার কেটে গিয়েছিল বারোটা বছর। ১৯২৫ থেকে ১৯৩৭। অবশ্য স্বীকার করতে লজ্জা নেই, রণদেব না থাকলে আরও কত বছর যে লাগত কে জানে। বারোটা বছর আমার আন্ডারে দশ জন সায়েন্টিস্ট দিনরাত কাজ করে

গেছে। অথচ সব ঢুঁ ঢুঁ কোম্পানি, রেজাল্ট জিরো।'

এম বি এ পড়ুয়া নীলু এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। ওর গলাটা একটু আস্তে। মিনমিন করে বলে উঠল, 'তোমার কুক রণদেবের আবার এই আবিষ্কারে কী ভূমিকা ছিল? ও তো রান্না করেই খালাস।' কথাটাকে পাত্তা না দিয়ে শিবুকা হাঁক দিলেন, 'কী হে দামোদর, তুমি কি পাকোড়ার জন্য পিঁয়াজের চাষ আরম্ভ করলে এখন? আর কবে দেবে বাবা, পেটে যে গণেশ বাবাজীর বাহনের সাঙাতরা ডন মারতে মারতে হেদিয়ে পড়েছে।' মিনমিন করে দামোদর কী যে বলল, তা ভালো করে বোঝা গেল না।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে চুপ করে রইলেন শিবুকা। তারপর পুরোনো কথার খেই ধরে বলে উঠলেন, 'রণদেব না থাকলে আর ডি এক্স আবিস্কার হত কি না সন্দেহ। আবু সাহেব তো গোঁ ধরেছিল দু'হাজার পাতার রিসার্চ পেপার ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে শুরু করতে।'

হঠাৎ বিলু ফোড়ন কেটে বসল, 'এর মাঝখানে আবু সাহেব কোথা থেকে এল শিবুকা, তুমি তো বললে তোমার আন্ডারে সবাই ইংরেজ সায়েন্টিস্টরা কাজ করছিল?'

দামোদরের আনা ধোঁয়া ওঠা পকোড়ার প্লেট থেকে একমুঠো তুলে বেছে বেছে সবথেকে বড়োটা মুখে পুরে গরমের চোটে এগাল ওগাল করতে করতে শিবুকা খিঁচিয়ে উঠল, 'ওরে ক্ষ্যাপা, ওর আসল নাম ছিল ফ্রেডরিক অ্যাবেল, আদর করে ডাকতাম আবু সাহেব বলে। যেমন ধর, ওরই আর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল আমার আন্ডারে যার নাম ছিল জেম্স ডেনভার, তাকে আদর করে ডাকতাম জামদানি সাহেব বলে। ওরা যখন ওদের আবিষ্কার, একরকম বারুদ— 'কর্ডাইটে'-র পেটেন্ট পাওয়া নিয়ে খুব হিমসিম খাচ্ছে, তখন তোদের এই শিবুকাই তো মধ্যস্থতা করে সে যাত্রা ওদের উৎরে দিয়েছিল। এর জন্য ব্রিটিশ সরকার অ্যাবেলকে স্যার উপাধি দিয়েছিল। তবে হ্যাঁ, অ্যাবেল নিমকহারাম ছিল না, উপহারস্বরূপ এই হাই পাওয়ার চশমাটা দিয়েছিল। দিনের বেলা একরকম, যত অন্ধকার হয়ে আসবে, তত এর অন্ধকারে দেখার ক্ষমতা বেড়ে যাবে। তোরা এখন ইনফ্রা রেড নাইট ভিসন চশমা নিয়ে বড়াই করিস, আমার চোখে এটা ১৯৩০ সাল থেকে শোভা পাচ্ছে। মায়া পড়ে গেছে, তাই এটাকে আর পেনশন দিতে পারছি না।'

বলু হাঁ করে শিবুকার কথা শুনছিল। একটা পকোড়া ওর মুখে ঠেলে দিয়ে বাকি প্লেটসমেত পকোড়াগুলো নিজের দিকে টেনে নিয়ে শিবুকা বলে উঠলেন, 'তোর আর বেশি খেয়ে কাজ নেই। এইসব ভাজাভুজি বেশি খেলে তোর তোতলামিটা আবার বাড়বে।'

'তো হ্যাঁ, যা বলছিলাম, বারো বছর ধরে রিসার্চ করতে করতে আমরা বিধ্বস্ত পরাজিত সৈনিকের মতো মাথায় হাত দিয়ে বসে আছি, বেলা একটা দেড়টা হবে, জামদানি সাহেব বলে উঠল, শিবুকা আমি এই টেস্টটিউবের ট্রাইট্যুরেট করা লিক্যুইডটা ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে অন্যদিকের র‍্যাক থেকে একটু ফরম্যাল-ডিহাইড নিয়ে আসি এতে। এই বলে ময়ূরকণ্ঠী রঙের তরলটা বেসিনে ফেলে দিয়ে অন্য দিকের র‍্যাক থেকে ফরম্যাল-ডিহাইড ঢালতে গেছে, এমন সময়ে বিকট বোমার আওয়াজে ঝন্ঝন্ শব্দে জানলার সব কটি কাচ ভেঙে চৌচির। র‍্যাক থেকে তরল কেমিক্যালগুলো সব উল্টে পড়ল। এমার্জেন্সি পরিস্থিতিতে কী করতে হবে জানাই ছিল। সাইরেন বেজে উঠতেই হুড়মুড় করে সবাই বেরিয়ে এসে কাছেই একটা আণ্ডারগ্রাউন্ড বাঙ্কারে আশ্রয় নিলাম। ভাবলাম, নিশ্চয়ই জার্মান বোমারু বিমান ব্যাঙ দ্বীপের এই গোপন

ল্যাবরেটরির হদিশ পেয়ে নিকেশ করতে এসেছে আমাদের। পরের বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হল হয়তো।

'অল ক্লিয়ার সাইরেন বাজতেই যে যার জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম আমার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা রান্নাঘরটা একটা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। কাছে যেতেই একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এল। এক লাথিতে হেলে যাওয়া দরজাটা ছিটকে ফেলে দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি রণদেব মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। কোনোরকমে ওকে বের করে নিয়ে এসে চোখেমুখে জল দিতেই কথা বলার মতো অবস্থায় এসে গেল। ওর কথা শুনে তো আমরা হুর্রে বলে চীৎকার করে উঠে রণদেবকে জড়িয়ে ধরলাম।'

আলু আর ধৈর্য না রাখতে পেরে জিজ্ঞেস করে উঠল, 'কিছুই বুঝলাম না শিবুকা, জার্মানদের বোমা ফেলার সঙ্গে রণদেবকে জড়িয়ে ধরে তোমাদের আনন্দের কারণ কী?'

টেবিল থেকে টুপিটা মাথায় তুলে পরতে পরতে শিবুকা বললেন, 'ওইখানেই তো মজাটা। আসলে হয়েছে কি, জামদানি সাহেব টেস্ট টিউব থেকে যে তরলটা ফেলে দিয়েছিল বেসিনে সেটা গিয়ে পড়ে বাইরে কিছু দূরে একটা ওয়েস্ট পিটে। সেখান থেকে পরে আবার সব তরল পদার্থ রিসাইক্ল করা হয়। এদিকে সেইসময় রান্না ঘরে রণদেব গ্যাস ওভেন থেকে ভাতের হাঁড়ি নামাতে গিয়ে অসাবধানতায় হাঁড়িটা মাটিতে পড়ে গিয়ে সব ফ্যান মাটিতে উলটো দিকের দেওয়ালের তলা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে কোনোভাবে ওয়েস্ট পিটে গিয়ে পড়ে আর তারপরেই এই বোমাবাজি এবং আর ডি এক্সের আবিষ্কার।'

কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে 'আচ্ছা চলি রে, আমার আবার ক্ষিদেটা চাগিয়ে উঠেছে এখন, আবার দেখা হচ্ছে আগামী রবিবার ঠিক সকাল ন'টায়', বলেই হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন দামোদর হোটেলের গোয়াল থেকে।

স্বশিক্ষিত – রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২–১৮৩৩)

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮১, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকম্যুনিকেশন

প্রমথ চৌধুরী একবার বলেছিলেন সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত অর্থাৎ স্বশিক্ষার চেয়ে বড়ো কোনো শিক্ষা নেই। স্বশিক্ষিত হওয়ার চেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে যেখানে নিজেই নিজের শিক্ষক। কথাটা খুব দামি কারণ আজও দেখি অনেকেই স্বশিক্ষিত হওয়ার চেষ্টা করছেন— কিছুটা চাকরি বাঁচনোর গুঁতো থেকেই হোক বা গবেষণার কাজেই হোক।

এবার একটু পিছন দিকে ফিরে তাকাই। একটা ধাঁধার উত্তর আজও বোধহয় পাওয়া যায় না। আমরা সবাই জানি যে রামমোহন রায় ছিলেন এক ডাকসাইটে পণ্ডিত, গোটা স্মৃতিশাস্ত্র গুলে খেয়েছিলেন। সতীদাহর বিরুদ্ধে জোরদার শাস্ত্রীয় তর্ক শুরু করেন, বাংলায় তিনটি পুস্তিকাও লেখেন। তিনি দেখান ধর্মশাস্ত্রকার মনু কোথাও সহমরণ বা অনুমরণের কথা লেখেননি। রামমোহনের ভাষায় '...অতএব মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আপন আপন স্মৃতিতে বিধবার প্রতি ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মই কেবল লিখিয়াছেন...স্পষ্ট বিধি দেখিতেছি যে স্ত্রীলোক পতির কাল হইলে পর ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মোক্ষ সাধন করিবেন।'

এ কথা ঠিক যে বেদ অধ্যয়ন সময়সাপেক্ষ। রামমোহন বেদজ্ঞ হিসাবে দীর্ঘকাল পরিচিত। তিনি তাঁর রচনায় এবং তর্কে তাঁর যুক্তি বেদ থেকে প্রায়শ আহরণ করেছেন। অথচ দীর্ঘকাল কোনো টোলে বা গুরুগৃহে গিয়ে থাকবার অবসর পাননি। এর বিকল্প ব্যবস্থাও তখন কার্যত অসম্ভব ছিল। তাঁর প্রথম জীবনে বেদ-চর্চা বঙ্গদেশে হত না এবং মুদ্রিত বেদ-গ্রন্থ পাওয়াও যেত না। রামমোহন চারটি উপনিষদের (ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক) সংস্কৃত থেকে বাংলা ও ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন (সবই ১৮১৬ থেকে ১৮১৯-এর মধ্যে প্রকাশিত)। অবশ্য রামমোহনই প্রথম উপনিষদের অনুবাদ করেননি। এর আগে দারা শিকোহ (১৬১৫-১৬৫৯) ৫২টি উপনিষদের অনুবাদ পারসিতে করিয়েছিলেন। সেখান থেকেই বেশ কিছু ভুলে ভরা অনুবাদ লাতিনে করা হয়।

১৮১৪ সালে রামমোহন *'বেদান্তগ্রন্থ'* ও *'বেদান্তসার'* নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করেন এবং বিনামূল্যে বিতরণ করেন। বেদান্তসার-এর একটি জার্মান অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল: Auflösung des Wedant. আরও আগে ১৮০৩-৪ সালে রামোহনের বয়স যখন ত্রিশ, তিনি লেখেন 'তহফাতুল মাওয়াহিদ্দিন') অর্থ : 'ঈশ্বরবাদীদের জন্য দান''। পারসিতে লেখা; ভূমিকা আরবিতে।

রামমোহনের ধর্মবিষয়ক বইগুলোর দিকে ইউরোপীয়দের সাগ্রহ নজর পড়ার ফলেই তাঁর দ্রুত প্রচার হল এবং সেই সঙ্গে বিরুদ্ধ ক্রিয়াও দ্রুত শুরু হল।

এইখানেই প্রশ্ন আসে যে রামমোহন এত সব ভাষা (ইংরাজি, পারসি, আরবি, সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রিক, লাতিন)

শিখলেন কোথা থেকে এবং বেদসহ বিভিন্ন শাস্ত্র ও পুরাণের বিস্ময়কর দখল কীভাবে সম্ভব হল? এই নিয়ে অনেক আলোচনা তর্ক বিতর্ক আছে। কেউ বলেন বারাণসী থাকাকালীন তিনি বেদের পাঠ নেন। আর পাটনার মাদ্রাসা থেকে পারসি ও আরবি শেখেন, কোরানেরও পাঠ নেন। অনেকে আবার যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে এই অনুমান সঠিক নয়। আসলে কোনো পাথুরে প্রমাণ নেই যে রামমোহন এই বিশাল শিক্ষা কোথা থেকে পেলেন। সময়টা খেয়াল রাখবেন। আজকের মতো ইন্টারনেট এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং বা AIML-এর যুগ নয় যে, প্রশ্ন করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর চলে এল।

তবে যে কথা আমরা বুকঠুকে বলতে পারি তা হল রামমোহনের স্বশিক্ষিত হওয়ার প্রবল প্রচেষ্টা। এই নিয়ে কোনো বিরোধ নেই। তিনি নিজেই নিজের শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন— বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, হিন্দুশাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করেন, এমনকী কোরান, বাইবেল ও ইহুদিদের প্রাচীন গ্রন্থ খুঁটিয়ে পড়েন। অসম্ভব ইচ্ছাশক্তি থেকেই এটা সম্ভব এবং সামনে যদি একটা স্থির লক্ষ্য থাকে (সে সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তিকরণই হোক বা একেশ্বরবাদিতার (monotheism) প্রচারই হোক)।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা একবার একটা ফন্দি আঁটলেন। তাঁরা দুজনে জার্মান ভাষা শিখেছিলেন নিজেদের প্রচেষ্টায়। তাঁরা এবার ঠিক করলেন : চল আমরা দু'জনে মিলে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে জার্মান ভাষায় লেখা গবেষণাপত্রগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করি। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। সত্যেন্দ্রনাথ চিঠি লিখে আইনস্টাইনের কাছে তাঁর লেখা অনুবাদ করার অনুমতি চাইলেন। আইনস্টাইন অনুমতি দিলেন। পৃথিবীতে সেই প্রথম ইংরেজিতে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলোর অনুবাদ হল সাহা আর সত্যেন্দ্রনাথের মাধ্যমে। সংকলনটি প্রকাশিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এখানে আমরা পেলাম অসাধারণ মেধাবী ও স্বশিক্ষিত মেঘনাদ সাহা ও সতেন্দ্রনাথ বসুকে।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে স্বশিক্ষিত হওয়া প্রচেষ্টা আমাদের সবাইকে চালিয়ে যেতে হবে সারাজীবন— সে তুমি নিজে ছাত্র, শিক্ষক, চাকুরিজীবী বা অন্য যা কিছু হও না কেন।

তথ্য সংগ্রহ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. নবজাগরণের বঙ্গ ও বাঙালি - প্রসাদ সেনগুপ্ত, প্রকাশক - সিগনেট প্রেস।
২. প্রবন্ধসংগ্রহ - রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, প্রকাশক - সঞ্জয় সামন্ত, এবং মুশায়েরা।

হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলা

সৌমিত্র সিংহ, ১৯৮১, *মেটালারজি*

ছোটোবেলার গল্প বলি আজ, যদিও অনেক কিছুই মনে নেই, তাও চেষ্টা করব ঠিকঠাক লেখার, কথা দিচ্ছি। ছোটোবেলা বলতে আমি স্কুল জীবনের কথাই বলছি।

যেদিন প্রথম স্কুলে গেলাম সেটা হল গ্রামের স্কুল অর্থাৎ পাঠশালা। আমরা থাকতাম মথুরাপুর বলে এক গ্রামে, যেটা দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরের পরবর্তী গ্রাম। আমার বাবা ছিলেন সেই গ্রামের ডাক্তার, সেই সুবাদে আমায় মাটিতে বসতে হল না, বেঞ্চি পেলাম। আমার তখন কেজি বা ওয়ানে পড়ার কথা কিন্তু বসলাম গিয়ে ক্লাস ফোরের বেঞ্চিতে, যেটা তাদের জন্যে বরাদ্দ ছিল। বাবার ইচ্ছে ছিল স্কুল সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করা, তবে বাবার ইচ্ছে সেভাবে পূরণ হল না। আমি দু'দিন ক্লাস করেই বাড়ি চলে এলাম। আর যাইনি। বাবা দেখলেন ছেলে মুখ্যু থেকে যাবে। মার পরামর্শ মতো আমরা কলকাতায় চলে এলাম। ভীষণ ভয়। স্কুলে যাব না। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে admission test দিলাম। হল থেকে বেরিয়ে এলাম যখন আমার হাত পুরো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। তারপর যোধপুর বয়েজ-এ টেস্ট দিলাম। দুটোতেই পেয়েছিলাম কিন্তু বাবা বললেন যোধপুর বয়েজ বাড়ির কাছে তাই ওটাতেই ভর্তি হও। গেলাম পিসতুতো দাদার সঙ্গে ভর্তি হতে। ছোটোবেলায় অভ্যেস হল বয়স বাড়িয়ে বলা। আমিও ঠিক তাই করলাম। দুই দিন বাড়িয়ে দিলাম। বেশি বাড়ালাম না, যদি বাবা বকে। সমস্ত certificate এ এখনও আমার দু'দিন বয়স বেশি।

সকালে ক্লাস হত, একবার স্কুলে আমার বন্ধু শুভময় ও আমি একটু আগে পৌঁছে গেছিলাম। কী করি স্কুলের পেছনে হেড স্যারের বাড়ির পাশে আমাদের দারোয়ানের খাটিয়াতে বসে ওদের মতো রামা হো, রামা হো করে গান করছিলাম, কে জানত গানের জন্যে শাস্তি পেতে হবে। তেওয়ারি বলে এক দারোয়ান আমাদের হেড স্যারের কাছে ধরে নিয়ে গেল, এক period-এর জন্যে নিল ডাউন হয়ে গেলাম। আমার জুনিয়র শ্রীকান্তর সঙ্গে গান শেখা নিয়ে কথা হচ্ছিল, ওর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম হেড স্যারের কারণে গানটা আর সাহস করে শিখতে পারিনি। আবার কে ধোলাই দেয়।

আমাদের ক্লাসে কৌশিক বলে একটা ছেলে ছিল যে আমাদের ইংরাজি শিক্ষক কৃষ্ণেন্দ্রবাবুর ক্লাস শুরু হলেই দুষ্টুমি শুরু করত, সেটা আমাদের ওই বয়সে বেশ মজা লাগত। কৌশিক দৌড়োত আর স্যার পেছনে দৌড়োতেন যেন চোর পুলিশ খেলা। কাজের মধ্যে আমাদের ইংরেজিটা আর তেমন শেখা হয়নি।

ক্লাস ওয়ানে প্রথম যেবার স্পোর্টসে নাম দিলাম, সেবার কোনো পুরস্কারই পাইনি। মা স্কুলে গিয়ে দেখে আমি কান্নাকাটি করছি কারণ আমার জামার সামনে কোনো jersy number নেই। সেই তেওয়ারি কোথা থেকে খুঁজে আমার বুকে একটা jersey number লাগিয়ে দিয়ে গেল, তাতেই আমার শান্তি। কিছু প্রাইজ

পাইনি তাতে কোনো দুঃখু নেই।

স্কুলে আমাদের জাতীয় সংগীত গাইতে হত, কিন্তু আমরা ভুল করে জলধিতরঙ্গকে ভুল উচ্চারণ করে জলধিতোরঙ্গ করে দিতাম। আর আমাদের হেড স্যার বলতেন জাতীয় সংগীতটা ঠিক মতো গাইতে পারিস না, দেশের উন্নতি কী করে করবি?

আমার বৃষ্টির মাঝে স্কুলে যেতে খুব ভালো লাগত। একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে তার মাঝে সকালবেলায় গড়িয়া থেকে যোধপুর পার্ক স্কুলে আমায় আমাদের এক family friend পৌঁছে দিয়ে গেছে। কিন্তু মোট ৩ জন স্কুলে আসাতে rainy day হয়ে গেছে, অতদূর থেকে আমাকে কেউ নিতে আসার নেই। ছুটি অবধি একা স্কুলে বসে আছি। সারা স্কুলে পাশের লেক থেকে জলে ভরে গেছে, আর তাতে মাছ ঘুরছে, সারাদিনে স্কুলের চারপাশের drain থেকে কয়েকটা মাছ ধরলাম। এ আনন্দ বলার নয়। স্কুলে মা আনতে যেতেই হেড স্যারের কাছে বকা খেল, আমার খারাপ লাগছিল না, কারণ মা যদি না পাঠাত এ'রকম মাছ ধরতে পারতাম না। সবই অবশ্য খলসে ও তেচোখা মাছ আর সংখ্যা? তিনটি বা চারটি, তাতেই বেজায় আনন্দ।

আমাদের ছোটোবেলায় একটা খুব বাজে ধরনের খেলা ছিল। হয়তো দুই বন্ধু গল্প করছে, তার পেছনে একজন চুপি চুপি গিয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল, সামনের বন্ধু সে সুযোগ ছাড়ে, তার সামনের ছেলেটিকে ঠেলে দিল তাতে সে পেছনে বসা উবু হওয়া ছেলেটির ওপর দিয়ে গিয়ে পড়ে, তাতেই আনন্দ। তাতে যে back-bone-এ বেজায় চোট লাগতে পারে, সে বুদ্ধি আমাদের ছিল না।

আমাদের যখন জাতীয় সংগীত গাওয়া হত, তখন সবাই তো লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকত, হেড স্যার আসতেন দেখতে কে স্কুল ইউনিফরম পরেনি বা জুতো পরে আসেনি। ইংলিশ মিডিয়াম না হলেও কড়াকড়ি ছিল, অভিভাবক কল করা হত। ভাগ্য খারাপ থাকলে scale দিয়ে মারও জুটত।

আমাদের স্কুলে একজন wood craft-এর শিক্ষক ছিলেন, তিনি স্কুলের এত অপূর্ব একটা prototype বানিয়েছিলেন তা সত্যিই চোখ মেলে দেখার মতো। সেটা একটা কাচ দিয়ে ঢাকা ছিল। নকশাল আক্রমণের সময় কাচটা ভেঙে ফেলা হয়। পরে অবশ্য নতুন করে সারিয়ে ফেলা হয়।

নকশাল আক্রমণের দিন আমরা খুব ভয় পেয়ে যাই। আমরা তখন ক্লাস করছি, হঠাৎ একটা গোলমাল, তারপরই পর পর দুটো বোমার শব্দ, আমাদের স্যাররা তাড়াতাড়ি করে ক্লাসের দরজা বন্ধ করে দেন। খানিকটা পরে চুপচাপ হয়ে যাওয়ার পর বেরিয়ে দেখি আমাদের অফিস ঘরে দুটো বোমা মারার কালো দাগ। শুনলাম তারা হেড স্যারের ঘর খুঁজে পায়নি, তাই ওখানেই বোমাটা মারা হয়েছে। আমাদের পাশেই অফিস ঘর ছিল তাই আমরা পুরো কেঁপে গিয়েছিলাম। আমাদের একটা ছেলে স্কুল ছেড়ে দিয়েছিল কারণ সে নাকি বোমারুদের চোখে পড়ে গিয়েছিল।

আস্তে আস্তে বড়ো হচ্ছি, খেলাধূলা বাড়ছে, পড়াশুনো কমছে আমার। দুর্বুদ্ধি বাড়ছে। একবার ক্লাসে আমার পেছনের এক বন্ধু social studies ক্লাসে পা দিয়ে ধুপধাপ শব্দ করেছে। স্যার বুঝতে না পেরে তার সামনে আমি বসেছিলাম, ভুল করে আমাকে ধরেছেন। আমি যতই বলি আমি কিছু করিনি আর কে করেছে জানি না। তাতে উনি সন্তুষ্ট না হয়ে আমাকে বেধড়ক মারলেন। ক্লাসের ছেলেরা অন্যায়ের প্রতিবাদে ওয়াক আউট করল। তারপর হেড স্যার এসে সব সামাল দিলেন।

আমরা একবার বিবেকানন্দ পার্কে আমাদের স্কুল টিমের ফুটবল খেলা দেখতে যাচ্ছিলাম। যাওয়ার পথে একটা রেল লাইন পেরোতে হয়। বজবজ যাওয়ার রেল লাইন, একটা যাওয়ার আর একটা আসার। আমরা পাঁচজনেই একটা লাইনে ট্রেন আসছে দেখে পেরিয়ে গেছি, কিন্তু মাথায় নেই উল্টোদিক থেকে একটা ট্রেন ঠিক সেই মুহূর্তে আসতে পারে। কিন্তু বাস্তবে ঠিক তাই হয়েছে। আমিই শুধুমাত্র প্রথম লাইন পেরোনোর পর বাম দিকে তাকিয়েছিলাম। দেখি যমের মতো ট্রেন আসছে, মাত্র ৫০/৫৫ ফিট দূরে, আমার চিৎকারে সম্বিত ফিরল ওদের, তখন ব্রেন কাজ করেছে এই ভাগ্যি। ওরা লাইন পেরিয়ে almost ঝাঁপিয়ে পড়ল আর ট্রেন টা হু হু করে বালিগঞ্জের দিকে বেরিয়ে গেল।

এবার বলি চক চুরির গল্প। আমরা তখন ক্লাস ৯/১০ ক্লাসে পড়ি। আমাদের অনেকের অভ্যাস ছিল নতুন চক চুরি করা। সে যে সেটা বিক্রি করবে বা চক কেনার পয়সা নেই তাই চুরি করছে, তা নয়। নিছক আনন্দের তাগিদে। আসলে অনেক রঙিন চক স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষকরা আনতেন যা দিয়ে বোর্ডে কোনো ছবিকে বিভিন্ন রঙ দিয়ে রঙিন করতেন। তাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হত। সেখানে অনেক ভাঙা রঙিন চক পাওয়া যেত কিন্তু তাতে কারও উৎসাহ ছিল না। তাদের চাই নতুন গোলাপি, হলদে, বেগুনি, লাল রঙিন চক। চক সংগ্রাহকরা সময়টা বেছেছিল স্কুল আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগে, যখন স্কুলের শিক্ষকরা স্কুলে ঢোকেননি। তাঁদের ঘরটা তখন অরক্ষিত থাকত। কিছুদিন ধরেই চক চুরি যাচ্ছে। হয়তো শিক্ষকরা নজর করেছেন, কিছু বলেননি, ওনারা স্বপ্নেও ভাবেননি ওই জিনিস চুরি হতে পারে। অথবা ওনারা হেড স্যারকে হয়তো report করেছিলেন। শিক্ষকদের পাশের ঘরটাই ছিল হেড স্যারের, তাই তিনি হয়তো চোখ রাখছিলেন। এর মধ্যে আমাদের ব্যাচের তিলক ও আমি একটা করে চক হাতিয়েছি। কিন্তু বখরা নিয়ে ঝামেলা বাড়াতে দু'জনেই চক ছুঁড়েছি দু'জনের দিকে। দুর্ভাগ্যবশত তিলকের চকটা ফস্কে হেড স্যারের ঘরের দরজায় দুম করে গিয়ে লাগে। হেড স্যার দৌড়ে বেরিয়ে আসেন, তিলককে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করতে থাকেন ধর ধর ওই কালো ছেলেটাকে ধর। তাতেই তিলক ধরা পড়ে এবং ২টা ক্লাস নিল ডাউন। আমি কাছে গিয়ে ফিক করে হেসে পালাচ্ছি, তাতে ওর মেজাজ আরও গরম হয়ে আমাকে ভস্ম করে দিতে চাইছে।

আমাদের ব্যাচের কয়েকজন সরস্বতী ঠাকুর order দিতে লেকের মধ্যে দিয়ে short cut করছিল। কপাল দোষে তাদের সামনে সামনে কয়েকজন Kamala girls স্কুলের মেয়ে যাচ্ছিল। ওরা একটা বাঁক ঘুরেই দেখে সামনে প্রবোধবাবু অর্থাৎ আমাদের অঙ্কের শিক্ষক। বন্ধুরাও প্রমাদ গুনছে, স্যার একটা আগুন দৃষ্টি দিয়ে চলে গেলেন। দু'তিনদিন পর ক্লাসে এসে প্রথমেই তিনজনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর প্রথম প্রশ্ন বুলেটের মতো ধেয়ে এল, সেদিন তোরা ওখানে কী করছিলি? উত্তরে ওরা বলল স্যার ঠাকুর বায়না দিতে গিয়েছিলাম। তারপরই প্রশ্ন মেয়েগুলোর পেছন পেছন কেন যাচ্ছিলি? সুদীপ বুদ্ধি করে উত্তর দিয়েছে স্যার আমরা ওদের পেছন পেছন যাইনি, ওরা আমাদের সামনে সামনে যাচ্ছিল। স্যার সেই শুনে হয়তো একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিলেন। তারপর বললেন, যা চুপ করে বসে পড়। অর্থাৎ ওনার চোখ এড়ায়নি ঘটনা তা আমাদের সমঝে দিলেন এবং পরে যেন এরকম আর না ঘটে সেটার ইঙ্গিতও দিয়ে রাখলেন।

আমার এক বন্ধু ছিল রামানুজ। বেশ কিছুদিন সে স্কুলে আসেনি। আসার পর আমরা লক্ষ করলাম ও বেশ খানিকটা বিপর্যস্ত। আমরা জোর করে চেপে ধরার পর বলল একদিন পাড়ার নির্জন রাস্তায় আসার সময়

কিছু লোক গন্ধওয়ালা রুমাল নাকে চেপে ধরে অজ্ঞান করে ধরে নিয়ে যায়। ওই বন্ধু এত ছোটোখাটো ছিল যে ওরা বোঝেনি ও বাচ্চা ছেলে নয়। হাওড়া স্টেশনে একটা ঘরের সামনে বস্তাবন্দি করে ফেলে রাখে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ওর জ্ঞান ফিরে আসে ও নড়াচড়া শুরু করে। তা এক ভদ্রলোকের চোখে পড়ে এবং তিনি হইচই শুরু করে দেন। তারপর পুলিশ এসে উদ্ধার করে। সেই কারণেই ওর স্কুল কামাই।

সরস্বতী পুজো খুব ধুমধাম করে হত তা বলাই বাহুল্য। আমরা খুব সৎভাবে পুজো করেছিলাম। মাঝে একটা বিক্ষিপ্ত ও মজার ঘটনা ঘটেছিল। পুজোর জিনিসপত্র আমরা একটা ঘরে রেখে তালাচাবি দিয়ে রেখেছি। প্রদীপ বলে একটি ছেলে আমার কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে গেল, বলল ওই ঘরে সামান্য কিছু কাজ আছে। সেটা সেরেই আমাকে দিয়ে যাচ্ছে। আমি সরল বিশ্বাসে চাবিটা দিয়ে দিলাম। খানিকটা পরে ঘরে গিয়ে দেখি ঘিয়ের ডাব্বাটা একটু খোলা এবং তার মধ্যে থেকে খানিকটা ঘি খোবলানো। আমি তো অবাক নতুন ঘিয়ের ডাব্বা তার থেকে ঘি কে নিল। স্বাভাবিকভাবেই আমি প্রদীপকে চেপে ধরলাম। মুখ পুছে উত্তর দিল আমি কিছু করিনি। সঙ্গে দ্বিজু এসেছিল, ও হয়তো কিছু করে থাকবে। এবং আমাকে দেখিয়ে দিল দ্বিজু কীভাবে ঘি নিয়ে গেছে। বাবাঃ, আমি সবে ভাবতে শুরু করেছি, ও কেন দ্বিজুকে বাধা দিল না। প্রদীপ এত ঘি খেতে ভালোবাসত যে কীভাবে ঘিটা দ্বিজু তুলেছে সেটা দেখাতে গিয়ে আর এক খাবলা ঘি নিয়ে পালিয়ে গেল। তখন বুঝলাম আসল শয়তানটা কে, কে-ই বা ঘি চুরি করেছিল।

আমাদের এক স্যার ছিলেন কেষ্টবাবু বলে, তিনি একেবারে পুরোনো পদ্ধতিতে বেত সমেত পড়াতেন আর একেবারে পূর্ব বঙ্গের ভাষায় কথা বলতেন। আমরা জুজুর মতো ভয় পেতাম। তিনি নিতেন অঙ্ক ও সংস্কৃত ক্লাস। একবার সংস্কৃত ক্লাসে মানিক বলে একটি ছেলেকে পড়া ধরেছেন। সে তো ভয়ে আধমরা। যেটুকু জানত তাও গুলিয়ে ফেলেছে। স্যার তাকে দাঁড় করিয়ে বিশুদ্ধ বাঙাল ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন লতা শব্দের সপ্তমীর একবচনে কী হয় ক (বল)? মানিক বেজায় ভড়কে গিয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে যদি কেউ prompt করে। ক্লাস একেবারে নিঃশব্দ, কিছু আওয়াজ করার সাহসই নেই কারও। মানিক বেগতিক দেখে আস্তে করে বলল 'লতে', যাতে স্যারের কানে ঠিকমতো না যায়, স্যার ভুল করে বসে পড়তে বললেই কাজ শেষ। উলটে তিনি আবার বললেন জোরে ক, শুনতে পাইলাম না। মানিক নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল 'লতা'। স্যারও শুনতে না পেয়ে বললেন আরও জোরে ক। সেই শুনে মানিক আবার বলে লতে এবং ততোধিক আস্তে। স্যারের আবার হুঙ্কার, কী কইলি, কিছুই তো শুনতে পাইতাসি না, জোরে ক। এবার মানিক বলে একার, ওকার, আকার, হ্রস-ই । ভাবটা এরকম স্যার আপনার যেটা পছন্দ সেটা নিজেই বেছে নিন, আমাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন? আমরা ভাবছি এবার বোমা ফাটবে। উলটে মানিকের দিকে তাকিয়ে স্যার হো হো করে হেসে ফেললেন আর বললেন হালায় কী কয়, একার, ওকার, আকার, হ্রস্ব-ই, চারটাই হইতে পারে নাকি?

আমাদের একটা rapid reader ছিল। একটা বড়ো গল্প তার থেকে একটা বড়ো question আসবে, তার উত্তর দিতে হবে। আমাদের বড়ো উপন্যাসটা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কমলাকান্তের দপ্তর। ক্লাসে স্যার পড়িয়ে যাচ্ছেন আর ছেলেরা গল্প করে যাচ্ছে। এক সময় মৃদু কথাবার্তা গুঞ্জনে পরিণত হল। স্যারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। সুব্রত বলে একটা ছেলেকে দাঁড় করিয়ে বললেন বলো তো কী পড়াচ্ছিলাম? সে খানিকটা

এদিক ওদিক চেয়ে বুঝল prompt-এর আর কোনো আশা নেই। শেষমেশ বলল কমলাকান্ত খুব ভালো লোক ছিলেন। স্যার পুরো খেপে গেলেন। কাছে ডেকে নিয়ে বেধড়ক মারলেন। এত রেগে গেছিলেন যে, কাঁপতে শুরু করলেন। তারপর ক্লাস ছেড়ে চলে গেলেন। এত ঠান্ডা মানুষ যে ওরকম রেগে যেতে পারে তা ভাবতেও পারিনি। তারপর উনি আর আমাদের পড়াননি।

আরও একটি গল্প দিয়ে আমার স্কুলের গল্প শেষ করি। আমরা স্কুল থেকে দেরাদুন, হরিদ্বার বেড়াতে গেছি। আমরা দেরাদুনে দল বেঁধে হিন্দুস্থান কি কসম বলে একটা সিনেমা দেখতে গেছি। কোনো কারণে টিকেট কাটা নিয়ে ঘি-প্রেমিক প্রদীপের সঙ্গে লোকাল ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া বেঁধে গেছিল, আমরা সেটা জানতাম না, হঠাৎ দেখি কয়েকটা ছেলে সিনেমা হলে ঢুকে প্রদীপের নাকের ওপর থেকে চশমাটা খুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রদীপ চশমাটা নিজেই খুলে নিয়ে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। খানিকটা পরে ফেরতও চলে এল। বলল, ওদের সঙ্গে কড়া বাক্য বিনিময়ের পর সেটা মিটেছে। হাতাহাতিতে পৌঁছোয়নি এটাই আমাদের ভাগ্য। তাহলে বিদেশ বিভুঁইয়ে খুব বিপদে পড়তাম। আরেকবার ট্রেনে reserve compartment-এ যাচ্ছি, বন্ধুদের কেউ সোডা বিক্রেতাকে পয়সা না দিয়ে বা কম দিয়ে ট্রেনে উঠে পড়েছে। সোডাওয়ালা এমন বোতল ছুঁড়ল যে ট্রেনের কাচ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। কেউ অবশ্য আহত হয়নি। স্যার খুব বকাবকি করলেন। ব্যাপারাটা কোনো রকমে সামলানো গেল। জীবন বৈচিত্রময়, তবে স্কুল জীবনটা অনেক বেশি।

ঘটবে কি?

সুদীপ সেনগুপ্ত, ১৯৮০, *মেকানিকাল*

রাত বারোটা বাজতে এখনও পাঁচ মিনিট বাকি। এরপরেই কি ঘটবে সেই ঘটনা যা আমি কল্পনাও করতে পারছি না! পাঁচ মিনিট মানে তো তিনশো সেকেন্ড, আমার কাছে এক একটা সেকেন্ড এখন এক একটা ঘন্টার সমান।

ঘামছি খুব, অবশ্য সেই বিকেল থেকেই। কিন্তু এখন তো শীতকাল, এই ঘামাটা কি স্বাভাবিক! কি জানি! তবে শীতকাল বলেই যে ভীষণ ঠান্ডা পড়েছে তা' নয়, ঘামতেই পারি, তবুও মনে হচ্ছে যেন। না, আর ভাবতেও ভালো লাগছে না। কিন্তু না ভেবেই বা কি করি, আমাকে তো ভাবতেই হবে। আবার ভাবি, কেন আমাকে ভাবতেই হবে। চেষ্টা করলাম মনকে চিন্তাশূন্য করার। ছোটবেলায় খুব এটা অভ্যাস করতাম। মনে পড়লো, মন্দিরের সাধনাকক্ষে গিয়ে সেটাই তো করতাম ধ্যানের মাধ্যমে, মোটামুটি আধ ঘণ্টা। তবে রপ্ত করা বেশ দুঃসাধ্য ছিলো, তবুও একটা জেদ তো ছিলোই যেটা অনেকটাই সাহায্য করেছিলো বেশ একটা সময় ধরে যাতে কোনও কিছু ভাবতে না পারি। কিন্তু এখন তো সেই ক্ষমতা ম্রিয়মাণ। তাহলে? কিছুই হবে না, এই সব যে এতক্ষণ দ্রুত চিন্তা করে ফেললাম, ঘড়ির কাঁটা দেখি মাত্র পাঁচ সেকেন্ড এগিয়েছে। গায়ের গেঞ্জিটা এত ভিজে গেলো কখন!

কিন্তু গতকাল রাতে কি হলো? একই ভাবে রাত বারোটার প্রতীক্ষা করছিলাম সেই রাতে। অথবা তারও আগের রাতে, তারও আগে, তারও আগে? সত্যি বলতে গেলে মনে হয় বহুযুগ ধরে আমি রাত বারোটার সেই ঘটনাটার জন্য অপেক্ষা করে আছি যেটা নিশ্চয়ই ঘটবে। আর মনে হবেই বা কেন? প্রতি রাতে আমার এই ঘেমে ওঠা তো আমি নিজেই অনুভব করছি, তবে সত্যিই কি ঘটবে সেই ঘটনা, কি জানি! কিন্তু আমাকে তো জানতেই হবে। ঋভু তো তাই বলেছিলো।

ঋভু অনেক কিছুই বলতো। তখন আমরা ক্লাস এইটে, কৈশোরে। কিশোরবেলাতে ওর সাথে চলে যেতাম এখানে-সেখানে, স্কুলের পরে। সন্ধ্যের আগে বাড়িতেও ফিরে আসতাম নিয়ম করে। আমাদের আধা-শহর আধা-গ্রামে বাড়ি, লোকজন দোকানপাটের ভিড়ও যেমন ছিলো, সে রকমই নির্জনতারও ছিলো না কোনও অভাব। আর সেই লোকাভাবকে খুব কাজে লাগিয়ে ঋভু তৈরি করতো এক মায়াময় জগৎ। অনেকে এসে আমাদের চারিধারে জড়ো হতো, যারা না কি কখনোই ছিলো না। মানে ঠিক ভূতযোনিপ্রাপ্ত আত্মা নয়, এরা আসতো যেতো নিত্য নতুনরূপে। আজ যে এসে আলাপ করে গেলো, সেই অনুভূতি পরেও পাওয়া যেতো, কিন্তু সে তখন অন্যরূপে। কথা হচ্ছে, শুধু ঋভুর সাথে থাকলেই আমি তার ভাগ পেতাম, কয়েকবার একা গিয়ে শূন্য আলাপেই ফিরেছি। কেন এরকম?

বিকেল শেষে কখনোই রাত বারোটার গল্প ছিলো না। হোম টাস্কের খাতা ফুরিয়ে যেতো, ফুরিয়ে যেতো রাতের খাবার, দিব্য তলিয়ে যেতাম ঘুমের জগতে, রাত বারোটা তাকে স্পর্শও করতে পারতো না। কিন্তু ঋভুই তো সবকিছু বদলে দিলো। ও বদলে দিলো, না আমি নিজেই বদলে গেলাম, কে জানে ! সত্যিই কি বদলালাম, না সেই শুধু সেই রহস্যময় বিকেলগুলোতেই অন্য রকম হয়ে উঠতাম! তবে ঋভু কেন, অন্য যে কেউই তো এটা করতে পারতো। ও তো শুধু রাত বারোটার আবেশ তৈরি করেছিলো, বিকেল-সন্ধ্যেতেই বসে। অন্য কেউ হলে কি এটা করতে পারতো? তবুও মনে হতো, না করারই বা কি আছে, মানুষই তো। কিন্তু তারা তো মানুষ ছিলো না, ছিলো একটা অনুভব।

এই বদলানোর ব্যাপারটা নিয়ে বিশ্লেষণ করতাম তখন, ধরেই নিয়েছিলাম আমি বদলে যাচ্ছি। কিন্তু আশেপাশের লোকজনকে দেখে তা মনে হতো না। তবে? অবশ্য মা আমাকে আড়চোখে দেখতো মাঝে মাঝে, না কি আমি ভাবতাম দেখছে। দেখলেই বা কি! বুঝতাম, আমার ঐ বিকেলের সময়টাই সবচেয়ে মূল্যবান।

ঝোপঝাড়ে ভরা এক বিকেলসন্ধ্যেতে মায়াকাজল চোখে ঋভু দেখালো একখানা ঘড়ি, মাঝারি সাইজের, পেন্ডুলাম দেওয়া, আর বাজে ঘন্টা। ঘন্টা-মিনিট-সেকেন্ড, সব কাঁটাগুলোই আছে, শুধু সংখ্যাগুলো এক থেকে বারোর বদলে সবই বারো। ও দেখাতে লাগলো, এই বাজলো বারোটা, এক ঘর এগিয়ে এই বারোটা বেজে বারো, দু' ঘর পরে আবার বারোটা বেজে বারো, তারপরে আবার, তারপরে আবার, আবার, আবার। কি এক মন্তরে প্রতি পাঁচ মিনিটে বারো বারের ঢং ঢং শব্দ, একটা শেষ হতে না হতেই আবার বারো বার, আবার, আবার। সূর্য ডুবে গেছে, দেখি ঋভুর হাতে তো সে ঘড়ি নেই ! জানালো, যারা যারা এই ঘড়ি প্রত্যক্ষ করেছে, কানে শুনেছে উপর্যুপরি এর আওয়াজ, কোনও একদিন রাত বারোটায় তাদের জীবনে কিছু একটা ঘটবে, কিন্তু কি যে ঘটবে তা' কারোর জানা নেই। ঐ একদিনই সেই অভিজ্ঞতা। আর সেই ঘড়ি কোথা থেকে এলো আর কোথায় গেলো, তার হদিশ মিললো না।

আজ এই পরিণত বয়সে আমার নিত্য প্রতীক্ষা রাত বারোটার, তেষ্টা পায়, ঘামতে থাকি, অনেক উদ্বেগ নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই, উত্তেজনায় শিরা ফুলতে থাকে সেই না-ঘটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনায়।

আজও বারোটা বেজে গেলো।

পরিবেশ অস্বাস্থ্য ও আবাস-নির্মাণ বৃত্তান্ত

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৮, *সিভিল*

যদি প্রশ্ন করা হয় শিশুদের সবার স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে বিপদ কোনটা, বিশেষত শীতকালে– নানারকম উত্তর আসবে। সম্প্রতি খবর মিলছে যে– রাজধানী দিল্লীতে শিশুদের শ্বাসকষ্ট ও শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে চিকিৎসা কেন্দ্রে ভিড় অস্বাভাবিক দেখা গেছে। চিকিৎসকরা দিল্লীর বাইরে সিমলা বা অন্যত্র সাময়িক চলে যাওয়া ছাড়া কোন সমাধান আপাতত দিতে পারছেন না। শিশু ও বৃদ্ধদের স্বাস্থ্য বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণ হলো শিশুদের প্রশ্বাস গ্রহণের হার বড়দের দ্বিগুন। আর যে বাতাসে তারা শ্বাসগ্রহণ করছে সেটা কতোটা ক্ষতিকর তা বর্তমান AQI (৩৯০র বেশি) দেখলেই বোঝা যাবে। তবে আত্মসন্তুষ্টির কোন কারণ নেই এজন্য যে আমাদের কলকাতা শহরও বাতাসের গুণমানে এরই কাছাকাছি (AQI ৩৫০র বেশি)। এখন কিছুকাল ধরে দিল্লীতে নানা চেষ্টা পথে জল স্প্রে করে বাতাসের গুনমানের উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা। কিন্তু এসবই কোন ব্যক্তির রোগ নিরাময় না করে, রূপচর্চার মাধ্যমে তাকে আকর্ষণীয় করার চেষ্টার সামিল (চিত্র-১ দেখুন)! একটি মহল থেকে কিছুকাল ধরে বলা হয়ে চলেছে যে – পার্শ্ববর্তী হরিয়ানার খড় ইত্যাদি ফসলের অবশিষ্টকে জ্বালানোর থেকে উৎপন্ন ধোঁয়ায় দিল্লী বায়ু দূষণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু তথ্য বলছে যে – এটি অন্যতম গৌণ কারণ হতে পারে; কিন্তু মুখ্য কারণ হলো অসংখ্য গাড়ি থেকে নির্গত ক্ষতিকর গ্যাস এবং ব্যাপক হারে নির্মাণ-কার্য থেকে উৎপন্ন সূক্ষ্ম ধূলিকণা।

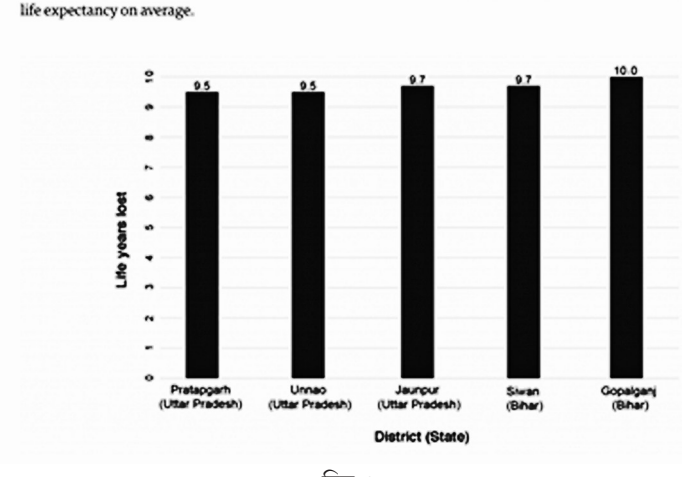

চিত্র-১

এই পরিবহণ-পরিকাঠামো এবং আবাস-নির্মাণ কার্য – এই দুটিই বাস্তুবিজ্ঞানে তথা Civil Engineering – বিষয়ের মধ্যে পড়ে। তাহলে পাঠকের এই পর্যন্ত পড়ে ধারণা হতে পারে যে – এই সব সমস্যার মূলে বাস্তু-বিজ্ঞানী! এখন মহানগরীগুলির দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপরিচিত পদ্ধতি গাছ লাগানো, সবুজ ও জলাভূমি সংরক্ষণ, কল-কারখানার দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি তো নিরন্তর চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হলো– গণ পরিবহন (Mass Transport) ব্যবহারে বাধ্য করা এবং নির্মাণ-শিল্পের (Construction Industry) উপরে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ ও সেগুলিকে কার্যকরী করা। দেখা যাবে বাস্তবে হয়তো প্রচলিত আইন সত্বেও সেগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শিথিলতা রয়েছে। তার অন্যতম কারণ হলো সচেতনতার অভাব – ফলে কতটা কী ক্ষতি হতে পারে কোনো ধারণা নেই।

ব্যক্তিগত গাড়িগুলিকে ক্রমে বেশির ভাগ বিদ্যুতচালিত গাড়ি দিয়ে বদলে ফেলতে পারলে ভালো হবে; কিন্তু ট্রাফিক জ্যামের সমস্যা এতে মিটবে না। গণ-পরিবহনকে জনপ্রিয় করতেই হবে, প্রয়োজনে সরকারকে ভর্তুকি দিয়েও করতে হবে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে– এই বিপুল খরচের যোগানকে দেবে? উত্তর হলো– এর নিশ্চয়তা নানা বিলাসিতায় অপচয় বন্ধ করে রাষ্ট্র বা সরকারই দিতে হবে। কারণ জীবনের অধিকার তথা সুস্বাস্থ্য ও নির্মল পরিবেশের অধিকার প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে এবং এই দায়িত্বগুলি পালন যে কোন নির্বাচিত সরকারের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এটি না করলে অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহানি, অকালমৃত্যু ও সর্বোপরি উৎপাদনশীলতা-হ্রাস (Productivity Loss) এবং চিকিৎসার ব্যয় – এই দুটি বিপুল বোঝা সমাজ ও রাষ্ট্রের ঘাড়ে অবশ্যই পড়বে।

সমস্যা হলো আমাদের মানসিক জাড্য বা বদ-অভ্যাস। একদা দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল যে একদিন যুগ্ম সংখ্যার ও পরের দিন অযুগ্ম সংখ্যার গাড়িকে চলতে দিয়েছিলেন এবং পাশাপাশি বাসের মতো গণ-পরিবহনে ভর্তুকির মত পদক্ষেপ নিয়ে সমস্যাটি প্রশমনের চেষ্টা করেন – সেটি স্বাগত। কিন্তু আলোচ্য সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে জটিল ও ব্যাপক হলো আবাসন সমস্যার সঙ্গে জড়িত নির্মাণ-শিল্পের থেকে উদ্ভুত দূষণ ও পরিবেশগত সমস্যা। গত কয়েক বছর ধরে গ্রিন বিল্ডিং (Green Building)-এর মতো কিছু চটকদার কথাবার্তা শোনা গেলেও পরিস্থিতি বর্তমানে বেশ খারাপ। কারণ নির্মাণ-শিল্প এখনও মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রেই রয়ে গেছে – যেখানে অশিক্ষিত, অপরিণত ব্যবসায়ী-মালিকের রমরমা! উপরন্তু তাদের সঙ্গে জন-প্রতিনিধি ও সরকারী আধিকারিকদের একাংশের যোগসাজশে আইনের প্রয়োগের দিকটি শিথিলের আশংকা অমূলক নয়। Green Building-এর মূল কথা হল— বাড়িটি নির্মাণের আগে ও পরে তাতে শক্তির যোগান কম দরকার হবে, এমন কি যে উপকরণগুলিতে বাড়িটি তৈরী হবে – সেগুলির বাছাই করা হয় কতো কম শক্তি ব্যবহৃত হয়েছে তার নিরিখে। যেমন, জানলার ফ্রেম নির্মাণে এলুমিনিয়াম নাকি অন্য কোন বস্তু ব্যবহার হবে, কোন উপাদান বেশি পরিবেশ-বান্ধব ও শক্তি-সাশ্রয়ী সে সব নিয়ে চুলচেরা গাণিতিক বিশ্লেষণ আছে।

কিন্তু এদেশে কবির বাণী – "সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে/পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা''। তেমন নাচের দৃশ্য দেখা গেছিল দশ-বারো বছর আগে ভোপাল শহরে। সেখানে এক অভিজাত অঞ্চলে দেখি বছর তিনেকের বসতবাড়িকে নতুন এক মালিক কিনেই ভিত পর্যন্ত ভেঙে দিয়ে নিজের পছন্দমত বসতবাড়ি

নির্মাণ করছেন। এটাই সেই অঞ্চলের রীতি দাঁড়িয়েছে। পরিবার বিশেষে রুচির তফাতের জন্য অল্প হেরফের বা আভ্যন্তরীণ বদল একরকম, কিন্তু নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আবার নির্মাণে অপচয় ছাড়াও প্রচুর সূক্ষ্ম ধুলিকণা, শব্দ-দূষণ ও পরিবেশের ক্ষতি হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্মাণ-শিল্পে রিয়েল এস্টেট-ব্যবসায়ীরা যেভাবে প্রায় অপ্রয়োজনে উল্কাগতিতে ফ্ল্যাট-নির্মাণ বাড়িয়ে চলেছে (চিত্র-২ দেখুন), তাতে এই বিশাল ক্ষেত্রটি ক্রেতাদের ভোগলালসা বাড়িয়ে মুনাফা-শিকারী ব্যবসায়ীদের মুক্ত মৃগয়াভুমিতে পরিণত বলা যায়। এর কিছু

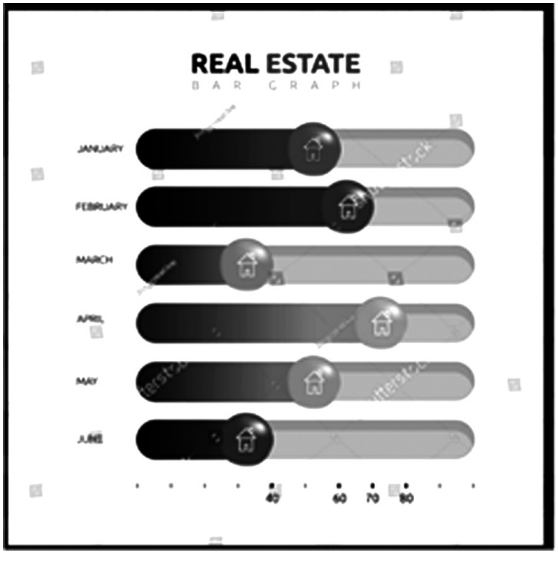

চিত্র-২

বিষয়কে কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণের আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। Indian Buildings Congress-এর একটি আনুমানিক হিসাব থেকে বলা যায় যে – একটি বসতবাড়িকে ভেঙে ফেলে নব-নির্মাণ না করে যদি সেটিকে বাস্তু-বিজ্ঞানের প্রকৌশলে মেরামত ও নবরূপ দেওয়া হয়, তাতে যে পরিমান শক্তি সাশ্রয় ঘটবে সেটা দিয়ে সেই বাড়িটির প্রায় চল্লিশ বছর শক্তির যোগান দেওয়া যাবে। এছাড়া এমন বাড়ি ভাঙ্গলে প্রায় ৮০-১০০ টন দূষণকারী নির্মাণ-বর্জ্য তৈরী হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় – একান্তভাবেই নিজস্ব আবাসহীনদের জন্য নতুন বাড়ি বা ফ্ল্যাটের অনুমোদন দেওয়া উচিত। সম্প্রতি সচ্ছল ক্রেতাদের এক বড় অংশ প্রকৃত প্রয়োজনের বদলে সম্পত্তিগুলিতে নিজেদের কালো টাকা লগ্নি করার পরে তালাবন্ধ ফেলে রেখেছে – এই সংখ্যাটি বিশাল। মূল্যবান পরিকাঠামো সম্পদের ব্যবস্থাপনার (Infrastructure Asset Management) দিক থেকে এটি একটি ক্ষতিকর ও অবাঞ্ছিত প্রবণতা। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে – কলকাতা শহরে তো বটেই; মফস্বল শহরগুলিতেও সারা দেশে বহু সুন্দর মজবুত ইমারত ও নানা চরিত্রের বাড়ি ছড়িয়ে রয়েছে—অনেক সময়ে সেগুলি সংস্কারের

পুঁজি ও প্রকৌশলের অভাবে বহু বাড়ির ভাড়াটিয়ার অল্প ভাড়ার জন্য মালিক বঞ্চিত হন – এই বিষয়ে ন্যায্য সমাধান দরকার। বর্তমানে এই ধরনের বহু বসতবাড়ি ও অন্য ইমারতকে সুন্দর ও লাভজনকভাবে মেরামত বা সংরক্ষণের প্রকৌশল প্রচলিত রয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু সরকারি ও অ-সরকারি (NGO) সংস্থা সংগঠিতভাবে সরকারি বিভাগের তত্বাবধানে ন্যূনতম খরচে এমন নব-রূপায়ণের ব্যবস্থা করতে পারে। Urban Renewal Mission গোত্রের নির্দিষ্ট সরকারি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাঙ্কের সঙ্গেও সুলভ বা ভর্তুকিযুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে কর-ছাড় বা ভর্তুকির মত উৎসাহদানের মাধ্যমে এই ধরনের প্রকল্প জনপ্রিয় হতে পারে। এর ফলে সামাজিক, পরিবেশগত, নান্দনিক ও অর্থনৈতিক যে লাভ হবে-সেটা বহুমাত্রিক :-

১) সামাজিক – অব্যবহৃত বা ভুল-ব্যবহৃত, কখনও বা পোড়ো বাড়িগুলি কখনও বা অসামাজিক কাজের আখড়া হয় – তার থেকে মুক্তি ঘটবে এবং বাসস্থানের পরিসর বৃদ্ধির ফলে বেশি জনের বাসস্থান মিলবে।

২) পরিবেশগত – কিছু পুরনো বাড়ির সংস্কার / সংরক্ষণ করলে নতুন নির্মাণের চাহিদা ও তজ্জনিত দূষণের মাত্রা ও শক্তির চাহিদা অনেক কমবে।

৩) নান্দনিক – মহানগরী ও শহরতলিতে বহু হর্ম্যরাজি, প্রাসাদ আছে – যেগুলির সৌন্দর্য বিপুল হলেও, অভিভাবকহীন অবস্থায় অযত্নে পড়ে আছে – এর মধ্যে কিছু ঐতিহ্যশালী বাড়িও পড়ে। সাম্প্রতিক পায়রার খোপের মত বহুতলের তুলনায় সেগুলির নান্দনিক ও ঐতিহ্যগত মূল্য অপরিমেয়।

৪) অর্থনৈতিক – বর্তমানে অনেক প্রাচীন বাড়ির থেকে বাড়িওয়ালার যথেষ্ট বা কোন উপার্জন সম্ভব হচ্ছেনা। কিন্তু প্রস্তাবিত সরকারি নীতির সদ্ব্যবহার করে এগুলির আধুনিক রূপান্তর ঘটিয়ে নানা লাভজনকভাবে (Adaptive Re-use) ব্যবহারের ও উপার্জনের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকদের সদিচ্ছা ও উদ্যোগ নিয়ে এই বিষয়ে একটি প্রকল্পের রূপরেখা প্রণয়নের একান্ত দরকার।

Diary of the FIFA 2022 World Cup Final

Tanmay Sabud, *1991, Mechanical*

Date: 18 December 2022
Place: Lusail Stadium, Qatar

Before Kickoff

I settled into Sector 514, Category 1, my heart pounding with anticipation. Beside me sat Mohan Bagan Club President Debasis Dutta da and Mr. Kalyan Chobey's wife and her daughter, while just behind were Saurav Ganguly and Dona Ganguly. Across the stadium, in Category 2 at the penalty corner side, my family Debjani (wife), Megha (daughter), Chinmoy (brother), Arpita (Brother's wife) Richik and Rurik (Nephew) waited for the drama to unfold from their vantage point. Richik is the principal architect to have six final tickets through the FIFA lottery.

The Lusail Stadium was alive with energy. 90,000 voices merged into one colossal roar, a sound so immense it felt as if the air itself were trembling. The atmosphere was overwhelming — anticipation, passion, and history all converging in a single night.

The Match

Argentina began with breathtaking intensity. With Ángel Di María on the field, their attack was fluid and fearless. His runs down the left flank tore France apart, and his goal in the first half was a moment of pure artistry. While Di María played, Argentina looked unstoppable — every pass crisp, every move brimming with confidence.

But then came the storm named Kylian Mbappé. In the second half, he single handedly dragged France back into the contest. His first goal from the penalty spot ignited belief, and within seconds his second — a stunning volley — silenced the Argentine celebrations. Later, his third from another penalty completed a historic World Cup final hat trick, the roar of French fans piercing through the Argentine chants.

The game swung wildly, emotions rising and falling like waves.

The Turning Point

At 120 minutes, with the score locked at 3–3, came the moment that froze time. France broke through, and it seemed certain they would score. But Emiliano Martínez, Argentina's guardian, produced a miraculous save — stretching wide to deny Kolo Muani in a one on one. The stadium gasped, then erupted. That save was not just a stop; it was destiny preserved.

The Penalty Shootout

The tension was unbearable. My family at the penalty corner had the closest view, while I sat gripping my seat, heart pounding. Each kick carried the weight of nations.

When Montiel's final shot struck the net, Argentina were champions. The eruption was indescribable — joy, disbelief, and relief colliding in one thunderous moment.

After the Whistle

The celebrations were unforgettable. The Argentina players began cutting the nets, claiming pieces of history as souvenirs of their triumph. Then came the sight etched forever in my memory: five of Argentina's top stars climbing onto the goalpost, silhouetted against the floodlights, waving to the crowd like victors on a grand stage.

The Lusail Stadium was transformed into a football theatre. Strangers embraced, friends screamed, and tears flowed freely. It was not just a victory — it was a living memory carved into the soul of everyone present.

Reflection

That night was more than a match. It was about shared passion, friendship, and history unfolding before our eyes. Sitting with my companions, hearing the roar of 90,000 voices, and watching Argentina lift the trophy, I felt part of something larger than life — a story I will carry forever.

মেঘবৃষ্টি

প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, ১৯৮৭, *ইলেক্ট্রিকাল*

হঠাৎ করে ঈশান কোণে
ছোট্ট একটা মেঘ
ছড়াতে থাকে আকাশ জুড়ে
হাওয়ার বাড়ে বেগ।
সেই হাওয়া তে ভর করে মেঘ
ছড়ায় আকাশ জুড়ে
নিকষ কালো মেঘেরা সব
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।
একটু আগেও সুয্যিমামার
ভরিয়ে ছিল আলো
আলোর দাপট কমিয়ে দিয়ে
আকাশ এখন কালো।
এমনি করেই বৃষ্টি নামে
কখনো ভীষণ জোরে
কখনো বা সেই হাওয়া তেই
মেঘ গুলো যায় উড়ে।
এইরকমেই আসাযাওয়ার
চলতে থাকে খেলা
কখন আলো কখন আঁধার
কাটবে সারাবেলা।।

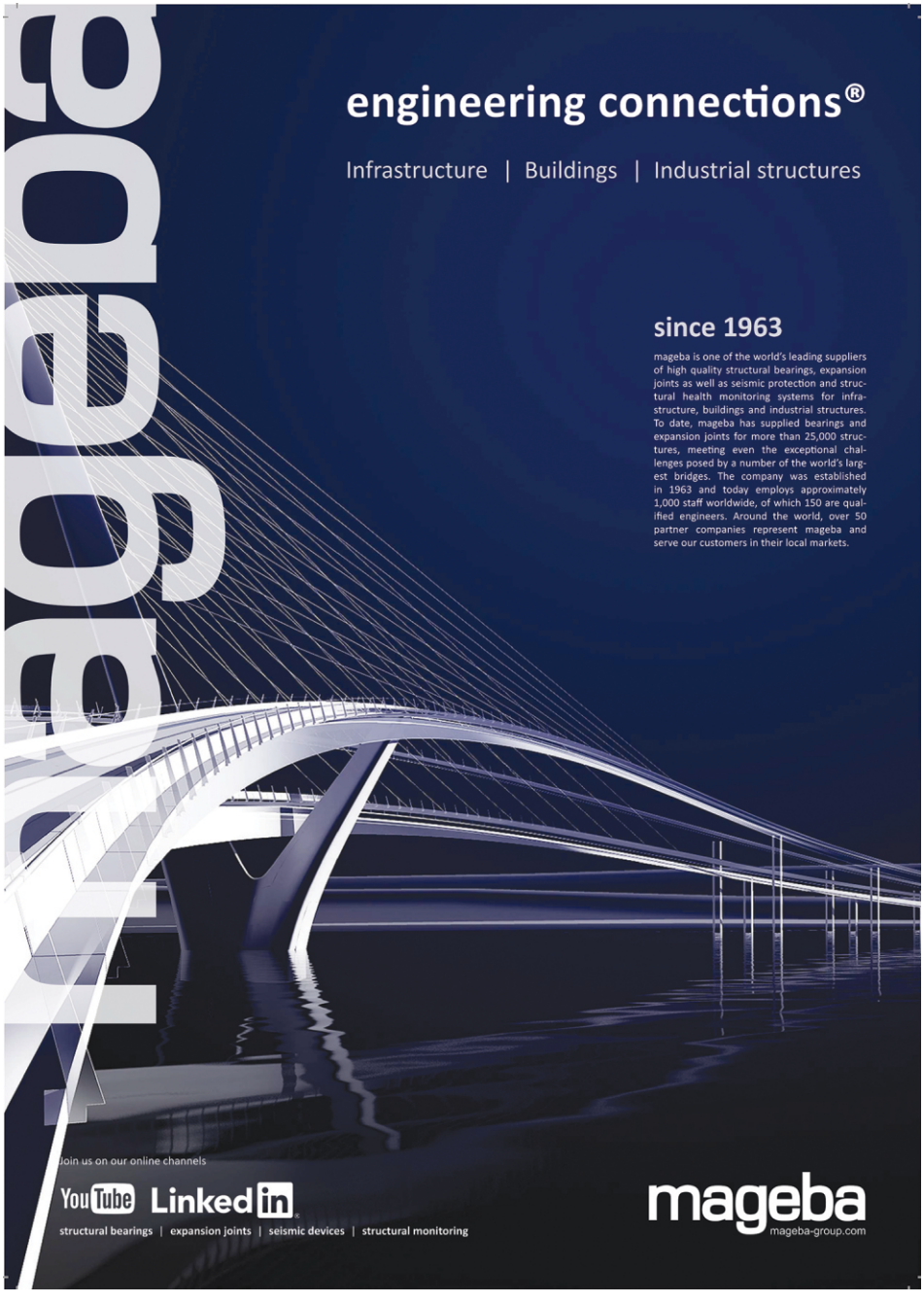
mageba
engineering connections®
Infrastructure | Buildings | Industrial structures
since 1963
mageba is one of the world's leading suppliers of high quality structural bearings, expansion joints as well as seismic protection and structural health monitoring systems for infrastructure, buildings and industrial structures. To date, mageba has supplied bearings and expansion joints for more than 25,000 structures, meeting even the exceptional challenges posed by a number of the world's largest bridges. The company was established in 1963 and today employs approximately 1,000 staff worldwide, of which 150 are qualified engineers. Around the world, over 50 partner companies represent mageba and serve our customers in their local markets.
Join us on our online channels
YouTube LinkedIn
structural bearings | expansion joints | seismic devices | structural monitoring
mageba
mageba-group.com

About Our Comapny

- Manufacturing MSME involving engineering process
- Modernized semi automated STEEL FOUNDRY
- In house home grown technology
- Operating in rural Bengal ensuring employment to rural youth.
- Tied up with local ITI for training and sourcing local manpower.
- Innovative and dedicated team working for last 10 years.
- Accredited ISO 9001-2015

Certification

Our Facilities

PATTERN & METHODING

FETTLING

ALFA SET NO-BAKE MOULDING SYSTEM

4 NOS (10 TON / 5 TON / 5TON / 1 TON) HEAT TREATMENT FURNACE WITH AUTO CONTROL WATER & AIR QUENCHING FACILITIES

MELTING – 3 NOS (3 TON / 3TON & 0.5 TON) MEDIUM FREQUENCY INDUCTION FURNACE

SHOT BLASTING

Contact

Datre Corporation Limited, has one of the most modern state-of-the-art Integrated Special Steel and Alloy Steel Casting manufacturing plant at Falta in Eastern India, focusing Steel Casting machine components for Mining, Construction and Railways Passenger safety.

ADDRESS

Falta Industrial Growth Center (F.I.G.C), Sector -III South 24 Parganas, Pin -743 504, West Bengal, India

PHONE

+91 7605087010
+91 7605087007
+91 7605087008

E-MAIL ID

sales@datre.com
hr@datre.com
purchase@datre.co

www.datre.in

in www.linkedin.com/company/datrecorporationlimited/

ISO 9001:2015 Certified
Honesty and Punctuality is the essence of our success
MAA TARA FABRICATOR
Email: maatarafab18@gmail.com • mtf_kol@yahoo.com
Contact No. - 9674160875 / 9153032290 / 8240230459
(Unique for FABRICATION, ERECTION and BLASTING METALIZING PAINTING of ROAD and RAIL BRIDGES, STEEL STURUCTURES and all types of CIVIL WORKS
Office :- 46, Sukchar Ambagan, P.O. : Sukchar, Kolkata- 700 115, Contact No. - 9674160875 / 9153032290 / 7001226623
Works :- Tetulmuri Bus Stop, Khalna, Joypur Road, Bagnan, Howrah- 711303
MIPL SINCE 2021
Symbol of Honesty and Punctuality
MTF Infrastructure Pvt. Ltd.
Contact No. - 9674160875 / 9153032290 / 8240230459
Email: mipl2021@mtfinfrastructure.com
CIN : U45201WB2021PTC245429

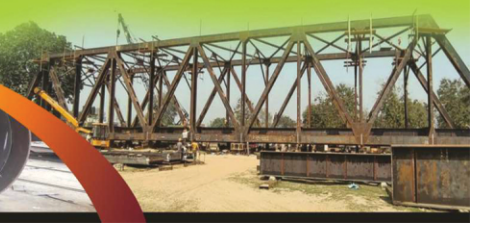

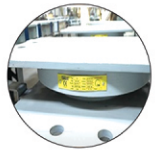

since 1962
metco
AN ISO 9001 COMPANY
Elastomet
Product Profile
STRUCTURAL BEARINGS
SPHERICAL BEARING WITH SPECIAL SLIDING MATERIAL
POT BEARING WITH SPECIAL SLIDING MATERIAL
DISC BEARING
CENTRAL HINGE BEARING
STEEL LAMINATED ELASTOMERIC BEARING
ELASTOMERIC BEARING WITH SEISMIC ARRESTER
KNUCKLE BEARING
ROLLER AND ROCKER BEARING
SPECIAL PURPOSE BEARING
STRUCTURAL EXPANSION JOINTS
STRIP SEAL EXPANSION JOINT (UNITARY & MODULAR)
STEEL REINFORCED ELASTOMERIC JOINT
SEISMIC ISOLATION
SHOCK TRANSMISSION UNIT
LEAD RUBBER BEARING
HIGH DAMPING RUBBER BEARING
FABRIC REINFORCED ELASTOMERIC BEARING
METAL ENGINEERING & TREATMENT CO. PVT. LTD.
STRUCTURAL BEARINGS, JOINTS & SEISMIC ISOLATION
ENGINEERING EQUIPMENT & PROJECTS
Operations : 42B, Motilal Basak Lane, Kolkata - 700 054, India
Corporate : 235/2, B.B.Ganguly Street, Kolkata - 700 012, India
metcobearings@metcocal.com / info@metco.in
www.metcocal.com

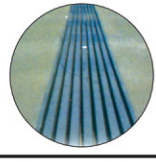

रेलटेल
RAILTEL

G20
भारत 2023 INDIA

One of the Largest Neutral Telecom Infrastructure Providers in India

61000+ OFC network across Railway Track

21000+ Kms of Citywide Access Network

Two UPTIME USA certified Tier III Data Centres

MeitY empanelled Cloud- RailCloud

State-of-the-Art Security Operation Centre

One CNOC (Central Network Operations Centre) and 4 NOCs

1000+ Telecom Towers

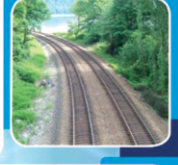

www.railtelindia.com

With Compliments from

AFCONS

AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED

With best compliments from...

Dineshchandra R. Agrawal Infracon Pvt. Ltd.

With best compliments from

S.B.Engineering Corporation.

PURBA LALPUR, CHAKDAHA

NADIA-741222

Email-s.bengg78@gmail.com

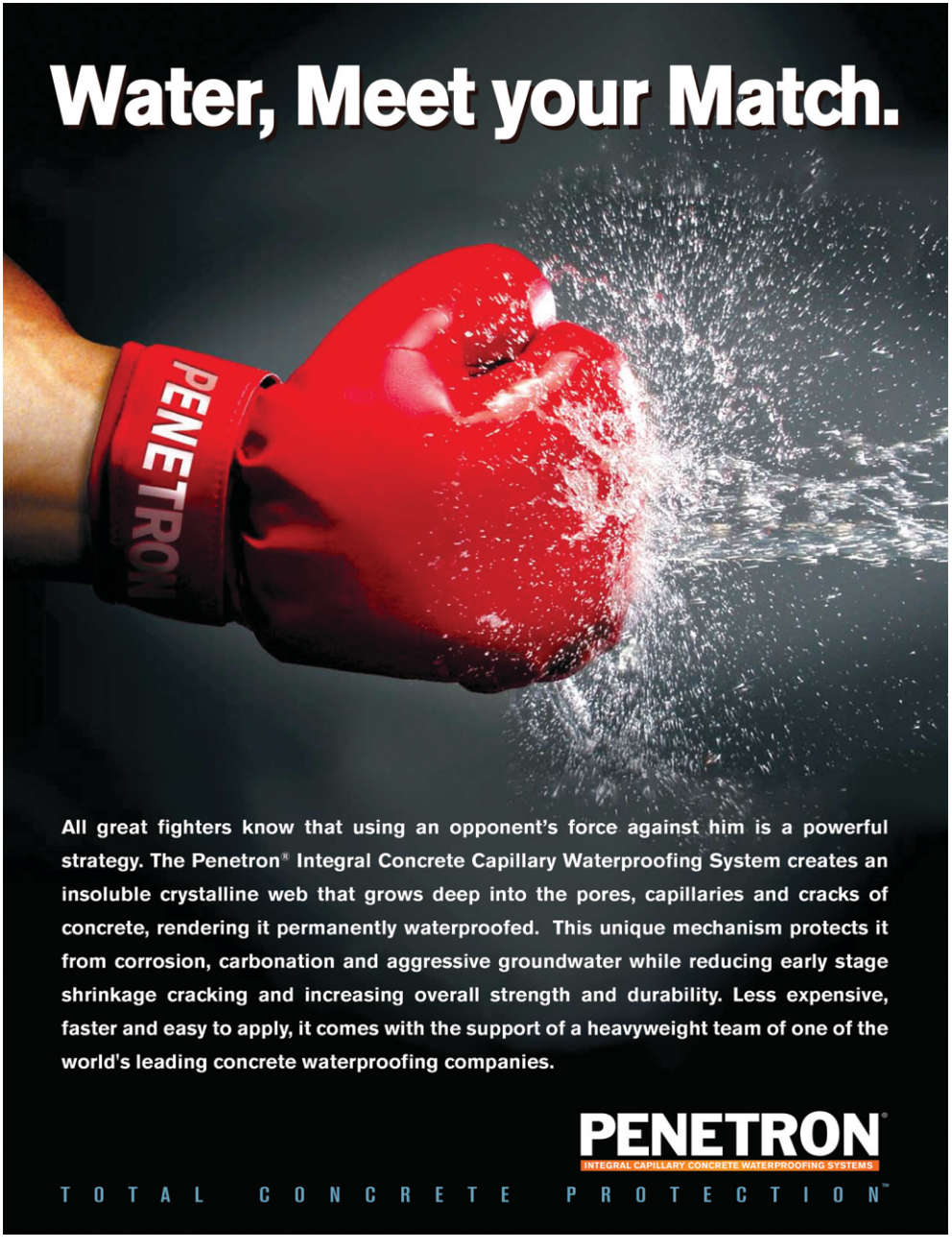
Water, Meet your Match.
PENETRON
All great fighters know that using an opponent's force against him is a powerful strategy. The Penetron® Integral Concrete Capillary Waterproofing System creates an insoluble crystalline web that grows deep into the pores, capillaries and cracks of concrete, rendering it permanently waterproofed. This unique mechanism protects it from corrosion, carbonation and aggressive groundwater while reducing early stage shrinkage cracking and increasing overall strength and durability. Less expensive, faster and easy to apply, it comes with the support of a heavyweight team of one of the world's leading concrete waterproofing companies.
PENETRON
INTEGRAL CAPILLARY CONCRETE WATERPROOFING SYSTEMS
TOTAL CONCRETE PROTECTION™

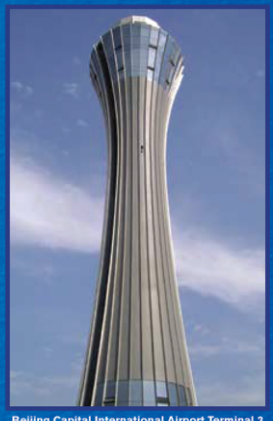

Beijing Capital International Airport Terminal 3 Control Tower, China

INTERNATIONAL AIRPORT PROJECTS TRUST IN PENETRON®

Around the world, airports have become an important part of today's infrastructure connecting people and economies. In order to maximize investments and the usability of airport structures, solutions that ensure a permanent and efficient protection of the concrete against water penetration are required by architects, designers and developers alike. Penetron® has vast experience in airport projects, protecting concrete structures worldwide for more than 30 years. Our products and expertise improve the performance of thousands of cubic meters of various concrete structures on international airports such as Changi International Airport Terminal 3 (Singapore), Warsaw's Frederic Chopin Airport Terminal 2 (Poland), Chennai International Airport Terminal (India), Mumbai International Airport (India), Beijing Capital International Airport (China), Cape Town International Airport (South Africa) and Fiumicino Airport Rome (Italy). The active nature of Penetron® products provide these projects with a self-healing concrete, which prevents a premature deterioration and significantly reduces maintenance costs of the structure.

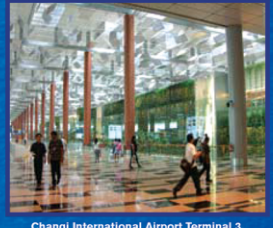

Changi International Airport Terminal 3, Singapore

Fiumicino Airport Rome, Italy

Frederic Chopin Airport Warsaw, Poland

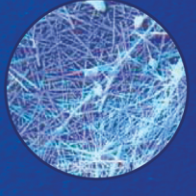

An intrictate web of insoluble crystals forms in the presence of Penetron® and H_2O, creating a permanent protective seal.

Chennai International Airport, India

Cape Town International Airport, South Africa

For more information contact:
Penetron India Private Ltd
sushil@penetron.co.in
or for
West India: 93202 01301
North India:9599928044
South India: 8884101301
East India : 9830391343

ECL EASTERN COALFIELDS LTD.
(A Subsidiary of Coal India Ltd.)
Eastern Coalfields Limited
JHANJRA AREA
Highest producing undeground Mechanised Coal Mine of India
Highest ever production of 3.63 MTe
Highest Ever despatch of 3.64 MTe
Powered Support Longwall - 1 no.
Standard height Continuous Miner - 4 nos.
Low Height Continous Miner - 2 nos.
Multi Utility Vehicles and Free Steered Vehicles
1982
GOI approved a Feasibility report in Collaboration with Soviet Experts in December 1982
1989
Two sets of Powered Support were procured from Ex USSR in 1989 along with Road Headers
1995-99
•Two sets of Longwall namely Ex-Dhemomain and Ex-Churcha were transferred to Jhanjra Project to serve as 3rd and 4th set at the project.
2000
•Ex Satgram set was also brought to Jhanjra as a replacement of one of the surveyed off Russian PSLW set
2007
•First Standard Height Continuous Miner was introduced, Manufactured by Joy Mining Machinery
2014
•Second Standard Height Continuous Miner was introduced, Manufactured by Caterpillar
2016
Production from CODCO Longwall Package Started with higher support capacity of 1100 Te
2018
•2 nos. of India's First Low Height Continuous Miners Manufactured by Caterpillar deployed
2025
•2 nos. of Indigenous Make Standard Height Continuous Miner was introduced for the first time in India
2026
•1 no. of Standard Height CM with 2 nos. of Road Header to be introduced in hiring Mode Commissioning of CHP and Railway Corridor of 5 MTy capacity
2028
•Introduction of High Capacity Powered Support Longwall with Road Headers

LEA Associates South Asia Pvt. Ltd.

A LEA Group Company

Global Consulting Engineers & Planners

Established in 1993, LEA Associates South Asia Pvt. Ltd. brings over **30 years** of proven global experience in engineering and planning consultancy throughout India and **23 countries** spanning Africa, South Asia, and the Middle East. As an operating company of LEA Group Holdings Inc.—a Canadian multinational with **70 years** of proven expertise across 50+ countries—we combine global knowledge with regional insight to shape resilient infrastructure for the future.

Our Domain Sectors

Roads, Highways & Tunnel
NH 754 – Rajasthan

Bridges & Structures
Hemanta Setu Bridge, West Bengal

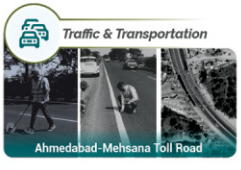
Traffic & Transportation
Ahmedabad-Mehsana Toll Road

Urban/Regional Development & Planning
Al Rustaq Structure Plan, Oman

Railways
Bhandai to Dholpur Track Tripling Project

Environmental & Social Planning
Meghalaya Integrated Transport Project

Hydrology & Water Resources
Bhadbhut Barrage, Gujarat

Institutional Strengthening/Public Policy
Enhancing Road Capacity, Ethiopia, Africa

LEAdership in engineering & planning solutions

CANADA ⚙ INDIA ⚙ ASIA ⚙ AFRICA ⚙ MIDDLE EAST

Visit Us at ***www.lea.ca***

Head Office:
B-1, E-27, Mohan Cooperative Industrial Estate,
Mathura Road, New Delhi-110044, India

91-11-2697 3950-52, 41678150
91-11-41678659
lasa@lasaindia.com,
leaglobal@lasaindia.com,

With best compliments from

Guddu Enterprise

Govt. Contractors and General Order Suppliers

Contact : 9830133772

Email : ashoksingh011967@gmail.com

Village Chowgacha, P.O. - Majhipara

Dist. - North 24 Parganas

Honoring the Spirit of Giving: A Milestone Year for GAABESU USA

To our esteemed alumni across the United States, we celebrate a landmark year of partnership and progress. We are proud to highlight the vital role of **GAABESU USA**, our official 501(c)(3) non-profit foundation.

This year, GAABESU USA successfully **streamlined the fund transfer process**, ensuring that your contributions reach IIEST directly with **zero administrative transfer costs**. This ensures every dollar you give—which remains **tax-deductible**—goes exactly where it is needed most.

Impact in Action

Your generosity has breathed life into several critical initiatives, including:

- **Annual Alumni Day 2025**
- **ARUN AND DHRITI DEB CENTRE FOR WATER AND ENVIRONMENTAL STUDIES (ADDCWES)**
- **Emergency Fund**
- **Mechanical Dept. Conference room**
- **Prestigious BAJA SAEINDIA competition**

Special Recognition

While we thank every contributor, we wish to give a special mention to the following alumni for their extraordinary generosity this year:

- **Dr. Arun Deb, 1957CE: $1m+ for ADDCWES**
- **Dr. Tapas Som, 1971ME: $3700 for Multiple projects**
- **Dr. Prabir Bagchi (1969 Mech): $1000**
- **Rita & Prasenjit Adak (1992 CST): $1000**
- **Dr. Sudeshna & Dr. Nilanjan Mitra (1998 CE): $1000**
- **Dr. Sutapa & Subho Goswami (1999 CE): $1000**

Our Honor Roll of Donors

We extend a special thank you to those who championed these causes through GAABESU USA this year:

Amitabha Chatterjee (1965 CE), Baidya Nath Roy ('65 ME), Bhaskar Dasgupta ('81ETC), Bidyut Niyogi ('68ME), Dr. Biman Ghosh ('81Met), Bishuddhananda Datta ('66CE), Hasan Sheikh (2002 CST), Kalpana Majumdar (1987 CST), Niladri Sannigrahi (2001 CE), Pradipta Som ('66ME), Saumitra Sinha ('81Met), Shubha Banerjee (1995ME), Shyamal Sarkar ('72 ME), Dr. Sibu P. Ray ('64ME), Subrata Ghosh ('84ME), Sumitra Sinha ('79ETC), Dr. Swapan Saha ('88EE), Tarun Basu ('67CE).

Your commitment reinforces the bridge between our glorious past and a promising future. By removing financial barriers and administrative friction, you have made it easier than ever to give back to the halls that built us.

With gratitude, *The GAABESU USA Board & IIEST Shibpur*

With best compliments from

QATAR ALUMNI

1 ABHIJIT ROY -1984 CIIVIL
2 SUMIT DATTA-1987 MECHANICAL
3 TANMOY SABUD -1991 MECHANICAL
4 GOURI SHANKAR BACHASPATI-1991 ELECTRICAL
5 SOUMEN JANA-1995 ELECTRICAL
6 TAPAS NANDY -1997 MECHANICAL
7 SUMANTA GHOSH-2000 ARCHITECTURE
8 SNEHAMOY CHATTERJEE-2001 MECHANICAL
9 SIBASHIS DAS -2002 MECHANICAL
10 HANSARAJ GHANTI- 2004 ELECTRICAL
11 RIAZUDDIN SHAIKH-2004 MECHANICAL
12 PRADIP SAUTIYA-2006 CIVIL
13 AVIK KUNDU-2006 MECHANICAL
14 UTTAM BISWAS-2006 MECHANICAL
15 SOVAN PAL-2007 MECHANICAL
16 SOMNATH SIKADAR-2007 CIVIL
17 RIPAN SARKAR-2009 MECHANICAL
18 SAUBHIK SHAH-2009 CIVIL
19 SUBHASHIS SIT-2010 MECHANICAL
20 ABHIK BANERJEE- 2013 MECHANICAL

দুই কিংবদন্তী সহপাঠীর জন্মশতবর্ষে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

সুধীন্দ্রনাথ (বাদল) সরকার ও নারায়ণ সান্যাল
১৯৪৮ – সিভিল

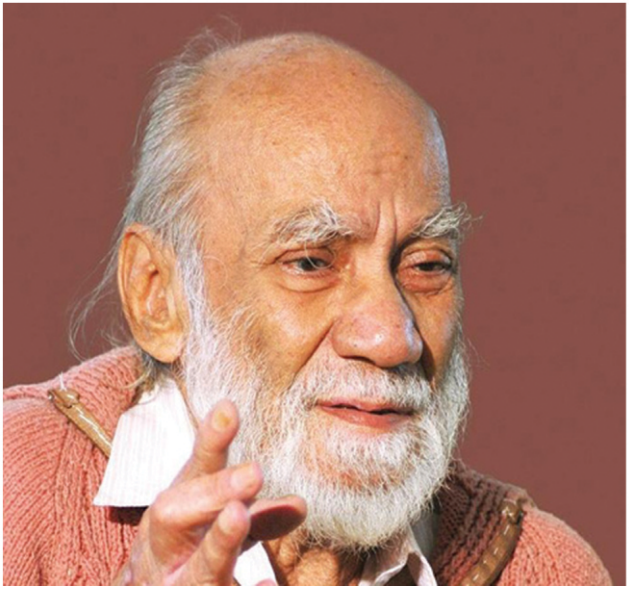

সুধীন্দ্রনাথ সরকার
জন্ম - ১৫ই জুলাই, ১৯২৫
মৃত্যু - ১৩ই মে, ২০১১

নারায়ণ সান্যাল
জন্ম - ২৬শে এপ্রিল, ১৯২৩
মৃত্যু - ৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

PICTURE PLATE

(১) 'বেনে বউ' [ব্ল্যাকহেডেড অরিওল]

(২) 'বাঁশপাতি' [গ্রীণ বী-ইটার]

(৩) 'লাল মাথা বাঁশপাতি' [চেষ্টনাট হেডেড বী-ইটার]

(৪) 'বসন্তবৌরী' [কপারস্মিথ]

(৫) 'নীলকণ্ঠ বসন্তবৌরী' [ব্লু-থ্রোটেড বারবেট]

(৮) দুর্গা টুনটুনি [পার্পল সান বার্ড]

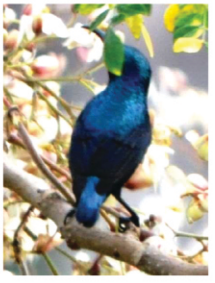

(৬) বুলবুলি [রেড ভেন্টেড বুলবুল]

কূজনে ব্যস্ত

প্রেমে মাতোয়ারা

খুশী ?

(৭) ঝুঁট শালিখ [জাঙ্গল ময়না]

(৯) হলদে মৌটুসী [পার্পল-রাম্পড সান বার্ড]

মধুপানে রত হলদে মৌটুসী

(১০) হাঁড়িচাঁচা [ইন্ডিয়ান ট্রী-পাই]

(১৩) চড়াই [হাউস স্প্যারো]

চড়াই দম্পতি

নিঃসঙ্গ প্রবীণ চড়াই

(১১) হরিয়াল (ইয়েলো-ফুটেড গ্রীণ পিজিয়ন)

(১৩) কাঠঠোকরা [গোল্ডেন ব্যাকড্ উডপেকার]

কাঠঠোকরা দম্পতি

ব্যাপারটা কি ?

সদ্যোজাত কাঠঠোকরা

(১৪) কোকিল [এশিয়ান কোয়েল]

NOW LIVE!
enpropeL
The Ultimate
Student Hub Platform
Connecting Students to a World of Opportunities
Internships
Mentorships
Scholarships
www.enpropel.com
Competitions
Community
Events
Remote Hub

TRANSFORMING INFRASTRUCTURE.

HANDLING COMPLEXITY WITH SIMPLICITY

Infrastructure Technical Advisory | Debt Syndication & Divestment | Highways & Railways Sector

Transplex Infra Services Pvt. Ltd. is a specialized infrastructure advisory firm delivering technical, engineering, and financial solutions for Highway and Railway projects. Backed by a highly experienced team with decades of collective market expertise, Transplex supports projects from concept to execution, enabling informed decisions and sustainable outcomes.

OUR EXPERTISE

1. Highways, Expressways & Urban Roads (EPC / PPP / DBFOT)
2. Railways, Metro, HL Bridges & Multimodal Infrastructure
3. Design Engineering & Project Engineering Support
4. Project Management Consultancy (PMC)
5. Financial Viability Analysis & Feasibility Studies
6. Debt Syndication & Divestment Advisory

Kolkata: Unit No. 504, Arch Square, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata – 700091
Mumbai: 14th Floor, ABR Emerald, Chakala MIDC, Mumbai – 400093
Phone: 98740 88552 | Email: corporate@transplex.co.in